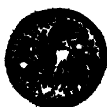


প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ



সিগনেট প্রেস · কলিকাতা ২০

তৃতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ ১৩৬৩

প্রকাশক

দিলীপকুমার গুপ্ত

সিগনেট প্রেস

১০।২ এলগিন রোড

কলকাতা ২০

প্রচ্ছদপট

সত্যজিৎ রায়

মুদ্রক

প্রভাতচন্দ্র রায়

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ

৫ চিন্তামণি দাস লেন

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

গসেন এণ্ড কোম্পানি

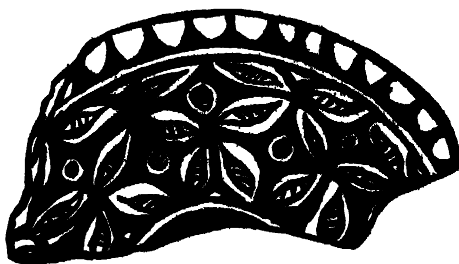
৭।১ গ্রাণ্ট স্ট্রিট

বাঁধিয়েছেন

বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

৬১।১ মির্জাপুর স্ট্রিট

দাম চার টাকা

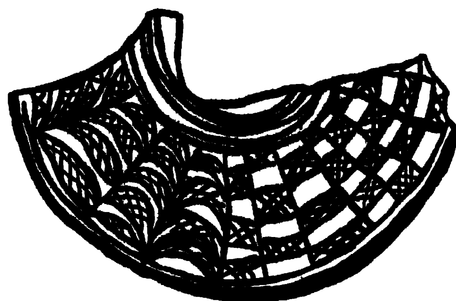


গ্রন্থকারের নিবেদন

১৩৪০ সালের শেষভাগে দমদম জেলে এই বইখানি লিখতে আরম্ভ করি। প্রায় বছর খানেক পরে অর্ধেকের কিছু বেশি লেখা হলে হঠাৎ কারামুক্ত হই। এর পর দীর্ঘ নয় বছর বন্ধুদের তাগিদ সত্ত্বেও নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় অবশিষ্ট অংশ শেষ করার জন্য কিছুই করতে পারিনি। ১৩৫০ সালের শেষভাগে আমেদনগর ফোর্টে বন্দী থাকবার সময় আবার এ-কাজে হাত দিই এবং ১৩৫১ সালের ৭ই শ্রাবণ বইখানি শেষ করার সৌভাগ্য হয়। দীর্ঘ ৯৷১০ বছর ব্যবধানে লিখিত হওয়ার দরুন সব অধ্যায়ের ভাষা একরকম হয়নি। আশা করি সুধী পাঠকরা এ ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন।

দমদম জেলে অনেক সহকর্মীর কাছ থেকে অনেক সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছি। কোনো নাম না করে তাঁদের সকলকেই আমার প্রীতি জানাচ্ছি। জেলের বাইরে এসে অধ্যাপক ডক্টর হেম রায় ও প্রিয়রঞ্জন সেনকে অধ্যায় সমূহের পাণ্ডুলিপি দেখাই। উন্নতিকল্পে তাঁদের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পাই। আমেদনগর ফোর্টে আচার্য নরেন্দ্র দেবের কাছ থেকেও অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমেদনগর থেকে মুক্তি পাবার পরেও কয়েকজন সহকর্মী ও পণ্ডিত বন্ধুর কাছ থেকেও নানারকম সাহায্য পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর দীনেশচন্দ্র সরকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চার পণ্ডিতকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ



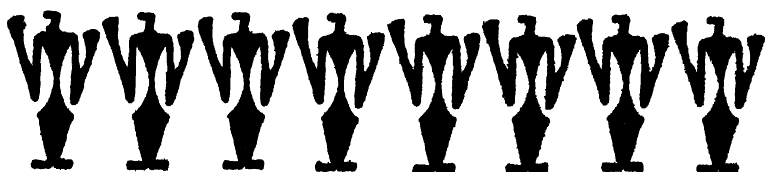
দ্বিতীয় সংস্করণ

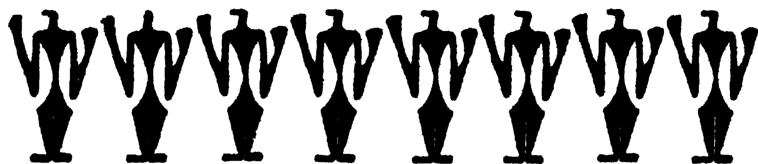
বইখানি সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতের প্রশংসা লাভের সৌভাগ্য ঘটেছে। অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ এক বেতার বক্তৃতায় এই বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন। বাঙলা বিভাগ জনিত অসুবিধা সত্ত্বেও তেরো মাসের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হয়েছে। বাঙলা দেশে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের আগ্রহ দেখে আনন্দলাভ করেছি।

প্রথম সংস্করণে কোনো নাম-সূচী ছিল না। চুঁচুড়ার স্নেহভাজন শ্রীমান সুনীল রায় এই সংস্করণে সেই অভাবটি পূরণ করে দিয়েছেন।

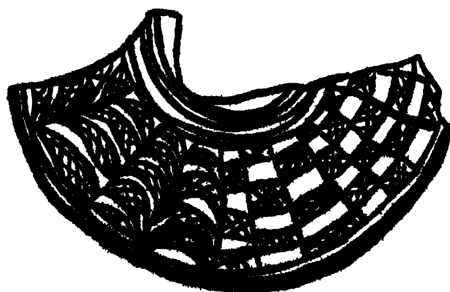
বইয়ের হিন্দী ও ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ





যে-সমস্ত মহাপুরুষের তপস্যা ও কর্ম-
কুশলতা ভারতকে একদিন জগতের
শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল,
যাঁদের সাধনা আজও আমাদের
প্রাণে আশার সঞ্চার করছে,
তাঁদের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই
গ্রন্থ শ্রদ্ধাঞ্জলি-স্বরূপ অর্পিত হল





সূচীপত্র

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস



ভূমিকা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বলতে লোকে সাধারণত আর্য সভ্যতাই মনে করে। এ ধারণা মোটামুটি ঠিক হলেও তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মোহনজোদড়ো ও হরপ্পার আবিষ্কারের পর কোনো কোনো মনীষী মনে করেন, ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তৃতির পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় এক উন্নততর সভ্যতা বর্তমান ছিল এবং সেটা দ্রাবিড়ী সভ্যতা। তাঁদের মতে প্রধানত আর্য ও দ্রাবিড়ী এই দুই সভ্যতার মিলনে প্রাচীনকালে যে এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তারই নাম ভারতীয় সভ্যতা। জার্মান পণ্ডিত গ্লাজেনাপ লিখেছেন: 'জার্মানদের দ্বারা প্রাচীন (গ্রীস ও রোমীয়) সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার মতো যাযাবর আযবর্বরদের দ্বারা দ্রাবিড়ী সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু তা পরবর্তী যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।' কিন্তু সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা যে বাস্তবিকই বৈদিক-আর্য-সভ্যতার পূর্ববর্তী বা দ্রাবিড়ী সভ্যতা, এর কোনোটাই জোর করে বলা চলে না। অনেকে আবার ঐ সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতারই অঙ্গস্বরূপ মনে করেন। যদিও আর্য সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার অনেক সাদৃশ্য আছে তবুও উভয়ে যে একই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত একথা বলবার মতো যথেষ্ট উপাদানও আমাদের কাছে নেই। এ বিষয়ে সত্য নির্ণয় অসম্ভব হলেও, বৈদিক সভ্যতার বাহকেরা যে সমসাময়িক অন্যান্য

লোকদের কাছ থেকে কোনো কোনো ভালো জিনিস গ্রহণ করে তাদের সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

যাযাবর আর্যদের উল্লেখ করা হয়েছে। তারা ভিন্নদেশ থেকে ভারতে এসে সেকালকার ভারতবাসীদের যুদ্ধে পরাজিত করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল—এটাই প্রচলিত মত। কিন্তু 'আর্য' বলতে এক ধরনেব দেহের গড়ন বিশিষ্ট কোনো জাতিবিশেষকে বোঝায় না। 'আর্য' শব্দটি কৃষ্টিবাচক। প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা এক সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল, তাকেই বৈদিক বা আর্য সভ্যতা বলা যেতে পারে।

আর্যদের আদি নিবাস সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত বহু মত ব্যক্ত করেছেন, কেউ বা মধ্য-এশিয়া, কেউ বা উত্তর-মেরুর সন্নিকটবর্তী স্থান, কেউ বা ভল্‌গা নদীর তীর। অধুনা কেউ কেউ আর্যদের আদি নিবাস ভাবতবর্ষ একথা বলছেন। কিন্তু কোনো মতই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়নি। তবে তারা ভিন্নদেশ থেকেই আসুক বা ভারতের আদিম অধিবাসীই হোক, একথা সত্য যে আর্যদের বহু যুদ্ধবিগ্রহ করতে হয়েছিল ও বহু ঘাত-প্রতিঘাতেব ভিতর দিয়ে দুই বা ততোধিক সভ্যতার মিলন হয় এবং তার ফলে এক সভ্যতা গড়ে ওঠে—তারই নাম ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা। শুধু যে একাধিক সভ্যতার মিলন হয়েছিল তা নয়, পরস্পবেব সঙ্গে বিবাহের আদান-প্রদান দ্বারা সম্পূর্ণ নূতন একটি জাতিও গড়ে উঠেছিল—তারই নাম হিন্দুজাতি। পরবর্তী যুগে শক, হূন, গুজর প্রভৃতি অন্যান্য জাতিও হিন্দুজাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে অবিচ্ছেদ্যরূপে এক হয়ে যায়। আজ ভারতবর্ষে কে শক, কে হূন, তা কেউ বলতে পারে না। এটা কলঙ্কের কথা নয়, গৌববেরই। জাতি যখন জীবন্ত থাকে তখন এরূপই হয়। নূতন নূতন রক্তের মিশ্রণ একটা জাতিকে সতেজ রাখবার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। বর্তমানে বিবাহের গণ্ডী-সঙ্কীর্ণতা হিন্দুজাতির উন্নতির অন্তরায়। এই বহুজাতি মিশ্রণের কাজে ক্ষত্রিয়রাই সবচেয়ে অগ্রণী ছিল।

ভারতীয় সভ্যতা যেমন কোনো জাতিবিশেষের সভ্যতা নয়, তেমনি কোনো বর্ণ বিশেষেরও নয়, যদিও ব্রাহ্মণের দান যথেষ্ট। ভালো করে বিচার করে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে ক্ষত্রিয়ের বা বৈশ্যের দানও কম নয়। ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি ধর্ম। উপনিষদ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা ভারতীয় ধর্মের একটি প্রধান অঙ্গ। এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রথম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই উৎপত্তি লাভ করে, সেজন্য ব্রহ্মবিদ্যা দুই

সাধারণত রাজবিদ্যা নামে অভিহিত হয়। যারা সর্বদা জীবন নিয়ে খেলা করে, হাসিমুখে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেয়, তাদের মনেই সর্বপ্রথম উদার দার্শনিক-ভাব অঙ্কুরিত হওয়া স্বাভাবিক। এজন্যই স্মৃতিকার ক্ষত্রিয় নেই, কিন্তু উপনিষদকার অধিকাংশই ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে অনেক দ্বন্দ্ব ভারতের সমাজ-জীবনের উপব দিয়ে চলে গিয়েছে। ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্তৃক একুশবার ভারতকে নিঃক্ষত্রিয় করার ও তার পরে ক্ষত্রিয় রাজা রামচন্দ্রের কাছে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ এই দ্বন্দ্বকেই পরিস্ফুট করছে। কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন —'ব্রহ্মবিদ্যার আনুষঙ্গিকরূপেই ভারতবর্ষে প্রেম-ভক্তির ধর্ম আরম্ভ হয়। এই ভক্তি-ধর্মের দেবতাই বিষ্ণু।···এই ভক্তির বৈষ্ণবধর্ম যে বিশেষভাবে ক্ষত্রিয়ের প্রবর্তিত ধর্ম তাহার একটি প্রমাণ একদা ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে এই ধর্মের গুরুরূপে দেখিতে পাই—এবং তাঁহার উপদেশের মধ্যে বৈদিক মন্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধে আঘাতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ এই—প্রাচীন ভাবতের পুবাণে যে দুইজন মানবকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছে তাঁহাবা দুইজনেই ক্ষত্রিয়—একজন শ্রীকৃষ্ণ, আব একজন শ্রীরামচন্দ্র।' অতএব এটা ধরে নেওয়া যুক্তিসঙ্গত যে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সমবেত হিন্দুজাতির হিন্দুসভ্যতা।

এই বইতে প্রাচীনকাল থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুসভ্যতার ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করব। বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছেন, বর্তমানেও করছেন, ফলে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে ও হচ্ছে। তাই সর্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লেখা সম্ভবপর না হলেও ইতিহাস লেখবার উপযোগী অনেক মালমশলা মজুত রয়েছে। কাজেই হিন্দুজাতি প্রাচীনকালে যে সভ্যতার অত্যুচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি রকমের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। একথা বলে রাখা বোধহয় সঙ্গত হবে যে আমি কোনো মৌলিক গবেষণা করিনি, পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত তত্ত্বই এই বইয়ের ভিত্তি।

অতীত ভারতের গৌরবকে খর্ব করার চেষ্টা যদিও অনেক ইংরেজ রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক ইতিহাস-লেখক ধারাবাহিক ভাবেই করেছেন, তবুও

তিন

একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষিত ভারতের দৃষ্টি ইউরোপীয়, বিশেষভাবে জার্মান ও ইংরেজ পণ্ডিতদের গবেষণার ফলেই প্রাচীন ভারতের দিকে আকৃষ্ট হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে স্লেগেল, রথ, বিউহ্লার, ওল্ডেন্‌বার্গ, ডয়সেন, বেবার, ম্যাকবি, কিলহর্ণ, গ্রাজেনাপ, ভিন্-টারনিট্‌স, ম্যাক্সমুলার, কোলব্রুক, জোন্‌স্‌, ম্যাকডোনেল, হ্যাভেল, সিলভাঁ লেভি, গ্রুসে, সেনা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় পণ্ডিতদের মধ্যে রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, ভগবানলাল ইন্দ্রজী, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বালগঙ্গাধর তিলক, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রশংসা করেছেন, অনেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দু-একটা ভালো কথা লিখতে বাধ্য হয়েছেন, অনেকে আবার না-বুঝে ভালোটাকেও খারাপ বলে প্রমাণ করাব চেষ্টা করেছেন। আমরা সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রশংসা শুনে অনেকে একেবারে আত্মহারা হয়ে যান। 'সভ্যতা যদি ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে একটা ব্যবসার জিনিস হত, তাহলে আমার নিশ্চিত মত যে ইংলণ্ড আমদানী পণ্যের দ্বারাই বেশি লাভবান হত' সার টমাস মানরোর এই অভিমত, এবং 'এ আমার জীবিতকালে শান্তির উৎস, মৃত্যুর পরও শান্তি দেবে' উপনিষদ সম্বন্ধে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের এই মন্তব্য এবং এরূপ আরও মতামত পাঠ করে অনেক বিচারবুদ্ধিহীন লোক ভাবতে এবং বলতে আরম্ভ করল 'আমরা জানি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা অভ্রান্ত, তাঁরা যা লিখে ও বলে গিয়েছেন তা অল্পবুদ্ধি আমরা বা ইউরোপীয় পণ্ডিতরা আজ না বুঝলেও সত্য এবং মেনে চলা উচিত। আমাদের দেশে যা হয়েছে, এমনটি ছিল না, হবারও নয়।' এই শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই জানে না প্রাচীন ভারতের কৃতিত্ব কোথায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে তথাকথিত শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এ ধরনের লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তারপর পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে সংস্কার বা লব্ধশিক্ষার কুপ্রভাবের ফলে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন।

পৃথিবীর ইতিহাস-প্রণেতা দুর্গাদাস লাহিড়ী ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে রামচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের বানরদের সঙ্গে কথাবার্তার উল্লেখ করে বলেছেন যে সেকালে আর্যরা বিজ্ঞানে এতদূর উন্নতিলাভ করেছিল যে তারা

বানর প্রভৃতি জন্তুদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারত! রামায়ণে পুষ্পক রথের এবং ইন্দ্রজিতের মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করার কথা পড়ে অনেকেই ধরে নিয়েছেন যে সেকালে এরোপ্লেন বা উড়ো জাহাজ ছিল। অনেকের মতে সংস্কৃত ভাষায় যা লিখিত, তাই শাস্ত্র, অতএব প্রামাণ্য। তাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিংশ শতাব্দীতে একেবারে অচল নিয়মকেও চালাতে চান। হয়তো সে সব নিয়ম কোনোকালে কল্যাণকর ছিল। তাঁরা বুঝতেই চান না যে একশো বছর আগেকার এক শরদিন্দুনিভাননা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠি যুবতীর মৃতদেহের কঙ্কালকে যদি গোরস্থান থেকে উঠিয়ে নিতান্ত এক কুৎসিত যুবকের সঙ্গেও বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়, তাহলে লোকে সেটাকে বাতুলতাই বলবে।

আবার অন্যদিকে বর্তমান ইংরেজী শিক্ষার কুপ্রভাবের হাত থেকে অনেক পণ্ডিত লোকও পরিত্রাণ পাননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কৃতী ছাত্রও তাঁর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে লিখেছেন যে ভারতবর্ষে প্রকৃতির সুমহান সৌন্দর্য ভারতীয় মনকে কাব্য ও দর্শনের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত করেছিল। আর সেকালে সহজেই জীবনযাত্রা নির্বাহ হত বলে তারা কাব্য, দর্শন ও শিল্পকলায় বেশ উন্নতিলাভ করেছিল, কিন্তু জীবন সংগ্রামে কঠোরতার অভাব বশত বিজ্ঞানে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি। এটা ইউরোপীয় রাজনৈতিক প্রচার চাতুরীর ফল। প্রচারের ফলে যে একটা সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে তাতে অনেক পণ্ডিত লোকের বুদ্ধিকেও কুয়াশাচ্ছন্ন করেছে।

আসল কথা এই যে প্রাচীন ভারত সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি সব বিষয়েই খুব উন্নত ছিল। সব দিক দিয়ে বিচার করলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগতে কোনো দেশ অতটা উন্নত ছিল না। কিন্তু ভগবান পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রাচীন ভারতের ঘরে বন্ধ করে দরজায় চাবি দিয়ে রেখেছেন একথা অন্ধভক্তরা বিশ্বাস করে আত্মতৃপ্তি লাভ করলেও, কোনো সুবিবেচক লোক তা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত নন। হিন্দুরা অশেষ চেষ্টা ও সাধনার বলে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিল। কালক্রমে তাদের অবনতি ঘটেছে। জগৎ অনেক বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী, কিন্তু আধুনিক জগৎ অনেক বিষয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে একথাও সত্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুপ্রতিভার বিকাশ নানাদিক দিয়ে

হয়েছিল। মুসলমান বিজয়ের ফলে সে বিকাশের পথ কিছুদিনের জন্য রুদ্ধ হয়। কোন দেশে ঐ যুগে ব্যাস, বাল্মিকীর মতো মহাকবি, কালিদাস, ভবভূতির মতো কবি, শূদ্রকের মতো নাট্যকার, বিষ্ণুশর্মার মতো গল্প-লেখক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শঙ্কর, প্রভৃতির মতো দার্শনিক, পাণিনি, কাত্যায়ণের মতো বৈয়াকরণিক, পিঙ্গলের মতো ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ, চরক ও সুশ্রুতের মতো চিকিৎসা-শাস্ত্রবিদ্, কৌটিল্যের মতো অর্থশাস্ত্রকার ও নাগার্জুনের মতো রাসায়নিক জন্মগ্রহণ করেছেন ?

কোন দেশের সুধীজন প্রাচীনকালে উপনিষদের ঋষির মতো উদাত্তকণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি,' 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—ভূমাকে লাভ করার মধ্যেই সুখ, তার চেয়ে কমে নয়, শোনো বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্ররা !

কোন দেশের মহিলা মৈত্রেয়ীর মতো জোর করে বলতে পেরেছিলেন 'যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম'—যা দ্বারা অমৃত লাভ করতে পারব না তাতে আমার কি প্রয়োজন ! কোন দেশেব মহিলা গার্গীর মতো রাজসভায় বসে যাজ্ঞবল্ক্যের মতো পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক কবেছিলেন এবং যথাযথ উত্তর পেয়ে মুক্তকণ্ঠে 'নমস্তেঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্য'—যাজ্ঞবল্ক্য তোমাকে নমস্কাব—এই কথা বলে ন্যায় ও সত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন !

কোন দেশের রাজপুত্র প্রথম যৌবনে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী, নবজাত শিশু, রাজ-সিংহাসন ছেড়ে ভিখারী সেজে বহুকল্পদুর্লভ বোধিসত্ত্ব লাভ করার জন্য কঠোর সাধনা করেছিলেন ! কোন দেশের রাজা অশোকের মতো যুদ্ধবিজয়ের পর যুদ্ধ দ্বারা দেশজয় করার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছিলেন ! অত প্রাচীনকালে কোন দেশের রাজা উপস্থিত প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করে অভিষেকের সময় এই শপথ গ্রহণ করতেন 'যাঞ্চ রাত্রীম্ অজায়েহং যাঞ্চ প্রেতাস্মি তদুভয়মন্তরেণেষ্টা পূর্ত্তং মে লোকং সুকৃতমায়ুঃ প্রজাং বৃঞ্জীথা যদি তে দ্রুহ্যেয়মিতি'—যে রাত্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যে রাত্রিতে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব এই উভয়ের মধ্যে আমি যা কিছু সুকৃতকর্মের অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ আমার সারাজীবনের সুকার্যের ফল, আর আমার পরলোক, জীবন এবং সন্তানসন্ততি সমস্ত থেকেই যেন বঞ্চিত হই যদি আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করি।

কোন দেশের ধর্মশাস্ত্রে এমন উদার বাণী রয়েছে 'রুচিণাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিল নানাপথযুষাং নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসিপয়সামর্ণব ইব'—মানুষ রুচির বিভিন্নতা-বশত ভিন্ন ভিন্ন পথ (সরল ও বক্র) অবলম্বন করে কিন্তু সকলেরই একমাত্র গন্তব্য স্থান তুমি (ভগবান), যেমন বিভিন্ন পথগামী নদীসকলের একমাত্র গন্তব্যস্থান সমুদ্র !

কোন দেশের ধর্মগুরু শিষ্যকে এমন উপদেশ দিচ্ছেন, 'যানি অনবদ্যানি কর্মানি তানি সেবিতব্যানি ন ইতরাণি'—যা অনিন্দিত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কর্ম তাই কর, অন্য কিছু নয়। পাছে শিষ্য গুরুকে সব বিষয়ে অনুসরণ করে সেজন্য সাবধান করে বলছেন 'যানি অস্মাকম্ সুচরিতানি তানি ত্বয়োপাস্যানি ন ইতরানি'—যা শুধু আমাদের ভালো গুণ তারই অনুসরণ কর, অন্য সকলের (খাবাপের) নয়। গুরুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আছেন এবং তাঁদের সম্মান দেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কোন দেশের ঋষি পতঞ্জলির মতো 'যথাভিমত ধ্যানাদ্বা'—যেরূপ অভিরুচি সেরূপ ধ্যানেব দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হতে পারে একপ কথা বলেছেন! কোন দেশ বশিষ্ঠেব মতো মানুষের এমন শ্রেষ্ঠ আদর্শ দাঁড় করিয়েছে! পুত্র-হত্যাকারীর প্রতিও ক্রোধ নেই। কোন দেশে এমন উদারতা রয়েছে—বেশ্যাপুত্র সত্যকাম ঋষি বলে পূজিত, সাঙ্খ্যকার কপিল মুনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী হয়েও ভগবান কপিল বলে পূজিত, আপাত-বেদবিরোধী বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার—'কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে'—তবুও হিন্দু সেই সনাতন বৈদিক ধর্মেবই উপাসক। কোন ধর্মপ্রাণ দেশে 'ত্রয়োবেদস্য কর্তারাঃ ভণ্ডধূর্তনিশাচরঃ'—বেদের তিন কর্তা ভণ্ড, ধূর্ত ও চোর, এমন কথা বলতে সাহস পেয়েছেন!

এই দেশেরই আর্যভট্ট (পঞ্চম শতাব্দী) সর্বপ্রথম পৃথিবীর আবর্তনজনিত দিবারাত্রি ভেদ আবিষ্কার করেন। এই দেশেরই ভাস্করাচার্য (দ্বাদশ শতাব্দী) নিউটনের (সপ্তদশ শতাব্দী) পূর্বে পৃথিবীর উপর থেকে বস্তুসকল পৃথিবীর আকর্ষণে মাটিতে পড়ে একথা বলেছিলেন। এই দেশেই সর্বপ্রথম ১ থেকে ৯ পর্যন্ত গণনাঙ্ক ও শূন্যের ব্যবহার আবিষ্কৃত হয়—পৃথিবীর সভ্যতায় এটা মস্ত বড় একটা দান। এই এক থেকে দশ ধরে গণনা পদ্ধতি থেকেই দশমিকের আবিষ্কার। পাটীগণিত ও বীজগণিত মুখ্যত হিন্দুদেরই বিজ্ঞান। পাটী ও বীজ-

গণিতে হিন্দুরা আরবের শিক্ষাদাতা এবং আরবের মারফতে সমস্ত জগতের। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত (সপ্তম শতাব্দী) ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাস্করাচার্য নিউটনের পূর্বে ব্যাসকলনের (Differential calculus) মূলসূত্র আবিষ্কার করেন। নিউটনের আবির্ভাবের পূর্বে জগতে ভাস্করাচার্যের মতো গণিতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেননি। যদিও পরবর্তীযুগে গ্রীকরা হিন্দুদের চেয়ে জ্যামিতিতে অধিকতর উন্নতি লাভ করেছিল, তবুও বৈজ্ঞানিক-ভাবে জ্যামিতির চর্চা প্রথম ভারতবর্ষেই শুরু হয়। হিন্দুরা জগতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্মদাতা—শুধু তাই নয়, প্রাচীনকালে হিন্দু চিকিৎসকরা সমস্ত এশিয়াখণ্ডে এমনকি সুদূর মিশরেও চিকিৎসার জন্য যেতেন।

হিন্দুরা প্রথম সোনা আবিষ্কার করে এবং লোহার যৌগিক পদার্থ থেকে লোহা তৈরীর প্রণালী অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। লোহা প্রস্তুত ও গালাই বিষয়েও প্রাচীন হিন্দুদের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি ছিল। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ আজও তার সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান। সে যুগে ইস্পাত তৈরি বিষয়েও হিন্দুজাতি সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। মধ্যযুগে বিখ্যাত ডামাস্কাস তরোয়াল হিন্দুদের দ্বারা ভালো ইস্পাত তৈরি করার প্রণালী আবিষ্কারের ফলেই সম্ভবপর হয়েছে। ঐতিহাসিক প্লিনির (প্রথম শতাব্দী) মতে ভারতবর্ষেই সবচেয়ে ভালো কাচ তৈরি হত। মৌর্যরাজত্বের আগেই ভারতবর্ষে কাচ প্রস্তুতের প্রণালী খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ প্রচুর অর্থসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, তা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির আলোচনার ফলে নয়, হিন্দুরা 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' করে সাগরের তলদেশ ও ভূগর্ভ থেকে মণিরত্ন আহরণ করত বলেই। তারা ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক প্রধান স্থানে বাণিজ্যের জন্য যাতায়াত করত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই তাদের বাণিজ্য জাহাজ দেশ-বিদেশে যেত। ফলে সুন্দর একটি নৌশিল্প গড়ে উঠেছিল। জাহাজ যাতায়াতের সময় দিক ঠিক করবার জন্য তারা 'মাছযন্ত্র' (তেলের উপরে ভাসমান চৌম্বিকশক্তিসম্পন্ন মৎস্যাকৃতি লৌহযন্ত্র) ব্যবহার করত। অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দু গণকরা দিক ঠিক করবার জন্য চুম্বক ব্যবহার করত।

মঞ্জিষ্ঠা ও নীলের দ্বারা সুতা পাকা লাল ও নীল রঙ করার প্রণালী ভারতবর্ষে স্মরণাতীতকাল থেকেই চলতি ছিল। ফিটকারী নামক রাগবন্ধনীর সাহায্যে মঞ্জিষ্ঠার দ্বারা তারা বেশ টকটকে পাকা লাল রঙ প্রস্তুত করত। রাগবন্ধনীর এবং নীলের পাতা থেকে নীল রঙের আবিষ্কারও হিন্দুদের। ফলিত রসায়নের এই সমস্ত ও অন্যান্য আবিষ্কারের ফলে জগতের ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় নানাপ্রকারের গন্ধ-দ্রব্য, প্রসাধনের জিনিস, চুলের কলপ ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রণালী রয়েছে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তো কথাই নেই! এমন সাহিত্য সৃষ্টি প্রাচীন জগতে আর কোথাও হয়নি। শুধু তাই নয় জগতের যে কোনো আধুনিক সাহিত্যের পাশেও ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য স্থান পেতে পারে। ব্যাকরণেও হিন্দুদের সমকক্ষ প্রাচীন জগতে কোনো জাতি ছিল না। বর্তমান ভাষাবিজ্ঞানের সৃষ্টির মূলে ভাবতীয় বৈযাকরণিকবা—একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। ভারতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষের কারণ সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত হার্টমুট পিপার লিখেছেন 'এই অপূর্ব সাহিত্য কঠোব পবীক্ষা ও নৈতিক শিক্ষা সংযুক্ত খুব উন্নত ধরনের বিচারবুদ্ধি প্রণোদিত শিক্ষাপ্রণালীর পরিণত ফল। সুপণ্ডিত আচার্যের কাছে ছাত্ররা নিজেরাই এসে জুটে যেত, ফলে বহু বিশ্ববিদ্যালয় আপনি গড়ে উঠেছিল। এই সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হয় সবকারী সাহায্যে নতুবা দেশের লোকের ব্যক্তিগত বদান্যতার উপর নির্ভর করে চলত।'

তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, নালান্দা, কাশী, কাঞ্চী, বিক্রমশীলা, মাদুরা, বলভী প্রভৃতি বহু বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনি, খ্যাতনামা চিকিৎসক জীবক ও অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা সুপণ্ডিত ও চতুব রাজনীতি-বিদ কৌটিল্য—তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই তিনজন কৃতী ছাত্র—জগতের যে কোনো দেশের যে কোনো যুগের শ্রদ্ধার পাত্র। প্রাচীন গ্রীসে এ্যাথেন্স যেমন সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা ঠিক তেমনি—অবশ্য তক্ষশিলা এ্যাথেন্সের চেয়ে প্রাচীনতর। পরবর্তী যুগে নালান্দাও বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। ইউয়ান চোয়াং যখন সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন সেই সময় নালান্দায় দশহাজার ছাত্র গুরুদের সঙ্গে একত্র বাস করে পড়াশোনা করত। খাওয়া, পোশাক, বিছানা ও ওষুধের খরচ ছাত্রদের বহন করতে হত না—ঘরভাড়া তো ছিলই না,

শিক্ষকদেরও কিছু দিতে হত না। এই ধরনের ব্যবস্থাসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে বর্তমানে নেই, এমন কি বর্তমানে তা কেউ কল্পনাও করতে পারেন না। আজকাল যেমন লোক শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করবাব জন্য ইউরোপ, আমেরিকায় যায়, একসময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্ররা ভারতবর্ষে আসত।

সম্রাট অশোকের সময়েই খুব সম্ভবত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। এ সময় না হলেও খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে বেশি ছিল তা নিশ্চিত। হ্যাভেলের মতে 'অন্তত আদর্শ হিসাবে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থাপকরা বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার চেয়ে সাধারণ শিক্ষার অনেক শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন।' অর্থাৎ প্রাচীন ভারতে শিক্ষার অবস্থা বর্তমানের চেয়ে ভালো ছিল। পিপার দুঃখ করেই লিখেছেন 'যে জাতি অন্য সমস্ত জাতির এক হাজার বছর আগে খুব একটা উচ্চ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল—যখন ইউরোপ এক প্রকার নিরক্ষর ছিল—যে জাতি ইউরোপের বহু পূর্বে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল, এবং যে জাতি অন্য সব জাতির চেয়ে অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা গৌরবের মনে করেছে, আজ সে জাতির শতকরা ৯৫ জন নিরক্ষর।'

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও ভারত গৌরবময় স্থান অধিকার করেছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগেকার সুকল্পিত মোঅন্জোদড়ো ছিল সেকালে জগতে সর্বোত্তম শহর। গুপ্তযুগের শিল্পকলা বেশ উন্নত ধরনের ছিল। অজন্তার প্রাচীর-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর-চিত্রের সমকক্ষ। সারনাথের উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি অঙ্গবিন্যাস ও কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। সাঁচি, ভারহুত, মথুরা, অমরাবতী, সারনাথ, অজন্তা, এলোরা, তাঞ্জোর, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলা নয়নমনমুগ্ধকর। কার্লে গুহার কারুকার্য গুহাকারুকার্য হিসাবে জগতে শ্রেষ্ঠ। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে এলোরার কৈলাসনাথের মন্দির জগতের অন্যতম আশ্চর্য জিনিস।

মোট কথা অতি প্রাচীনকাল থেকেই হিন্দুমনের একটা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিকাশ হয়। তাই ভারতবর্ষে শুধু যে রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও গণিত, ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধেই অনেক পুস্তক রয়েছে তা নয়,

শিল্প, সঙ্গীত, নাট্যকলা এমন কি কামশাস্ত্র সম্বন্ধেও সুচিন্তিত পুস্তক লেখা হয়েছে। ভিন্‌টারনিট্‌সের ভাষায় বলতে গেলে, প্রাচীন যুগে ভারতীয়েরা পণ্ডিতের জাতি ছিল, যেমন বর্তমান কালে জার্মানরা।

প্রাচীন ভারত শুধু যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে অশেষ উন্নতি লাভ করেছিল তা নয়, তার রাষ্ট্রব্যবস্থাও খুব সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। হ্যাভেলের মতে 'বিংশ শতাব্দীতে একজন ইংরেজ কৃষক ইংলণ্ডে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা উপভোগ করে, মুসলমান আক্রমণের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতীয় কৃষক তাব চেয়ে অধিক সুবিধা উপভোগ করত। ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকাবের জন্য ভারতবর্ষে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি।' অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষে অতুলনীয় গ্রাম্য স্বায়ত্বশাসনপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। বাণিজ্যের দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জন কবে প্রাচীন ভারতবর্ষ ধনসম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

হিন্দুদেব সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় অভিযোগ এই যে তারা ইতিহাস লিখতে পারত না বা লিখত না। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে এ অভিযোগের মধ্যে অনেকটা সত্য রয়েছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ভালো কবে প্রণিধান করলে এর ভিত্তিহীনতাই প্রমাণিত হয়। ব্রাহ্মণরা সাধারণত রাজাদের কীর্তিকলাপ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করার কোনো চেষ্টা করেনি, কিন্তু নৃপতিরা নিজ নিজ কাহিনী লিপিবদ্ধ করার জন্য তাঁদের দরবারে সভাকবি নিযুক্ত করতেন। বাণভট্টের হর্ষচরিত, বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, চন্দবরদইর পৃথ্বিরাজ রাসো, বাকপতিরাজের গউড্‌বহো, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত আজও সভাকবিদের কীর্তি ঘোষণা করছে। কহ্লণের রাজতরঙ্গিনী কাশ্মীবের ইতিহাস। ভারতবর্ষের উপর দিয়ে বহু রাষ্ট্রবিপর্যয় চলে গিয়েছে, তদুপরি ভারতীয় জলবায়ুর প্রভাবেও অনেক পুস্তক নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাজেই মাত্র অল্প কয়েকখানাই টিকে আছে। ইতিহাসের অভাব হিন্দুদের অজ্ঞতা বা ঔদাসীন্যের পরিচায়ক নয়। সম্রাট অশোক শিলাগাত্রে যেভাবে তাঁর রাজত্বের অনেক ঘটনা লিখে রেখেছেন তা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

রাজাদের ইতিহাস বা কাহিনীর অভাব হলেও সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার ভিতর দিয়ে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়—যেমন বেদ থেকে বৈদিক যুগের সভ্যতার বেশ একটা চিত্র

পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে কৃষি ও পশুপালন প্রধান কাজ ছিল। নিজেদের সমিতিতে বা সম্মিলিত সভায় রাজনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা হত। নির্বাচিত রাজা যুদ্ধের সেনাপতিত্ব এবং বিচারবিভাগের কর্তৃত্ব করতেন। রাজসমন্বিত প্রজাতন্ত্র তখনকার শাসনপ্রথা ছিল। তারা বাণিজ্যের জন্য দেশভ্রমণ ও সমুদ্রযাত্রা করত, ক্রয়বিক্রয়ে মুদ্রার ব্যবহার ছিল। বড় বড় অট্টালিকা ছিল, সোনার অলঙ্কার ব্যবহৃত হত। পশমের সুতা থেকে বস্ত্র প্রস্তুত হত। বাল্য-বিবাহ ছিল না, বয়স্থা মেয়েরা নিজেরা স্বামী পছন্দ করত এবং অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে বিয়ে হত। সম্পূর্ণ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল। মেয়েরা ছেলেদের মতোই লেখাপড়া শিখত। ধর্মকার্যে তাদের পুরুষের সমান অধিকার ছিল। মেয়েদের মধ্যে ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রভৃতি ঋষির নাম পাওয়া যায়। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ ধর্মানুষ্ঠান উপলক্ষে এবং আহারের জন্য হত্যা করা হত। চিকিৎসার জন্য ব্যবসায়ী কবিরাজের উল্লেখ আছে। কবিরাজরা যে শুধু ওষুধই ব্যবহার করতেন তা নয়, অস্ত্রচিকিৎসাও জানতেন। বৈদিক যুগে লোহা ছিল কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। তারা মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করত। কিন্তু এই বহু দেবতা যে বাস্তবিক একই 'একংসদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'—এই সমস্ত দেবতা একই, বিপ্ররা তাকে বহু বলে থাকেন—এরূপ বাক্যও ঋগ্বেদে রয়েছে।

এ সমস্ত থেকে মনে হয় ঋগ্বেদে যে সভ্যতার চিত্র আছে, তা মোটেই একটা সভ্যতার প্রারম্ভের চিত্র নয়, অনেকদূর অগ্রসর অবস্থার চিত্র। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুস্তক থেকেও আমরা ঐসব পুস্তকের কালের সভ্যতার চিত্র পাই। শান্তিপর্বে দেখা যায়, অত্যাচারী রাজাকে হত্যা করার ব্যবস্থা ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি স্বীকার করে নিয়েছে। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহ সত্ত্বেও মনে হয় সেকালে সমাজে এক স্ত্রীর বহু স্বামী গ্রহণ করার প্রথা চলতি ছিল না। দ্রৌপদীর এই বিবাহ নিয়ে আপত্তি হয়েছিল, সেই আপত্তি খণ্ডন করার জন্য প্রাচীনকালের উদাহরণই দেওয়া হয়েছে; এই ব্যবস্থা সেকালে ভারতবর্ষের কোথাও যে চলতি ছিল এমন কথার বিন্দুমাত্র আভাসও নেই। রাজসূয় যজ্ঞের সময় কিরূপ ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ করতে হবে এ নির্দেশ দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠির সম্মানার্হ ও সম্বিধান শূদ্রদেরও আমন্ত্রণ করতে বলেছিলেন। এর অর্থ এই যে মহাভারতের যুগে শূদ্ররা বারো

লেখাপড়া করে সদ্বিদ্বান হত এবং রাজদরবারে সম্মানও পেত। তবে প্রধান অসুবিধা এই যে এই সমস্ত পুস্তকের কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে আকাশ পাতাল ভেদ বর্তমান। এই পুস্তকে ঋগ্বেদ বা ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধে যে কাল গৃহীত হয়েছে তা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত এ কথা বলতে পারি না। ভবিষ্যতে গবেষণার ফলে হয়তো সঠিক কাল নির্ণীত হয়ে যাবে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঋগ্বেদ জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ এবং ভারতীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন।

এসব সত্ত্বেও অনেকে, বিশেষ করে যাঁরা বাইরের দিকটা দেখে বিচার করেন সেইসব ইউরোপীয় পণ্ডিত, ভারতীয় সভ্যতা বলে কোনো একটা জিনিসের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না। তাঁরা বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন প্রকারের আচার ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে এ কথাই প্রমাণ করতে চান যে একজাতীয়ত্ব বা একসভ্যতা বলে কোনো একটা জিনিস ভারতবর্ষে গড়ে ওঠেনি। এই বৈষম্যের মধ্যেও যে সুমহান ও সুনিবিড় ঐক্য বর্তমান রয়েছে তার সন্ধান তাঁরা পাননি।

হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রতিদিন 'গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রধান প্রধান নদীর দ্বারাই যে শুধু একজাতীয়তা গড়বার চেষ্টা হয়েছিল তা নয়, প্রাচীনকালে কাশী, কাঞ্চী, হরিদ্বার, মথুরা, অযোধ্যা, দ্বারাবতী (দ্বারকা), উজ্জয়িনী (অবন্তীপুর) এই তীর্থস্থানগুলিই যে হিন্দুর সাতটি প্রধান তীর্থস্থান বলে গণ্য হত, তা ছিল সমস্ত ভারতব্যাপী। যে বিশ্বাস নিয়ে দক্ষিণ ভারতের লোক দুর্গম পর্বতের মধ্য দিয়ে প্রায় বরফে ঢাকা কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমে যায় ঠিক সেই বিশ্বাস নিয়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের লোক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যায়।

সমস্ত হিন্দুই বেদকে তাদের প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকার করে। যা কিছু বেদবিরোধী তা-ই অহিন্দু! অন্য সব শাস্ত্রই ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রাহ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বেদকে মেনে চলে। আজও অধিকাংশ হিন্দুর মতে সংস্কৃত পবিত্র ভাষা। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রভাব আসমুদ্রহিমাচল। 'মহাভারতের কথা অমৃতসমান, কাশীরামদাস কহে শোনে পুণ্যবান'—এই ভাব অল্পাধিক সর্বত্রই বর্তমান।

তেরো

রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়েও একত্বের ভাব রয়েছে। রাজচক্রবর্তী বা এক রাজার অধীনে অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তোলার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা সেই ভাবকেই দৃঢ় করে। যদিও প্রাচীনকালে সমস্ত ভারতবর্ষ কখনো এক রাজার অধীনে আসেনি তবুও সমস্ত রাজাই যে এক স্বার্থসূত্রে গ্রথিত ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার প্রমাণ। সেই যুদ্ধে দ্বারকা, আসাম, গান্ধার প্রভৃতি ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ থেকেই রাজসৈন্যরা গিয়ে সমবেত হয়েছিল।

সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে বর্তমান মহীশূর রাজ্যের উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কলিঙ্গ বিজয়ের পর যুদ্ধের ভীষণ লোকক্ষয়কর পরিণাম দেখে যদি অশোকের প্রাণ ব্যথিত না হত, তা হলে খুব সম্ভবত সমস্ত ভারতবর্ষ এক রাজচক্রবর্তীর অধীনস্থ হত। সেজন্য অবশ্য আমাদের দুঃখ করার কিছু নেই—দাক্ষিণাত্য বিজয়ের চেয়ে অনেক বড় বিজয় আজও অশোকের কীর্তি ঘোষণা করছে। সমস্ত ভারতবর্ষ, সিংহল, পশ্চিম এশিয়া, এমন কি আফ্রিকা ইউরোপেও অশোক বুদ্ধের বাণী প্রচার করেছিলেন। বলতে গেলে এক সময় সমস্ত এশিয়াখণ্ডই ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল।

মধ্য-এশিয়ার খোটান প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। তক্ষশিলা অঞ্চল থেকে একদল ভারতবাসী খোটানে গিয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল—এ প্রবাদের মূলে কতকটা সত্য আছে। সেখানে প্রাকৃত ভাষা কথ্যভাষা ছিল, খরোষ্ঠী ও ব্রাহ্মীলিপি ব্যবহৃত হত এবং বৈশ্রবণ বা কুবেরের উপাসনা বেশ প্রচলিত ছিল। শাসকশ্রেণীও অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন।

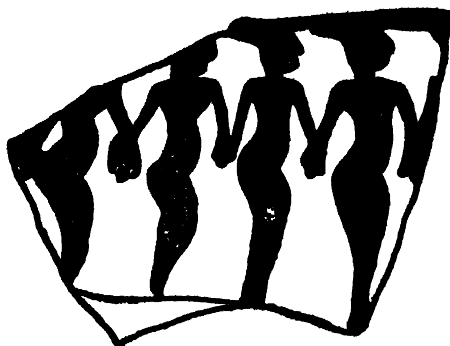
আনাম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও যব ও বলীদ্বীপে এবং সিংহলে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। আজও বলীদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী হিন্দু। মালয় উপদ্বীপ, আনাম, কাম্বোডিয়া, সুমাত্রা, বোর্নিও, যব ও বলীদ্বীপ এক সময়ে বৃহত্তর ভারতের অংশ বলে পরিগণিত হত। হিন্দুসভ্যতার প্রভাব প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন, নিউগিনি এবং ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কর পর্যন্তও বিস্তৃত হয়েছিল। 'সুদূরপ্রাচ্যের (চীন, কোরিয়া ও জাপান) শিল্পকলায় ভারতীয় ভাব ও বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান'

(কুমারস্বামী)। জাপানী পণ্ডিত ওকাকুরার মতে শুধু ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধের মতবাদ নয়, ভারতের সমস্ত চিন্তাধারা জাপানী জীবনকে পরিবর্তিত বা ভাবান্তরিত করেছিল। জাপানে তুলার চাষ প্রচলন একজন ভারতীয়েরই কীর্তি। অতীশ দীপঙ্কর বুদ্ধের বাণী তিব্বতে জনপ্রিয় করেছিলেন।

মোট কথা একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় অর্থসম্পদে ও কর্মক্ষমতায় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। এর মূলে স্বাধীন চিন্তা এবং অশেষ বাধা সত্বেও চিন্তানুযায়ী কর্ম করার ক্ষমতা। আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রত্যেক কর্ম অক্ষরে অক্ষরে অনুকরণ না করে তাঁদের স্বাধীন চিন্তাবৃত্তি ও কর্মক্ষমতার অনুকরণ করি, তাহলে আমরাও পুনরায় জগতে গরিমাময় স্থান লাভ করতে পারব। স্বাধীন চিন্তা করে যদি দেশের ও সমাজের কল্যাণের জন্য অনেক বিষয়ে তাঁদের অবলম্বিত পথ ছেড়ে অন্য পথও ধরি, তবু তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের মস্তকের উপর বর্ষিত হবে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। এই উদারতা ও মহত্বই হিন্দু সভ্যতার বিশেষত্ব। সেই উদারতা ও মহত্ব আমাদের প্রাণে প্রাণে, অস্থিমজ্জায়, শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রতি রক্তবিন্দুতে সঞ্জীবিত হোক—এই পুস্তক লিখতে গিয়ে এই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।



গ্রন্থসজ্জার চিত্রগুলি সিন্ধু-উপত্যকার অঙ্কিত মৃৎশিল্পের
বিভিন্ন নমুনা থেকে সংগৃহীত



প্রথম পরিচ্ছেদ

সাহিত্য

ইটালীর স্বাধীনতা-মন্ত্রের উদ্গাতা ম্যাটসিনি লিখেছেন ফরাসীদেশের অন্তর্গত ব্রিটানীর নাবিকরা সমুদ্রযাত্রার প্রাক্কালে ভগবানকে উদ্দেশ করে বলতেন 'আমার জাহাজ এত ক্ষুদ্র আর তোমার সমুদ্র এত বৃহৎ।' প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে ঐ নাবিকদের প্রাণের অন্তরতম প্রদেশের কথাই আমার বারবার মনে আসছে। জানি না কবি বাণভট্ট 'অলব্ধ বৈদগ্ধ্য'—পাণ্ডিত্য লাভ না করে অদ্বিতীয় কাদম্বরী কথা লিখেছেন কিনা, কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাকে মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করতে হবে যে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ না করেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই। অশেষ রাষ্ট্রবিপর্যয়ের ফলে, বিশেষ করে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের অত্যাচারে অনেক বৌদ্ধবিহার এবং হিন্দুমন্দির ধ্বংস হওয়ায় যদিও অনেক পুস্তক নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত বহু পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। জার্মান প্রাচ্যবিত্তাবিদ ডাক্তার বিউহ্লার উনবিংশ শতাব্দীতে কাম্বেতে দুটি জৈন বিহারে ত্রিশ হাজার ও তাঞ্জোরের প্রাসাদ-লাইব্রেরিতে (প্রাচীন নাম সরস্বতী ভাণ্ডার) বারো হাজার পুস্তক দেখেছিলেন। ম্যাকডোনেলের মতে তাঞ্জোর, মাদ্রাজ, পুণা, কাশী ও কলিকাতা এই পাঁচটি স্থানের প্রত্যেক জায়গার লাইব্রেরিতে বারো হাজার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আছে এবং অক্সফোর্ডের বডলিন

লাইব্রেরিতেও প্রায় দশ হাজার পাণ্ডুলিপি আছে। কে জানে কত হাজার হাজার পুস্তক কালের অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে! কত পণ্ডিতের অশেষ সাধনার ফল থেকে যে আজ আমরা বঞ্চিত তা কে বলতে পারে! অনেক পণ্ডিত ও পুস্তকের নাম আজ শুধু অন্য পণ্ডিতের পুস্তক থেকে পাওয়া যায়। কালিদাস খ্যাতনামা নাট্যকার হিসাবে ভাস, সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের উল্লেখ করেছেন। ভাসের নাটকগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবিষ্কৃত হয়েছে (অবশ্য এই সব নাটক ভাসের কিনা, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে); কিন্তু সৌমিল্ল ও কবিপুত্রের কোনো নাটক এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। পাণিনির পূর্ববর্তী চৌষট্টিজন বৈয়াকরণিকের কোনো পুস্তক আজও পাওয়া যায়নি। আজও পদ্মনাভ ও শ্রীধরাচার্যকৃত বীজগণিত আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, গুণের দিক দিয়েও ভারতীয় সাহিত্য অতুলনীয়। ভিনটারনিট্‌সের মতে ভারতীয় কাব্য ও নাটক, মাধুর্য ও প্রগাঢ়তার দিক দিয়ে ইউরোপের উৎকৃষ্ট আধুনিক কাব্য ও নাটকের সঙ্গে স্থান পেতে পারে। সাহিত্য বলতে ব্যাপক-ভাবে যা বোঝায়, ভারতীয় সাহিত্য সে হিসাবেও পূর্ণাঙ্গ। মানুষের চিন্তার এমন কোনো দিক নেই, যে দিকে ভারতীয় সাহিত্য তার অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দেয়নি। মহাকাব্য, কাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, গল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, অভিধান, শিল্পকলা, সঙ্গীত, নৃত্য-কলা—সকল বিষয় সম্বন্ধেই বই রয়েছে। এ ছাড়াও জগতের অন্য কোনো দেশের সাহিত্যে যা নেই, বা কোনোদিন ছিল না, এমন একটি অতি সুন্দর জিনিসও ভারতীয় সাহিত্যে আছে—তার নাম সূত্র-সাহিত্য। আবার প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বলতে শুধু তো সংস্কৃত সাহিত্যকেই বোঝায় না। যদিও সংস্কৃত সাহিত্যের পাশে পালি বা তামিল সাহিত্য আকাশে পূর্ণচন্দ্রের কাছে তারকার মতো, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে তাদের স্থান নিতান্ত নগণ্য নয়। বিস্তৃতভাবে সংস্কৃত, পালি ও তামিল সাহিত্যের আলোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তাই সংক্ষেপে সাহিত্যে হিন্দু প্রতিভার কিছু আভাস দিয়েই সন্তুষ্ট হতে হবে। পরবর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে লেখা হবে, কাজেই, এই অধ্যায়ে, বিশেষভাবে সাহিত্য বলতে যা বোঝায় সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করব।

১ সংস্কৃত সাহিত্য

প্রাচীন ভারতে সমস্ত কাজের উৎস ছিল ধর্ম। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ধর্ম-সাহিত্যই প্রথম সৃষ্টি। ঋগ্বেদ হিন্দুদের প্রাচীনতম গ্রন্থ। সাম, যজু ও অথর্ব নামক আরো তিন বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ প্রভৃতি বৈদিক ধর্মগ্রন্থের কোনো কোনোটিতে যদিও কবিত্ব শক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়, তবুও কাব্য হিসাবে রামায়ণ ও মহাভারতই ভারতবর্ষের দুটি প্রাচীনতম মহাকাব্য। এই দুটি কাব্য উচ্চাঙ্গের ধর্মগ্রন্থ কিনা তা জানি না, কিন্তু এই দুই মহাকাব্যই ভারতবর্ষের প্রাণের মূর্তবিগ্রহ তা নিঃসন্দেহ। বৈজ্ঞানিকরা অনেক জিনিসেরই নির্যাস তৈরি করতে পারেন কিন্তু মানুষের বা জাতির প্রাণের নির্যাস তৈরি করতে তাঁরা এখনও শেখেননি। বাল্মীকি ও ব্যাস—এই দুই মহাকবি বা মহা-বৈজ্ঞানিক যে ভারতবর্ষেব প্রাণের নির্যাস তৈরি করে গেছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের বিন্দুমাত্র স্থানও নেই। কত ভাবধারার স্রোত ভারতবর্ষের উপর দিয়ে এসেছে ও চলে গিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের অদ্ভুত মোহিনীশক্তি আজ আড়াই হাজার বৎসরেরও অধিক পরে তেমনি অব্যাহত। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ আজও রামায়ণ মহাভারত পাঠ ও শ্রবণ করে। এই মাটিতে মৃদঙ্গ হয়েছিল বলে যারা ধূলায় গড়াগড়ি দেয়, কিংবা প্রহ্লাদের মতো ক-অক্ষর দেখলে যাদের চোখ জলে ভরে যায়, তাদের কথা আমি বলছি না। যারা আমাদের অতীতের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপাদনকারী আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, অথচ বিকৃত মন নয়, এবং সব কিছুতেই নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত, এমন লোকদেরও রামের বনগমনের সময় দশরথ ও কৌশল্যার নিকট বিদায়কালীন বর্ণনা পাঠ ও শ্রবণ করতে করতে কণ্ঠরোধ ও চক্ষু ভারাক্রান্ত হতে দেখেছি। এমন করুণ অথচ মহৎ রসে পরিপূর্ণ বর্ণনা অতুলনীয়। আমার মনে হয় এখানেই বাল্মীকির কবি-প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে রামায়ণই বেশি জনপ্রিয়। তার প্রধান কারণ বাল্মীকি রামায়ণে আমাদের ঘরের কথা অতি সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ও মধুরভাবে ব্যক্ত করেছেন। রামায়ণে রামচন্দ্র অবতার নন, নরচন্দ্রমা। উত্তরকাণ্ডের পাতায় পাতায় অবশ্য রামচন্দ্রকে অবতার বলেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু সমস্ত উত্তরকাণ্ডটিই প্রক্ষিপ্ত। মূল বাল্মীকির

রামায়ণে রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পরই রামায়ণ সমাপ্ত একথা রয়েছে। উত্তরকাণ্ডটি রামায়ণের অংশ হলে কাব্য হিসাবেও রামায়ণ খর্ব হয়ে যেত। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নেই। হিন্দুপ্রাণ সে দুঃখকেই বোঝে —যে দুঃখ আনন্দকে আরো মধুর করে তোলে। হিন্দু সেই বিরহই সহ্য করতে পারে—যে বিরহ মিলনে পরিপূর্ণতা লাভ করে। আত্যন্তিক দুঃখে যার পরিসমাপ্তি হিন্দুর স্নেহপ্রবণ প্রাণ তা সহ্য করতে পারে না। উপনিষদ সেই কথাই জোর করে বলছে: 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি'—আনন্দ হতেই জীবের জন্ম, আনন্দেই জীবনযাত্রা এবং অবশেষে আনন্দেই লয়। তাই বাল্মীকির মতো মহাকবি যদি সীতার বনবাস ও পাতাল প্রবেশ লিখতেন, তাহলে তাঁকে হিন্দুপ্রাণবেত্তা বলে স্থান দেওয়া যেত না। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে সারা বাঙলায় এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে সীতার জীবন দুঃখেই পরিসমাপ্ত। তাই, যদিও সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী নারীজাতির আদর্শ, তা সত্বেও কোনো বাঙালী মেয়ের নাম সাধারণত সীতা রাখা হয় না। কিন্তু দময়ন্তীর দুঃখের যেমন নলের সঙ্গে পুনর্মিলনে পরিসমাপ্তি, সত্যবানের পুনর্জীবন লাভে যেমন সাবিত্রীর দুঃখের অবসান, তেমনি সীতার সমস্ত বিরহ বেদনার অবসান হয়েছিল রাবণ বধ ও অগ্নিপ্রবেশের পর রামচন্দ্রের সঙ্গে পুনর্মিলনে। উত্তরকাণ্ড বাদে, সমস্ত রামায়ণে তিন জায়গায় রামচন্দ্রকে অবতার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিতান্ত খাপছাড়া ভাবে, বিনামেঘে বজ্রপাতের মতো ঐ সমস্ত কথা যেভাবে এসে পড়েছে, তাতে মনে হয় সত্যিসত্যিই এ সমস্ত প্রক্ষিপ্ত। সর্বজনপ্রিয় একটা কাব্যের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক মত জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা স্বাভাবিক। এমন কি বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি শ্রীচৈতন্যদেবও সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন লোক সমাজে সহজে তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য। চারি অংশে বিষ্ণু, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন রূপে জন্মগ্রহণ যে ভাবে রয়েছে, তাতে স্পষ্টই মনে হয়, কোনো ভক্ত পরবর্তীকালে এসব সংযোজিত করে দিয়েছেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন রামায়ণ ও মহাভারত মুখ্যত ক্ষত্রিয় সাহিত্য, পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা এর মধ্যে অনেক জিনিস ঢুকিয়েছেন। অনেক জিনিস যে ঢুকেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই, কিন্তু কে ঢুকিয়েছেন একথা জোর করে বলা শক্ত। রামায়ণ লিপিবদ্ধ হওয়ার বহু পূর্বে কুশীলবদের দ্বারা গীত হত।

শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁদের মানসিক অবস্থা বুঝে কথকরা নিজেদের মনগড়া অনেক কথা বলেন—এ জিনিস যাঁরা কথকতা শুনেছেন তাঁরা সকলেই জানেন। মনে হয় এভাবেই কুশীলবদের দ্বারা মূল রামায়ণে অনেক জিনিস স্থান পেয়েছে। সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির প্রভাবে যে কিছু রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত হয়নি আমি এমন কথা বলছি না। রামচন্দ্রকে বন থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য জাবালী যে সমস্ত যুক্তি দিয়াছিলেন, তা খণ্ডন করতে গিয়ে 'বৌদ্ধমতানুসারী নাস্তিকগণ চোরের ন্যায় দণ্ডার্হ' এমন কথাও রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করানো হয়েছে। একথা যে বৌদ্ধদের উপর বিদ্বেষবশত পরবর্তীকালে লেখা হয়ে রামায়ণে রামচন্দ্রের মুখে স্থান পেয়েছে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। রামচন্দ্রের সমস্ত যুক্তির প্রায় শেষ দিকে নিতান্ত অশোভন ভাবে একথা যুক্ত করা হয়েছে। ঐ কথা ক'টি বাদ দিলেই আগাগোড়া রামচন্দ্রের যুক্তিতে বেশি সামঞ্জস্য পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের মুখ দিয়ে এভাব ব্যক্ত হলে সমাজে বৌদ্ধদের প্রতিপত্তি খর্ব হওয়ার সুবিধা হবে বলে, একথা তাঁর মুখ দিয়ে ব্যক্ত করানো হয়েছে। যে সঙ্কীর্ণচেতাই একাজ করে থাকুন তিনি রামায়ণের মহিমাকে খর্ব করারই চেষ্টা করেছিলেন এই আমার নিশ্চিত মত। একই বইয়ের কত অদল বদল হতে পারে তা মূল বাল্মীকি-রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী-রামায়ণ তুলনা করলেই বেশ বোঝা যায়। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব নেই, মহীরাবণের কোনো উল্লেখ নেই, তরণীসেনের কাটামুণ্ড 'রাম' 'রাম' করা দূরে থাকুক তরণীসেনের নাম-গন্ধও নেই। 'সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি বীরবাহু' এই বাক্য দিয়ে কবি মাইকেল মধুসূদন তাঁর মেঘনাদ বধ কাব্য আরম্ভ করেছেন। কিন্তু এই বীরবাহু বধ বা তাঁর সম্মুখ সংগ্রাম কিছুই বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। মাইকেল কৃত্তিবাস অবলম্বনেই এরকম লিখেছেন। রত্নাকর দস্যু কোনোরকমে 'মরা' 'মরা' বলতে বলতে একবার রামনাম উচ্চারণ করাতেই পুণ্যাত্মা হয়ে গেলেন এ-কথাও বাল্মীকি-রামায়ণে নেই। এ ছাড়াও ছোটো-খাটো আরো অনেক পার্থক্য রয়েছে। হনুমানের মন্দোদরীর কাছ থেকে রাবণের মৃত্যুবাণ অপহরণের কথা বা রামচন্দ্রকে রাবণের রাজনীতি শিক্ষার কোনো উল্লেখও নেই। এসব থেকে রামায়ণের বিচিত্র পরিবর্তন খুবই সম্ভবপর বলে মনে হয়। সীতা হরণের পর রামচন্দ্র সাধারণ মানুষের মতোই বিলাপ করেছিলেন। আমার মতে রামচন্দ্রকে মানুষ ভাবে না দেখলে রামায়ণের

মহিমা খর্ব করাই হয়। রামায়ণ যদি অবতারের ইতিবৃত্ত হত তাহলে তা হয়তো আমাদের পূজার সামগ্রী হতে পারত, কিন্তু কিছুতেই এত আপন হয়ে উঠত না। আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গে বাল্মীকি তাঁর কাব্যের উপযুক্ত নায়ক সন্ধান করে বহুগুণের উল্লেখ করে নারদকে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন একটি মাত্র নরকে আশ্রয় করে সমগ্র লক্ষ্মী রূপ গ্রহণ করেছেন?' তখন উত্তরে নারদ বলেছিলেন, 'দেবতাদের মধ্যেও এরূপ গুণযুক্ত পুরুষ দেখি না, কিন্তু যে নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সকল গুণ আছে তাঁর কথা শোনো।' রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই ইতিবৃত্ত। অতএব এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে রামায়ণের রামচন্দ্র নরচন্দ্রমাই—অবতার নন।

আগেই বলেছি, রামায়ণে আমাদের ঘরের কথা অতি মনোরম ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের প্রগাঢ় প্রীতি ও ভালোবাসা, স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র দাম্পত্য প্রেম, পিতা-পুত্রের মধুর সম্পর্কের ছবি—কবি এমন নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন যে তার মধ্যে ভারতের প্রাণের সুর সম্পূর্ণরূপে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। দশরথ আদর্শ পিতা, রামচন্দ্র আদর্শ পুত্র, সীতা পাতিব্রত্য-ধর্মের আদর্শস্থানীয়া, ভরত ও লক্ষ্মণ আদর্শ ভ্রাতা। গার্হস্থ্য জীবনে ভারতবাসী এই আদর্শ অনুকরণ করতে চায়—তাই রামায়ণ তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত-মূর্তি। রামচন্দ্র যদি নারায়ণ ও সীতা লক্ষ্মী হতেন তবে ভারতবাসী তাঁদের আরাধনা করত, তাঁদের আদর্শ জীবনে পালন করা সম্ভব বলে কখনও প্রচার করতে পারত না, কারণ যা লক্ষ্মী-নারায়ণের পক্ষে সম্ভব তা কি কখনও সামান্য মানুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে? আদিকবি বাল্মীকি ভারতবাসীদের এত বড় অপকার সাধন নিশ্চয়ই করেননি, মঙ্গলের পথ, পরম আনন্দের পথই উন্মুক্ত করেছেন। তাই যুগ যুগ ধরে রামায়ণ ভারতবর্ষের প্রাণকে অমৃতধারায় সিঞ্চিত করছে। তাই প্রাচীন হলেও রামায়ণ প্রভাত সূর্যের মতোই চির-নবীন, চির-সুন্দর।

দশরথকে আদর্শ পিতা বলেছি-একথা শুনে হয়তো অনেকে আঁতকে উঠতে পারেন। যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমস্ত আয়োজন করে, সেই দিনই স্ত্রীর কথায় বিনা অপরাধে গুণধর পুত্র রামচন্দ্রকে যিনি জটাচীর ধারণ করে চতুর্দশ বৎসরের জন্য বনে যাওয়ার আদেশ দিতে পারেন, তাঁকে যদি আদর্শ পিতা বলতে হয় তবে দুষ্ট পিতাই বা কে, আর স্ত্রৈণই বা জগতে বলে কাকে! ইউরোপীয় লেখকদের মধ্যে এমন লোকও আছেন যিনি 'পুরাকালে ভারতবর্ষে

দশরথ নামে এক স্ত্রৈণ রাজা ছিল' একথা লিখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেননি। দশরথ স্ত্রৈণ তো ছিলেনই না, সত্যনিষ্ঠার ও অপত্যস্নেহের এরূপ অপূর্ব সমাবেশ দশরথের মতো আর কোনো ব্যক্তিতেই পাওয়া যায় না। তিনি জানতেন রামচন্দ্র নিরপরাধ, এবং চার পুত্রের মধ্যে রামই রাজা হওয়ার জন্য সর্বাধিক যোগ্য। দশরথের অপত্যস্নেহ কারো চেয়ে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। অপত্যস্নেহ সঠিক বজায় রাখতে গেলে সত্যের মর্যাদা নষ্ট হয়, অথচ সত্য রক্ষা করতে গেলে অপত্যস্নেহের উপর নিদারুণ আঘাত দিতে হয়—দশরথের কাছে এই সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল ; তখন অপত্যস্নেহ তাঁকে মোহগ্রস্ত করেনি। তিনি কঠোর সত্যের কাছে মাথা হেঁট করেছিলেন, কিন্তু তাতে তাঁর অপত্যস্নেহে যে মর্মান্তিক আঘাত লেগেছিল তা সহ্য করতে পারেননি। সেই দুঃখেই তাঁর মৃত্যু। তিনি রামকে বনে পাঠিয়ে সত্যের মর্যাদা রক্ষা করেছেন, আর জীবন দিয়ে অপত্যস্নেহকে মহিমান্বিত ও সমুজ্জ্বল করেছেন। রামচন্দ্রকে বনে যাওয়ার আদেশ দেওয়াতে দশরথের মর্মস্থলে যে কি কঠোর শেল বিদ্ধ হয়েছিল, তা একমাত্র রামচন্দ্রই কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কৈকেয়ীকে বর দেওয়া উপলক্ষ করেই কবি এত বড় কাব্যখানি সুনিপুন ভাবে গ্রথিত করেছেন। এখানেও কবি দেখিয়েছেন যে মানুষ স্বভাবতই ভালো, খারাপ নয়—সাময়িক লোভের বশবর্তী হয়েই সে অবনতির চরম সীমায় পৌছতে পারে। প্রভাতে জেগে উঠে কৈকেয়ী যখন রামচন্দ্রের অভিষেকের খবর পেলেন তখন তিনি আনন্দিতই হলেন। তারপরে মন্থরার কুপরামর্শে লোভের বশবর্তী হয়ে তাঁর এমন অধঃপতন হল যে, নিজ হাতে তিনি রামচন্দ্রের হাতে বনে যাওয়ার জন্য জটাচীর তুলে দিলেন।

কৈকেয়ীর লোভের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন ভরত। সংসারে চলতে চলতে লোভের বশবর্তী হয়ে পদস্খলন একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু একজনের পদস্খলন হলে অন্য সকলে যদি তাকে সমর্থন না করে, তবেই সংসারজীবনের মাধুর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কৈকেয়ীর পদস্খলন হয়েছিল, ভরত তাঁকে সমর্থন করেননি বলেই অযোধ্যার রাজবংশ ছারখারে যায়নি। আমার মনে হয়, রামায়ণে ভরতের চরিত্র অতি মহান, অতি বড়। রাজ্য তাঁকে বিন্দুমাত্র প্রলুব্ধ করতে পারেনি। অযোধ্যার রাজ্যে রামচন্দ্রের ন্যায্য অধিকার, তাঁকে সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাজসিংহাসনে উপবেশন করা ভরত মহা অধর্ম

বলেই মনে করেছিলেন। তাই রামচন্দ্র যখন বন থেকে ফিরে আসতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি রামচন্দ্রের পাদুকা সিংহাসনে বসিয়ে, তাঁর পুনরাগমনের প্রতীক্ষায় ফলমূলাহারী হয়ে, জটাচীর ধারণ করে, নিতান্ত দীনভাবে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। এমন ভ্রাতৃভক্তি, নির্লোভত্ব ও ন্যায়নিষ্ঠা জগতে বিরল। যাক, বলতে বলতে অনেকদূর এসে পড়েছি। রামায়ণের বিস্তৃত আলোচনা সুখকর হলেও এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নয়। রামায়ণ ও মহাভারতে ভারতবর্ষ নিজেকে নিঃশেষে ব্যক্ত করেছে। প্রত্যেক ভারতবাসীর এই দুখানি গ্রন্থ গভীর শ্রদ্ধাভরে পড়া উচিত। যিনিই ভারতবর্ষকে ভালো করে বুঝতে চান তাঁর পক্ষে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এত বড় দুখানি মহাকাব্যের গ্রন্থকার বাল্মীকি ও ব্যাস নামে সত্যিকারের কোনো ব্যক্তি ছিলেন কিনা, ভারতবর্ষ তা আজ জোর করে বলতে পারে না। ব্যাসদেব চারিবেদের সংকলয়িতা—মহাভারত, গীতাশাস্ত্র, ব্রহ্মসূত্র, পুরাণ ও পতঞ্জলির ব্যাস-ভাষ্য প্রণেতা। এই সমস্ত বিভিন্ন যুগে রচিত পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে ব্যাসের নাম উল্লিখিত হওয়ায় মনে হয় ব্যাস বলে পুরাকালে কোনো এক মহাপণ্ডিত ছিলেন, পরবর্তী যুগে তাঁর অনুকরণে অনেকেরই ব্যাস নাম রাখা হয়েছিল, কিংবা অনেকে নিজের রচনা সহজে জনপ্রিয় করার জন্য ব্যাসদেবের নাম গ্রন্থকর্তা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, অথবা ব্যাস বলে কোনো ব্যক্তি ছিলেন না, ব্যাস একটি কল্পিত ব্যক্তির নাম বা উপাধি মাত্র। বাল্মীকির নামের অপপ্রয়োগ কোথাও পাওয়া যায় না। হয়তো কোশল দেশে সত্য সত্যই বাল্মীকি নামে একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। উত্তরকাণ্ড ও অন্যান্য কাণ্ডের সামান্য সামান্য বাদ দিলে মনে হয় সমস্ত রামায়ণই একজনের রচনা। কিন্তু মহাভারত পড়লেই মনে হয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত। রামায়ণের চেয়ে মহাভারত অনেক বেশি বড় এবং মহাভারতে অনেক বেশি পরিমাণে প্রক্ষিপ্ত জিনিস স্থান পেয়েছে। মহাভারত শুধু রামায়ণের চেয়ে বড় নয়, সমস্ত জগতের সাহিত্যে এতবড় কাব্য আর নেই। মহাভারতে আখ্যায়িকার মধ্যে আখ্যায়িকার সৃষ্টি এত বেশি যে মনে হয় আজকালের অনবসর যুগে এ নিতান্তই বেসুরো। নোট পড়ে পরীক্ষা পাশ করাই যে যুগের রীতি, সে যুগে এতবড় গ্রন্থ পড়বার ধৈর্য কোথায়! কিন্তু সারাদিনের পরিশ্রমের পর, শ্রান্তি দূর করার জন্য কথকের মুখ থেকে যখন ভারতবাসী রামায়ণ

মহাভারত প্রভৃতি শুনত, তখন এর সার্থকতা ছিল বৈকি, এই সমস্ত কথকতার ভিতর দিয়েই লোকশিক্ষা হত। তার ফলে ভারতের জনসাধারণ মস্ত বড় এক সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে পেরেছে এবং এই জন্যই হ্যাভেলের মতো ইংরেজ পণ্ডিত বিংশ শতাব্দীতেও ভারতের জনসাধারণ সম্বন্ধে বলতে পেরেছেন, 'ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণ এমন কি আধুনিক ইউরোপের বৈজ্ঞানিক বর্বরদের সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে।' আখ্যায়িকার মধ্যে আখ্যায়িকা দেখে অধীর হলে চলবে না। এই সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যে নলোপাখ্যানকে একটি পৃথক কাব্য বলা যেতে পারে। পাশাখেলায় রাজ্য হারিয়ে বনবাসী হওয়ার পর, একদিন যুধিষ্ঠির বৃহদশ্ব ঋষির কাছে নিজের দুর্দশার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে তাঁর মতো মন্দভাগ্য বুঝি আর কেউ নেই। তদুত্তরে বৃহদশ্ব নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান বলে যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দেন। ভাবের মহত্ত্ব, ভাষার সৌন্দর্য—সব দিক দিয়েই নলোপাখ্যান জগতের সাহিত্যাকাশের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, একথা জোর করেই বলা যেতে পারে। নলোপাখ্যান পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে ইচ্ছা হয় না, শুধু তাই নয়, ইচ্ছা হয় বারবার পড়ি। রামের অযোধ্যা থেকে বিদায়কালীন বর্ণনার মতো চমৎকার না হলেও নলোপাখ্যানও করুণ ও মহৎ রসে পরিপূর্ণ। দময়ন্তীর পাতিব্রত্য রামায়ণের সীতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। অশেষ দুঃখের মধ্যেও নল সম্বন্ধে কোনো খারাপ ধারণা দময়ন্তী মনে পোষণ করেননি। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও এই উপাখ্যানের যথেষ্ট আদর হয়েছে। প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে, এমন কি নাটকে পরিণত হয়ে ইটালীর ফ্লোরেন্স শহরে নাট্যমঞ্চে অভিনীতও হয়েছে। জার্মান পণ্ডিত শ্লেগেল নলোপাখ্যান সম্বন্ধে লিখেছেন, 'ভারতবর্ষে অসাধারণ রূপে এটি জনপ্রিয়; যেখানে সকল দেশের সকল যুগের সৃষ্ট গ্রন্থ একত্রিত হয় সেই ইউরোপেও এটি সমান জনপ্রিয় হওয়ার যোগ্য।' নলোপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত। ঐ পর্বে বহু আখ্যায়িকা আছে, তার মধ্যে আরো দু'টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: একটি পতিব্রতা-মাহাত্ম্য বা সাবিত্রী উপাখ্যান, অপরটি রামোপাখ্যান। সাবিত্রীর পাতিব্রত্য গুণে তাঁর স্বামী সত্যবানের জীবনলাভ—এই ধারণা বাঙালীর ঘরে ঘরে চলে আসছে। সাবিত্রী আদর্শ মহিলা চরিত্র। তাই কোনো বাঙালী মেয়েকে আশীর্বাদ করতে হলে

বলে 'সাবিত্রী সমান হও।' রামোপাখ্যানে সংক্ষেপে রামায়ণের গল্পটি বলা হয়েছে। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করেছিলেন। তাঁকে উদ্ধারের পর যুধিষ্ঠির অপহরণের কথা উল্লেখ করে যখন মার্কণ্ডেয় মুনিকে তাঁর মতো হতভাগ্য আর কেউ আছেন কিনা এ প্রশ্ন করেছিলেন, তখন মার্কণ্ডেয় মুনি রাবণের সীতাহরণ ও সুগ্রীব, হনুমান প্রভৃতি বানরদের সাহায্যে রামলক্ষ্মণ কি ভাবে রাবণকে সবংশে নিধন করে সাতাকে উদ্ধার করেন, সেই কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। এই বর্ণনা মূল রামায়ণেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র। মার্কণ্ডেয় মুনিও রামচন্দ্রের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বর্ণনা শেষ করেছেন। আমার মনে হয় এখানেও উত্তরকাণ্ড লেখা হওয়ার পর, এবং রামচন্দ্রের অবতারত্ব ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত হওয়ার পর, যথাযোগ্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। রাবণ কুম্ভকর্ণ প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত মহাভারতের রামোপাখ্যানে রয়েছে। রাক্ষস বংশাবলী, রাবণ প্রভৃতির জন্মবৃত্তান্ত ও রাবণ কর্তৃক দেবদানব ও গন্ধর্ব প্রভৃতির পরাজয় উত্তরকাণ্ডেই আছে—অন্য কোনো কাণ্ডে নেই। উত্তরকাণ্ডের সঙ্গে মহাভারতের রামোপাখ্যানের পরিচয় এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহাভারতে রামোপাখ্যান ঐতিহাসিকের পক্ষে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। রামায়ণে বর্ণিত চরিত্রের উল্লেখ মহাভারতে আরো কয়েক জায়গায় পাওয়া যায় এমন কি হনুমানের সঙ্গে ভীমের সাক্ষাৎ হওয়ার উল্লেখও মহাভারতে আছে। কিন্তু রামায়ণে মহাভারতের কোনো চরিত্রের উল্লেখ নেই। এ থেকে মনে হয় রামায়ণ প্রাচীনতর অথবা রামায়ণের আখ্যায়িকা মহাভারতের আখ্যায়িকার চেয়ে প্রাচীনতর। বাল্মীকি আদি কবি এবং রামায়ণ প্রাচীনতর গ্রন্থ—এরকম প্রবাদ বা বিশ্বাস ভারতবর্ষে প্রচলিত। প্রচলিত প্রবাদও সত্য হতে পারে, আবার অন্য মতও সত্য হতে পারে, এরকম সমস্যা যখন উপস্থিত হয় তখন প্রচলিত প্রবাদকে সত্য বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিশেষ করে প্রচলিত প্রবাদের বিরুদ্ধে যখন কোনো যুক্তি নেই তখন তা মেনে না নেওয়ার কোনো কারণ দেখছি না। মহাভারতের কুন্তী, দ্রৌপদী, গান্ধারী, ভীম, অর্জুন প্রভৃতির চরিত্র রামায়ণে কৌশল্যা, সীতা, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করে ভিনটারনিট্‌স এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রামায়ণেই শ্রেষ্ঠতর সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বলে মেনে নিলে, হয়

রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে আধুনিক অথবা রামায়ণ একটা সভ্যতর সমাজের চিত্র, একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভিনটারনিটস শেষোক্ত মতই সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে রামায়ণ ও মহাভারত প্রায় সমসাময়িক, এবং রামায়ণে কোশল-দেশের এবং মহাভারতে পশ্চিম-ভারতের অপেক্ষাকৃত হীন সভ্যতার চিত্র রয়েছে। কিন্তু দ্রৌপদী প্রভৃতির চরিত্র আলোচনা করে ভিনটারনিটস যে সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন আমি তা সমর্থন করতে পারি না। মহাভারতে দর্শন, রাজনীতি প্রভৃতি যে রকম বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে তাতে মনে হয় মহাভারতই সমাজের সর্বাঙ্গীন চিত্র এঁকেছে। তিলকের মতে 'ধর্মাধর্মের, কার্যাকার্যের বা নীতির দৃষ্টিতে মহাভারতের যোগ্যতা রামায়ণের চেয়ে বেশি।' দ্রৌপদীর চরিত্র যে কোনো অংশে সীতার চরিত্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত হীন সভ্যতার পরিচয় দেয়, তা আমি ধারণা করতে পারি না। দ্রৌপদী সত্যিকারের স্ত্রী ছিলেন। তিনি প্রয়োজন মতো স্বামীদের উপদেষ্টা ও বন্ধুর আসন গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষ স্ত্রীকে এভাবেই দেখতে চায়। স্ত্রী ভারতবর্ষে সহধর্মিণী। ক্ষত্রিয় রমণীর মতো তিনি স্বামীদের দৈন্যদশা দূর করবার জন্য প্রবুদ্ধ করেছেন। নিতান্ত দুঃখদৈন্যের মধ্যেও স্বামী-সঙ্গে বনে বনে ঘুরে কষ্ট পাওয়ার চেয়ে পিত্রালয়ে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করার কথা তিনি একবারও মনে স্থান দেননি। দ্রৌপদী খুব বুদ্ধিমতী স্ত্রী ছিলেন। পাঁচ ভাইয়ের এক স্ত্রী হয়েও তাঁর ব্যবহারের দরুন পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে কোনো মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়নি।

মহাভারতে যেমন দ্রৌপদীর চরিত্র রয়েছে তেমন দময়ন্তীর চরিত্রও রয়েছে। উভয়েই রাজরানী ও পতিব্রতা। দ্রৌপদী পাণ্ডবদের রাজ্যলাভ করতে বরাবরই উদ্বুদ্ধ করেছেন। দময়ন্তী রানী হয়েও স্বামীর রাজ্যপ্রাপ্তির কথা একবারও ভাবেননি, স্বামীর সঙ্গে থাকাই পরম সুখ বলে জেনে, গৃহকোণের বধূর মতো তিনি সুখেদুঃখে স্বামীর অনুগামিনী হতে চেষ্টা করেছেন। এ শুধু মানব প্রকৃতির বৈচিত্র্যের আলেখ্য।

অর্জুন সে যুগের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ছিলেন। অজ্ঞাতবাসের সময় তিনি বিরাট রাজার গৃহে বৃহন্নলারূপে উত্তরাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেন। কৌরবদের কাছ থেকে তাঁর গোধন রক্ষা করার পর অর্জুনের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে, বিরাট রাজা কন্যা উত্তরাকে অর্জুনের হাতে স্ত্রীরূপে সমর্পণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অর্জুন নিজ ছাত্রীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ না করে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করেন। অর্জুন

দর্শনশাস্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সে যুগের সভ্যতা যে খুব উন্নত ধরনের ছিল তা এ থেকেই প্রমাণ হয়।

কুন্তী ও গান্ধারীকে ভিনটারনিট্‌স খাঁটি বীরমাতা, এবং কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে পৌরাণিক নাটকের রানীর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। এ থেকে যে রামায়ণের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব কি ভাবে প্রমাণিত হয় তা কল্পনার আতিশয্যেও ধরে ওঠা শক্ত। বরং মহাভারতের কবির শ্রেষ্ঠতর চরিত্রাঙ্কন ক্ষমতারই পরিচয় দেয়। কুন্তী সত্যিকারের বীরমাতা, তাঁর হৃদয় উদারতা ও মহত্বে পরিপূর্ণ। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী যখন বনে চলে যান তখন কুন্তীও সেবাশুশ্রূষার জন্য তাঁদের সঙ্গে যান। কৃষ্ণ সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে এক রাজচক্রবর্তীর অধীনস্থ করার সঙ্কল্প করেন। তাঁর মধ্যে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতা বলে কোনো জিনিস ছিল না। অবশ্য ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রক্তপান অতি বীভৎস। প্রকাশ্য রাজসভায় স্ত্রীর অবমাননা করাতে যে হত্যা প্রবৃত্তি ভীমের মনে জেগে উঠেছিল, তাতেই ভীমের পক্ষে এমন বর্বরোচিত কাজ সম্ভব হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে সভ্যজাতিদের মধ্যে যুদ্ধের সময় কত বর্বরোচিত কাজ যে অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই বলে ঐ সমস্ত জাতির ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখক যদি তাঁদের অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতি বলে উল্লেখ করেন, তবে ভিনটারনিট্‌স বা তাঁর মতো ঐতিহাসিকই হয়তো প্রতিবাদের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলবেন এবং তা যুক্তিযুক্তই হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ সেনাপতি কিচনার মৃত মাহ্‌দীর দেহ কবর থেকে উঠিয়ে ফাঁসি দিয়েছিলেন, তার জন্য ইংরেজ জাতি যে আফ্রিকার কোনো জাতির চেয়ে কম সভ্য এরকম মত প্রচার করার কল্পনাও কেউ করেননি। রামায়ণ ও মহাভারত যে একটি অপরটির চেয়ে সভ্যতর দেশের ও সমাজের বর্ণনা করেছে, তা যুক্তিসঙ্গত নয়; বাল্মীকি ও ব্যাস ভারতবর্ষের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে নিজ নিজ কবি-প্রতিভার দ্বারা বিভিন্নরূপে রূপ দিয়েছেন। রামায়ণ যে প্রাচীনতর এটাই নিশ্চিত। ম্যাকডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এই মত সমর্থন করেছেন। মহাভারতের একটি প্রধান চরিত্র কৃষ্ণ বর্তমানে ভারতবর্ষে বিষ্ণুর অবতার বলে পূজিত। কিন্তু যে কৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনে গোপরমণীগণ 'একে অন্যকে

লক্ষ্য না করে' কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে ছুটেছিলেন, মহাভারতের কৃষ্ণ সে কৃষ্ণ নন—মহাভারতের কৃষ্ণ বিশেষ করে কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ—যিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। মহাভারতে বৃন্দাবনলীলা নেই, বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীরাধার মানভঞ্জন তো নেইই, তাঁর নামোল্লেখও নেই। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীনন্দন কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। সেখানে কৃষ্ণের গুরু ঘোর আঙ্গিরস তাঁর শিষ্যকে এক রূপক যজ্ঞ শিক্ষা দিয়েছেন, যে যজ্ঞের দক্ষিণা—তপস্যা, দান, আর্জব (সরলতা), অহিংসা ও সত্য-বচন। মহাভারতে কৃষ্ণেব যে বাজনীতি দেখতে পাই তাতে সত্যের স্থান গৌণ, মুখ্য নয়। কৃষ্ণের পরামর্শক্রমেই যুধিষ্ঠির দ্রোণকে বধ করার জন্য বিকৃতসত্যরূপী মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ছান্দোগ্যোপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণ, আর শ্রীরাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কিনা একথা জোর করে বলা শক্ত। কিন্তু আমাব মনে হয়, একই কৃষ্ণ ভক্তদের কৃপায় ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে শিখিপুচ্ছধারী, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম, গোপীজনবল্লভ, রাধিকারঞ্জন, বংশীধর শ্যামসুন্দরে পরিণত হয়েছেন, যেমন করে ঐতিহাসিক বুদ্ধ চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, এমন কি একাদশ-মুণ্ড-সমন্বিত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরে পরিণত হয়েছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে অর্জুন কুরু ও পাণ্ডব এই উভয় সেনার মধ্যে রথ স্থাপন করে যখন সম্যক উপলব্ধি করলেন যে এই যুদ্ধের ফল আত্মীয়-স্বজন বিনাশ, তখন তাঁর মনে বিষাদ উপস্থিত হল এবং এরকম যুদ্ধ করে বাজ্যলাভ করার চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন ধারণ করা শ্রেয় মনে করে, তিনি সারথি কৃষ্ণের কাছে তাঁর যুদ্ধ করার অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে নানা যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে প্রবৃত্ত করান। অর্জুনের এই বিষাদ এবং কৃষ্ণের উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা সাধারণ কথায় বলতে গেলে গীতা আকারে লিপিবদ্ধ। বর্তমান গীতাকে আমরা যে আকারে দেখতে পাই, তা অষ্টাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। অনেক পণ্ডিত একথা বলেছেন, যখন দুইদিকে যুদ্ধার্থ দুইদল সৈন্য প্রস্তুত তখন কৃষ্ণ বসে অর্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা শোনালেন—এ সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। সমস্ত গীতার বাংলা অনুবাদ পড়তে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়নি, তখন অর্জুনের মতো প্রধান ব্যক্তির মানসিক জড়তা দূর করবার জন্য দেড়ঘণ্টা

সময় আলোচনা করা যে নিতান্তই অপ্রাকৃত তা তো মনে হয় না। আর এও সম্ভব যে অর্জুন যখন বিষণ্ণ হয়েছিলেন, কৃষ্ণ তাঁকে যুক্তি দিয়ে যুদ্ধ করতে সম্মত করিয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত যুক্তিকে ভিত্তি করে গীতা রচিত হয়েছে। জিনিসটাকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে গীতার রচয়িতা বর্তমান আকার দিয়েছেন। কথোপকথনে হয়তো আরো কম সময় লেগেছিল। এই ঘটনার পর, যুধিষ্ঠির ভাইদের সঙ্গে কুরুসৈন্য মধ্যে প্রবেশ করে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে প্রণাম করে যুদ্ধ বিষয়ে তাঁদের অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডব সৈন্য মধ্যে ফিরে এলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অতএব এই কথোপকথনের মধ্যে অপ্রাকৃত কিছুই নেই—কারণ তখন যুদ্ধ আরম্ভই হয়নি। তিলকের মতে 'বর্তমান সময়ে মহাভারতের যে স্থানে উহা (গীতা) বিবৃত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা কাব্য দৃষ্টিতেও উহার উল্লেখের জন্য অন্য অধিকতর কোনো যোগ্যস্থল দেখা যায় না। গীতা মহাভারতের মধ্যে যোগ্য কারণে ও যোগ্য স্থানেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।' অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন, গীতা মহাভারতের পূর্বে রচিত এবং সম্ভবত পরবর্তী যুগে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ মত আমার কাছে সমীচীন মনে হয় না। এই মতের স্বপক্ষে তিনি একমাত্র যুক্তি দিয়েছেন যে গীতা প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের রচনা অতএব মহাভারতের পূর্বে রচিত! ম্যাকাডোনেলের মতে এই মহাকাব্যের ঐতিহাসিক অঙ্কুর আমরা খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দার পূর্বেই পাই। মহাভারতের আখ্যায়িকা অতি প্রাচীনকালে গায়কদের কণ্ঠে গীত হত, সে সময়ে সবটাই ছিল সংক্ষিপ্ত, কৃষ্ণার্জুনের আলোচনাও সংক্ষিপ্তভাবে এতে ছিল (অধ্যাপক দাশগুপ্ত না থাকার কোনো প্রমাণ দেননি), পরে পরিবর্ধিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে—এই মতটাই সমীচীন মনে হয়। গীতার সময় সম্বন্ধে বহু মত আছে। তিলক তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও যুক্তিশক্তি প্রয়োগ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে গীতা অন্তত খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে রচিত। আমি এই মত যুক্তিযুক্ত মনে করি। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে গীতা খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে রচিত, কিন্তু কত পূর্বে তা নির্ণয় করা শক্ত।

প্রাচীনকালে হয়তো গীতা একান্তী বৈষ্ণবদের কিংবা ভাগবত ধর্মাবলম্বীদের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ বলে বিবেচিত হত, কিন্তু বহুদিন যাবতই গীতা হিন্দুসমাজের সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে ধর্মগ্রন্থ

হিসাবে গীতাই বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয়। অদ্বৈতবাদী শঙ্করই (৮ম শতাব্দী) হন, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজই (১১শ শতাব্দী) হন, আর দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্যই (১৩শ শতাব্দী) হন, সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করবার জন্য গীতাভাষ্য লিখতে বাধ্য হয়েছেন। ভাষার লালিত্য, স্বাচ্ছন্দ্যগতি প্রভৃতির দিক দিয়ে গীতা কাব্য হিসাবেও বেশ উঁচু স্থান পেতে পারে, কিন্তু গীতা প্রথমে ধর্মগ্রন্থ, পরে কাব্য। হিন্দুর ধর্মকে বুঝতে হলে গীতার সঙ্গে পরিচয় দরকার। পরবর্তী অধ্যায়ে ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে গীতার উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে আমার মত ব্যক্ত করার ইচ্ছা রইল। এখন শুধু মহাভারতের সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটুকু আলোচনা করেই ক্ষান্ত হলাম।

আদিপর্বে অনুক্রমণিকাধ্যায়ে রয়েছে ভারত সংহিতা প্রথমে চব্বিশ হাজার শ্লোকে রচিত হয়েছিল, পরে বর্তমান আকার লাভ করেছে। মহাভারত বর্তমানে প্রায় একলক্ষ শ্লোকের সমষ্টি। এত বড় একটি গ্রন্থের বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে আরও একটি গ্রন্থের অবতারণা করতে হয়, তার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এই পুস্তকের মূল উদ্দেশ্য হল ভিন্ন। মূল মহাভারতের সঙ্গে বাঙালী খুব কম পরিচিত, বাঙালীর ঘরে ঘরে কাশীরামদাসের মহাভারতই সুপরিচিত, আর কাশীরামদাসের মহাভারতের সঙ্গে মূলের অনেক অনৈক্য রয়েছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর মহাভারতের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন—'কাশীরামদাস স্বরচিত গ্রন্থের সৌন্দর্য সম্পাদন মানসে এবং সর্বসাধারণ লোকের চিত্তরঞ্জন উদ্দেশে ব্যাস প্রোক্ত মূল গ্রন্থের বহির্ভূত অনেক কথা রচনা করিয়া আপনার কবিত্ব শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এবং মূলের লিখিত অনেক স্থল পরিত্যাগ করিয়া আপনার শ্রম লাঘব করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন।' অতএব সংস্কৃত না-জানা বাঙালীর মহাভারত সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে কালীপ্রসন্ন সিংহের বাংলা অনুবাদ পাঠ করাই কর্তব্য।

রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য যে শুধু প্রায় তিন হাজার বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের অগণিত জনসাধারণকে অফুরন্ত আনন্দ দিয়েছে তা নয়, কবিদের প্রাণেও প্রেরণা যুগিয়েছে, যার ফল স্বরূপ ভারতবর্ষ কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও 'শকুন্তলা,' ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত,' ভারবির 'কিরাতার্জুন,' মাঘের 'শিশুপাল বধ,' ও শ্রীহর্ষের 'নৈষধ চরিত,' প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাব্য পেয়েছে।

এক শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বাদ দিলে, কি নাটক, কি কাব্য, কোনো হিসাবেই উপরের ক'খানি গ্রন্থের মতো আর কোনো গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। সংস্কৃত কবিদের কবিপ্রতিভাও রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয় নিয়ে কাব্য রচনাতেই সব চেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাই একথা আবার বলছি যে সত্য সত্যই রামায়ণ মহাভারত ভারতবর্ষের ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সকলের প্রাণকেই নিঃশেষে ব্যক্ত করেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত রচনাকাল সম্বন্ধে কিছু বলেই রামায়ণ মহাভারতের আলোচনা শেষ করব। রামায়ণ ও মহাভারত দুই-ই প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের গ্রন্থ এবং এদের মধ্যে রামায়ণ প্রাচীনতর। পিপাব বাল্মীকিকে বুদ্ধের সমসাময়িক বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নিজ মত সমর্থনের জন্য কোনো যুক্তি দেননি, কাজেই তাঁর মত সম্বন্ধে আলোচনা করা শক্ত। ম্যাকডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে নানা যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে রামায়ণ প্রাক্‌বৌদ্ধ যুগের। সে সব যুক্তির পুনরাবৃত্তি করা আমি নিষ্প্রয়োজন মনে করি। পাণিনির ব্যাকরণে যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতি শব্দের ও মহাভারতের উল্লেখ রয়েছে। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক। আর গীতাও মহাভারতের অংশস্বরূপ। আগেই বলেছি গীতা খৃষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে রচিত। অতএব মহাভারত যে প্রাগ্‌বৌদ্ধ যুগের—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

রামায়ণ ও মহাভারতের পর সংস্কৃত সাহিত্যে ভাসের নাটকগুলিই প্রাচীন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গণপতি শাস্ত্রী 'স্বপ্নবাসবদত্তা,' 'প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ,' 'চারুদত্ত,' 'প্রতিমা' প্রভৃতি তেরোখানা ভাসের নাটক আবিষ্কার করেন। এই সব নাটক ভাসের কিনা সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। গণপতি শাস্ত্রীর মতে ভাস কৌটিল্যের পূর্ববর্তী, তিলকের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীর পরে নয়। ফণিভূষণ তর্কবাগীশের মতে অন্তত 'খৃষ্টপূর্ববর্তী সুপ্রাচীন।'

কালিদাস ভাসকে খ্যাতনামা নাট্যকার বলেছেন। ভাসের নাটকগুলি পড়লে এ মত যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। যদিও কালিদাসের কবিত্বশক্তি বা শূদ্রকের রসবোধ ভাসের নাটকে নেই, তবু এই সব নাটক সাধারণের পক্ষে সহজবোধ্য, কাজেই জনপ্রিয় হয়েছিল বলে মনে হয়। ভাসের নাটকের ভাষা

খুব সহজ ও প্রাঞ্জল। কালিদাসের মতো সিদ্ধহস্ত না হলেও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পরিস্ফুট করে তুলতে ভাসও চেষ্টা করেছেন। 'প্রতিমা' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রামচন্দ্র সীতাকে বলেছেন 'যাদের পুত্র করে নিয়েছ সেই হরিণ ও বৃক্ষ, বিন্ধ্যবন এবং তোমার প্রিয় সখী লতার কাছ থেকে বিদায় নাও।'

ভাসের নাটকগুলির মধ্যে 'স্বপ্নবাসবদত্তা' শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। বৎসরাজ উদয়ন ও তাঁর স্ত্রী অবন্তী রাজকন্যা বাসবদত্তা, এই নাটকের প্রধান নায়ক ও নায়িকা। এই দুজনের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাকে কবি নানাভাবে রূপ দিয়েছেন। পদ্মাবতীর চরিত্রও কবি নিপুণ হাতে এঁকেছেন। যদিও নাটকখানি ত্রুটিশূন্য নয়, তবু কবি তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হয়েছেন। মোটের উপর নাটকখানি জনপ্রিয় হওয়ার যোগ্য। উদয়ন শত্রুকর্তৃক পরাজিত হয়ে রাজ্য হারান। তাঁর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মগধরাজ দর্শকের ভগ্নী পদ্মাবতীর সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে দর্শকের সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধারের কল্পনা করেন। কিন্তু বাসবদত্তা বর্তমানে উদয়ন কিছুতেই পুনর্বিবাহে সম্মত হন না। অগত্যা যৌগন্ধরায়ণ বাসবদত্তার শরণাপন্ন হন। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা বশত তাঁর কল্যাণের জন্য বাসবদত্তা যৌগন্ধরায়ণের প্রস্তাবে সম্মত হন। যাতে উদয়ন ও পদ্মাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে উদয়নের মৃগয়াকালীন অনুপস্থিতির সময় গ্রামদাহে বাসবদত্তা ও যৌগন্ধ-রায়ণের মৃত্যু হয়েছে এই প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। এর পর থেকে যৌগন্ধরায়ণ ও বাসবদত্তা ভাই ও বোন রূপে ছদ্মবেশী। যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে ছদ্মবেশী বাসবদত্তা বা অবন্তিকাকে পদ্মাবতীর কাছে রাখার ব্যবস্থা করেন। তাই পদ্মাবতীর সঙ্গে যখন উদয়নের বিবাহের সব ঠিক হয়ে যায় তখন অবন্তিকাকে মালা গাঁথতে হয়। অবন্তিকা নিজের দুঃখ প্রকাশ করতে পারেন না, উদয়নের রাজ্য উদ্ধারের জন্য জেনে শুনেই এ বিবাহে সম্মতি দিয়েছেন, অথচ স্বামীর অপর বিবাহে হৃদয় তাঁর দুঃখে ভারাক্রান্ত। অন্তরাল থেকে তাঁর প্রতি উদয়নের অনুরক্তির কথা জানতে পেরে অজ্ঞাতবাসজনিত দুঃখ ভুলে যান এবং নিজেকে যথেষ্ট পুরস্কৃত মনে করেন। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ভাস সুনিপুণ শিল্পীরই পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের প্রায় শেষ পর্যন্তই বাসবদত্তা ও যৌগন্ধরায়ণ ছদ্মবেশী। রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর উদয়নের

সঙ্গে তাঁদের আবার সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গেই একরকম নাটকের শেষ। এক এক করে ভাসের নাটকসমূহের আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু 'চারুদত্ত' নাটক সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। এই 'চারুদত্ত' অবলম্বনেই সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাটক 'মৃচ্ছকটিক' রচিত। শুধু একথা বললে ভাসের প্রতি অবিচার করা হয়। 'চারুদত্ত' নাটকখানি অসম্পূর্ণ, চার অঙ্কে সমাপ্ত। কিন্তু এই চার অঙ্কের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'মৃচ্ছকটিকের' প্রথম চার অঙ্কের বিষয়বস্তু প্রায় এক। এমন কি ভাষা ও উপমাগুলির মিলও আশ্চর্যজনক। এই কারণে কোনো কোনো পণ্ডিত দুটি নাটকই একজনের লেখা বলে মনে করেন।

ভাসের পর আমরা একেবারে খৃষ্টীয় শতাব্দীতে এসে পড়ি। এই যুগের প্রথম শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক। অতএব তিনি প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগ বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবিত ছিলেন। কারো কারো মতে অশ্বঘোষ অযোধ্যার লোক, আবার কারো কারো মতে তিনি কাশী বা পাটনার লোক। তাঁর পিতার নাম সৌম্যগুহ ও মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। জনৈক তিব্বত দেশীয় জীবনচরিত প্রণেতার মতে তিনি নিজে সুগায়ক ছিলেন এবং তিনি একদল গায়ক ও গায়িকা নিয়ে বড় বড় ব্যবসা-কেন্দ্রে গান গেয়ে বেড়াতেন। তাঁর গানের ভিতর দিয়ে তিনি জগতের অনিত্যতা প্রচার করতেন এবং শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তা শুনত। অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধদের তর্কে পরাস্ত করেন, কিন্তু শেষে আর্যদেবের (অপর মতে পার্শ্ব) কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। তিনি বৌদ্ধদের মধ্যেও খুব সম্মান লাভ করেছিলেন। চীন-দেশীয় পরিব্রাজক ইতসিং ৬৭১ খৃষ্টাব্দ থেকে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর মতে নাগার্জুন, দেব (আর্যদেব) আর অশ্বঘোষের মতো লোক এক এক যুগে দু-একজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি এখানে বিবেচ্য নয়, কবি হিসাবেই তিনি আমাদের আলোচনার বিষয়। ফরাসী পণ্ডিত সিল্‌ভাঁ লেভি তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন—'খৃষ্ট শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত বৃহৎ স্রোত (ভাবস্রোত) ভারতবর্ষকে সঞ্জীবিত ও পরিবর্তিত করেছে, তিনি তার উৎপত্তি স্থানে দণ্ডায়মান। ভাবের সম্পদ ও বৈচিত্র্যে তিনি মিল্টন, গেটে, কাণ্ট ও ভলটেয়ারের কথা

স্মরণ করিয়ে দেন।' অশ্বঘোষ বুদ্ধ-চরিত, সৌন্দরানন্দ কাব্য, সূত্রালঙ্কার, ও বজ্রসূচীর রচয়িতা। সম্প্রতি সারিপুত্রপ্রকরণ নামে অশ্বঘোষের একটি নাট্য-কাব্যও আবিষ্কৃত হয়েছে। অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত মহাকাব্যের ধরনে লেখা। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই কাব্যের অংশমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সম্পূর্ণ কাব্যটি এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এই কাব্য একদিকে আদি কবি বাল্মীকি, অপরদিকে কবিকুলচূড়ামণি কালিদাসের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অশ্বঘোষ, বাল্মীকি ও কালিদাসের মতোই অলঙ্কারের প্রয়োগে কখনও রাশ আলগা করে দেননি। তাঁর ভাষা ও ভাব প্রকাশের ভঙ্গি বেশ মধুর, সংযত ও প্রশান্ত। প্রথম সর্গে বুদ্ধদেবের মাতা মহামায়ার বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'সমগ্র দেবী নিবহাগ্রদেবী বভূব মায়াপগতেব মায়া'—তিনি সমস্ত রানীকুলের রানীস্বরূপ অর্থাৎ তিনি রানীদের মধ্যেও রূপের রানী ছিলেন, মায়া যেন সম্পূর্ণ মায়ারহিতই ছিলেন। 'মায়াপগতেব মায়া' মৃচ্ছকটিক নাটকের প্রধান নায়িকা বসন্তসেনার বর্ণনা 'বসন্তশোভেব বসন্তসেনা', বসন্তের শোভার ন্যায় বসন্তসেনা—মনে করিয়ে দেয়। বুদ্ধদেবের জন্মের পর অসিত মুনি এসে নবজাত শিশুর সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ বাণী করেন, আমি সেই জায়গা থেকে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি, কারণ, ঐ দুই শ্লোকে অশ্বঘোষের কবি-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

'দুঃখার্ণবাদ্ব্যাধি বিকীর্ণফেনা জরাতরঙ্গান্মরণোগ্রবেগাৎ।
উত্তারয়িষ্যত্যয় মুহ্যমানমার্তং জগজ্জ্ঞান মহাপ্লবেন ॥'

অর্থাৎ ব্যাধিরূপ বিক্ষিপ্ত ফেনা, জরারূপ তরঙ্গ, মৃত্যুরূপ উগ্র স্রোতবেগ-সমন্বিত দুঃখ সাগরে প্রবাহিত আর্ত জীবসকলকে তিনি জ্ঞানরূপ মহানৌকা দ্বারা উদ্ধার করবেন।

'প্রজ্ঞাম্বুবেগাং স্থিরশীল বপ্রাং সমাধিশীতাং ব্রত চক্রবাকাং।
অস্যোত্তমাং ধর্মনদীং প্রবৃত্তাং তৃষ্ণার্দিতঃ পাস্যতি জীবলোকঃ ॥'

তৃষ্ণার্ত জীবলোক তাঁর ধর্মনদীর জলপান করে পিপাসা দূর করবে; সেই নদীর স্রোত প্রজ্ঞা, তীর নীতি ও সৎস্বভাব, শীতলতা সমাধি এবং চক্রবাক ব্রতস্বরূপ।

প্রবাদ আছে মহাভিনিষ্ক্রমণের পূর্বে সিদ্ধার্থ তিন দিন শহর দেখতে বেরিয়েছিলেন। তিনি যেদিন প্রথম বের হন, তাঁকে দেখবার জন্য কপিলবস্তু শহরের সমস্ত বাড়ির জানলায় মেয়েরা এসে ভিড় করেন। তার বর্ণনা বুদ্ধ-চরিতের তৃতীয় সর্গে রয়েছে। মহারাজ অজ স্বয়ম্বর সভা থেকে ফিরে এলে, তাঁকে দেখবার জন্য অযোধ্যায় মহিলারাও ঐরকম ভিড় করেন। কালিদাসের রঘুবংশে সে বর্ণনা পাই। অশ্বঘোষের বর্ণনা পড়লে কালিদাসের কথা মনে পড়ে। ছন্দক যখন বুদ্ধদেবকে রেখে ফিরে আসেন, সেই সময়কার ছন্দকের বর্ণনা ও শকুন্তলার সঙ্গে সাক্ষাতের পর নগরে ফিরে যাওয়া সম্বন্ধে দুষ্মন্তের মানসিক অবস্থার বর্ণনার কেমন সাদৃশ্য : ততো নিরাশো বিলপন্মুহুর্মুহুর্যযৌ শরীরেণ পুরং ন চেতসা' (বুদ্ধ-চরিত ষষ্ঠ সর্গ)—অতঃপর নিরাশ হৃদয়ে বার বার বিলাপ করতে করতে শরীর মাত্র বহন করে নগরে ফিরলেন ; কিন্তু তাঁর চিত্ত সেইখানেই রয়ে গেল।

'গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ' (অভিজ্ঞান শকুন্তলম্, প্রথম সর্গ)—শরীর সামনে যায় বটে কিন্তু চঞ্চল মন পিছন দিকেই ধাবিত হয়। বেশি উদাহরণের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে অশ্বঘোষ একজন উঁচুদরের কবি ছিলেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসীর চিন্তাধারা কোথাও তাঁর কবি-প্রতিভাকে খর্ব করেনি। বুদ্ধ-চরিতে তিনি সর্বোতোভাবেই কবি। অশ্বঘোষের পর, পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বর্ণ যুগ। এর অধিকাংশ সময়ই গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল। মহাকবি কালিদাস, বিখ্যাত নাট্যকার শূদ্রক, ভারবি, ভর্তৃহরি, বাণভট্ট, ভবভূতি প্রভৃতি কবি এই যুগের। শুধু এই যুগের নয়, সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেই কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি। কি নাটক, কি কাব্য, কি গীতিকাব্য, সবটাতেই কালিদাসের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের আগে কলিদাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি তো দূরের কথা, তাঁর সমকক্ষ কবিও কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমস্ত বিশ্বের সাহিত্যেও কালিদাসের স্থান খুবই উঁচু। বর্তমান সময় পর্যন্ত জগতের যে ক'জন বিখ্যাত কবির নাম করা যেতে পারে, কালিদাস তাঁদের অন্যতম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষায়, 'তিনি সংস্কৃতভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, * সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য লিখিয়া

* অবশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক দিয়ে শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকই শ্রেষ্ঠ।

গিয়াছেন। কোন দেশের কোন কবিই কালিদাসের ন্যায় সর্ববিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ছিলেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে বোধ হয় অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইতে হয় না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালিদাসের জন্মস্থান বা কাল এখনও অবিসম্বাদিতরূপে নির্ণীত হয়নি। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীর লোক এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে তাঁর জন্মস্থান মালবের অন্তর্গত মন্দসর। কালিদাসের কাল বা স্থান নিশ্চিতরূপে নির্ণীত না হলেও, তিনি নিজ প্রতিভায় সকল যুগের ও সকল দেশের গৌরবের ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে আছেন। কালিদাস শৈবধর্মী ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থই তার প্রমাণ। বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র ও শকুন্তলা, তাঁর এই তিনখানি নাটকের মঙ্গলাচরণেই তিনি শিবের মহিমা ব্যক্ত করেছেন।

কালিদাস উপরোক্ত তিনখানি নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব নামে দুখানি কাব্য, মেঘদূত নামে সুপ্রসিদ্ধ গীতিকাব্য ও ঋতুসংহার নামে গ্রন্থের রচয়িতা। এগুলি ছাড়াও নলোদয়, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারাষ্টক, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা ও শ্রুতবোধ কালিদাসের লেখা বলে প্রচলিত ধারণা। কিন্তু পণ্ডিতরা মনে করেন শেষোক্ত বইগুলি কালিদাসের লিখিত নয়।

শ্লোক উদ্ধৃত করে কালিদাসের কবি-প্রতিভার প্রমাণ দিতে হলে একখানি পৃথক গ্রন্থ হয়ে পড়বে, আর কোন শ্লোক রেখে কোন শ্লোক উদ্ধৃত করি, এটাও মস্ত বড় সমস্যা। যে কখনও আম খায়নি তাকে যেমন বর্ণনা দিয়ে আমের স্বাদ বোঝানো যায় না, কালিদাসের কবিতার মাধুর্যও তেমনি ভাষার সাহায্যে অন্যের হৃদয়ঙ্গম করানো অসম্ভব। রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ কালিদাসের কাব্য সম্বন্ধে লিখেছেন—'মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী কাব্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই পৃথিবীর মধ্যে যাহা সুন্দর, হৃদয়ের উন্মাদকর, অপাপবিদ্ধ, প্রকাণ্ড, যাহা বিরাট, অনুপম, তাহাই কালিদাসের কাব্যের উপজীব্য বা জীবন।...যাহা অসুন্দর—নীচ, তাহা তিনি স্পর্শও করেন নাই। ...তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা স্বর্গের অলকা হইতে মর্ত্যের—ভারতের তথা তাঁহার নিজের বড় আদরের উজ্জয়িনী পর্যন্ত জুড়িয়া বসিয়া আছে।...অল্প কথায় সুন্দর পদার্থ—প্রকাণ্ড পদার্থ বর্ণন করিবার—সম্পূর্ণরূপে বিচিত্র করিবার এবং সেই বিচিত্র মূর্তিতে দর্শকগণের মনঃপ্রাণ, বাহ্য অভ্যন্তর—বিমোহিত ও

পরিপূরিত করিবার ক্ষমতা কালিদাসের তুল্য অন্য কোন কবির ছিল না। কালিদাসের এই সার্থকতার—এই সাফল্যের নিদান হইল—তাঁহার মাত্রাজ্ঞান নৈপুণ্য ও পরহৃদয় জ্ঞান নৈপুণ্য।'

কালিদাসের নাটকের মধ্যে শকুন্তলাই শ্রেষ্ঠ। ইউরোপের কবি-কুলগুরু গেটে শকুন্তলার সম্বন্ধে লিখেছেন, 'কেউ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, যা আকৃষ্ট করে ও বিমোহিত করে, যা ক্ষুধার নিবৃত্তি ও পরিপুষ্টিসাধন করে, এবং স্বর্গ ও মর্ত্য একত্র দেখতে চায় তবে শকুন্তলায় তা পাবে।' এই অল্প কথার মধ্যে গেটে শকুন্তলা নাটকখানির পরিপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন। কণ্বের আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের মধ্যে যে যৌবনচাঞ্চল্য রয়েছে, সে মিলন পরিপূর্ণ মিলন নয়। দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যানের পর মারীচের আশ্রমে তপস্যানলে দগ্ধ হয়ে শকুন্তলা 'নিকষিত হেম' হয়েছিলেন, আর শকুন্তলাকে দেওয়া অঙ্গুরীয়ক ফিরে পাওয়ার পর দুষ্মন্তের হৃদয় অনুতাপের আগুনে পুড়ে শ্মশান হয়েছিল এবং সে শ্মশানে আবির্ভূত হলেন দেবতা। তাই মারীচের আশ্রমে যখন দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুনর্মিলন হয়, তখন বৃক্ষান্তরাল থেকে গোপনে দেখবার চেষ্টা নেই, অতিথিকে ভুলে যাওয়া নেই—সে মিলনে ভোগাকাঙ্খা বড় নয়—পবিত্র দাম্পত্য প্রেম, অপত্যস্নেহের মধ্য দিয়ে মধুরতর হয়ে উঠেছে।

তখন শকুন্তলার আর সে ক্রোধ নেই, যে ক্রোধের বশবর্তী হয়ে দুষ্মন্তকে বলেছিলেন—'অনার্য তুমি নিজ হৃদয়ের মাপকাঠিতে অন্যকে বিচার করছ।' তখন আছে হৃদয়ের গভীর মর্মবেদনা, নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার—তাই যখন পুত্র সর্বদমন দুষ্মন্তকে দেখিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ইনি কে?' তখন শকুন্তলা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছিলেন, 'বৎস, নিজ অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর।'

সংস্কৃত সাহিত্যের একটা বিশেষত্ব বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ পরিস্ফুট করে তোলা। বাল্মীকির রামায়ণ, মহাভারতের নলোপাখ্যান, ভাসের নাটক, অশ্বঘোষের বুদ্ধ-চরিত প্রভৃতি অনেক কাব্যেই এর পরিচয় মেলে, কিন্তু আমার মনে হয় কালিদাসের শকুন্তলাতেই এই দিকটি যথার্থ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আশ্রম থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে শকুন্তলা পিতা কণ্বকে বললেন, 'লতা ভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করে যাব।' তারপর বনজ্যোৎস্নাকে আলিঙ্গন। আবার নবমালিকাকে সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদার হাতে সমর্পণ।

গর্ভমন্থরা মৃগবধূকে ছেড়ে যেতে তাঁর কি কষ্ট! সখীদের ছেড়ে যাওয়ার কষ্টের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তার নিরাপদ প্রসবের জন্য কি উদ্বেগ। তাই কণ্বকে বলেছিলেন, 'এ যখন নিরাপদে প্রসব করবে তখন আমার নিকট লোকসহ সংবাদ পাঠিও।' রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্যে' শকুন্তলা নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। এই মূক প্রকৃতিকে কোনো নাটকের ভিতরে যে এমন প্রধান—এমন অত্যাবশ্যক স্থান দেওয়া যাইতে পারে, তাহা বোধ করি সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় নাই।'

ইংরেজ পণ্ডিত উইলিয়ম জোনস্ কালিদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ নাট্যকার শেক্স্পিয়রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শেক্স্পিয়রের 'তুমি যেমনটি চাও' (As you like it) নাটকে বহিঃপ্রকৃতির খুব উচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানেও মূকপ্রকৃতি নাটকের পাত্র হয়ে ওঠেনি। শকুন্তলাকে অনেকে উপরোক্ত ইংরেজ নাট্যকারের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে টেম্পেষ্টের সঙ্গে তুলনা করে শকুন্তলা নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছেন। তাঁর মতে, 'শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্স্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।' কৌতূহলী পাঠককে আমি রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ পড়তে অনুরোধ করি। শকুন্তলা নাটকের মূল ঘটনা মহাভারতের কাহিনী থেকে নেওয়া, কিন্তু কবি অনেক স্থানে পরিবর্তন করেছেন। সে পরিবর্তন নাটককে কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠই করেছে। পদ্মপুরাণের শকুন্তলার উপাখ্যান কালিদাস অবলম্বনেই লেখা।

কিন্তু কাব্যাংশে শকুন্তলা অতুলনীয় হলেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দিক দিয়ে আমার মনে হয় মৃচ্ছকটিক শকুন্তলার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক। মৃচ্ছকটিকের রচয়িতা শূদ্রক। এ শূদ্রক কে ছিলেন তা সঠিক বলা শক্ত। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় তাঁকে রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং ঐ নাটকের মঙ্গলাচরণ থেকে মনে হয় তিনি শৈব ছিলেন। এর বেশি আমরা কিছু জানি না। তাঁর জন্মকাল বা স্থান কিছুই ঠিক ভাবে নির্ণীত হয়নি। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে তিনি গুপ্তযুগে—খুব সম্ভবত ষষ্ঠ শতাব্দীতে—জীবিত ছিলেন।

জয়সোয়ালের মতে শূদ্রক তৃতীয় শতাব্দীর লোক। জার্মান পণ্ডিত পিসেল মনে করেন যে কবি দণ্ডী (সপ্তম শতাব্দী) এই নাটক লিখে শূদ্রক রাজার নামে চালিয়েছেন। নাটকের প্রস্তাবনায় কবির অত্যন্ত বিসদৃশ বর্ণনা আছে—এর কবি 'গজেন্দ্র গতি, চকোর নেত্র, পরিপূর্ণেন্দু মুখ, দ্বিজ মুখ্যতম, অগাধসত্ত্ব প্রসিদ্ধ শূদ্রক।' এইখানেই শেষ নয়, তিনি বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ, তপস্বী ও 'পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধ (পরপক্ষীয় হস্তীর সঙ্গে বাহুযুদ্ধাভিলাষী) রাজা শূদ্রক।'

নাটকে যে উচ্চাঙ্গের কলানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়েছে তার সঙ্গে এরকম প্রস্তাবনা নিতান্তই বেসুরো। তবে এ প্রস্তাবনা শূদ্রকের নিজের লেখা বলে মনে হয় না, সম্ভবত তাঁর কোনো সভাকবি বা ভক্ত এরকম লিখেছেন। কারণ তিনি 'একশত বৎসর দশদিন আয়ু পেয়ে পরে অগ্নিতে প্রবেশ করেছিলেন'—প্রস্তাবনায় একথা রয়েছে। এর থেকে সুস্পষ্ট যে প্রস্তাবনা শূদ্রকের মৃত্যুর পরে লেখা হয়েছিল।

'মৃচ্ছকটিক' ভাসের 'দরিদ্র চারুদত্ত' নাটক অবলম্বনে রচিত, এবং রাজত্বের অধঃপতনের সময়ের রাজধানী উজ্জয়িনীর চিত্র। নাটকের প্রধান নায়ক উজ্জয়িনীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বণিক চারুদত্ত, আর নায়িকা তার 'গুণানুরক্তা গণিকা' বসন্তসেনা। এত বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এমন সুন্দর ও সুনিপুণ ভাবে কবি সম্পন্ন করেছেন যে একে সংস্কৃত নাটকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে। কি চরিত্র অঙ্কণ, কি রসিকতা, কি রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা, সবটাতেই কবি সিদ্ধহস্ত। দর্শকের মনকে যেন তালে তালে নাচাতে নাচাতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেয়। পড়তে পড়তে ঔৎসুক্য বেড়েই চলে। দ্যূতক্রীড়ার পরিণাম, চুরি, রাজ-আত্মীয়ের অপকর্ম, বিচার বিভ্রাট, রাজ পরিবর্তন প্রভৃতি নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে অবশেষে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার বিবাহে এই নাটকের শেষ। একখানা গাড়ির বিভ্রাটের মধ্যে দিয়েই কবি সমস্ত নাটকখানিকে মালার মতো গ্রথিত করেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শেক্স্পিয়রের নাটকের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। হার্টমুট পিপার তো চরিত্র, ঘটনা প্রভৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে একথা বলেছেন যে, যদি ঐতিহাসিক অসত্য না হত তবে নিঃসন্দেহে শেক্স্পিয়রকে শূদ্রকের লেখা থেকে নকল করেছেন একথা বলা যেত। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই শেক্স্পিয়রের নাটকের সঙ্গে অল্পাধিক পরিচিত, আমি

তাঁদের 'মৃচ্ছকটিক' পড়তে অনুরোধ করি। আমাদের দেশের নাট্যকার শেক্স্পিয়রের প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্বে কিরকম সুন্দর নাটক লিখেছেন তা দেখে নিশ্চয়ই তাঁদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসবে।

যাক, এই ভাবে প্রত্যেক কাব্যের ও কবির বর্ণনা শুধু যে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবে তা নয়, গ্রন্থের আকারও অনাবশ্যকরূপে বড় হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, ভাস, অশ্বঘোষ, কালিদাস ও শূদ্রক সম্বন্ধে অন্তত এইটুকু না বললে, সংস্কৃত সাহিত্যের মহিমা কতকটা পরিস্ফুট করা সম্ভবপর হত না। রামায়ণ ও মহাভারত ভারতবর্ষের প্রাণের মূর্তবিগ্রহ, ভাস প্রাচীন নাট্যকার, অশ্বঘোষ ঐতিহাসিক যুগের প্রথম সংস্কৃত কবি, কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে বাণীর বরপুত্র, শূদ্রক নাট্যকার হিসাবে শ্রেষ্ঠ। এর অর্থ এই নয় যে সংস্কৃত সাহিত্যের উপযুক্ত পূজারী আর নেই। ভবভূতি, ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি কবি যে কোনো দেশের যে কোনো যুগে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার যোগ্য! বিষ্ণুশর্মার মতো গল্প-লেখক জগতে বিরল।

কাব্য হিসাবে কালিদাসের রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব, ভর্তৃহরির ভট্টিকাব্য, ভারবির কিরাতার্জুন, মাঘের শিশুপাল বধ, শ্রীহর্ষের নৈষধ-চরিত, সংস্কৃত সাহিত্যের ছখানি মহাকাব্য বলে প্রসিদ্ধ। ভর্তৃহরি (সপ্তম শতাব্দী) একাধারে কবি, বৈয়াকরণিক ও দার্শনিক। ব্যাকরণ শিক্ষা দেবার জন্য তিনি এই কাব্য লিখেছিলেন। ভর্তৃহরি সম্বন্ধে ম্যাক্ডোনেল লিখেছেন—'শুধু ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রণালীই তিন গুণের এই সমাবেশ সম্ভবপর করে তুলেছে।' ভারবির (ষষ্ঠ শতাব্দী) কিরাতার্জুনের কাব্যরস উপলব্ধি করতে হলে একটু পরিশ্রম করতে হয়। কিরাতার্জুন আম নয় যে দাঁত দিয়ে কামড়ালেই রসের আস্বাদ পাওয়া যাবে। একে নারিকেলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কঠোর ভাষার অন্তরালে ফল্গুধারার মতো এর রস প্রবাহিত! ভারবী পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর সভাপণ্ডিত ছিলেন। মাঘ নবম শতাব্দীর ও শ্রীহর্ষ দ্বাদশ শতাব্দীর লোক। শ্রীহর্ষের পদলালিত্য প্রসিদ্ধ। বাণভট্টের কাদম্বরী, দণ্ডীর দশকুমার চরিত প্রভৃতি কয়েকখানা গদ্য পুস্তকও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। কাদম্বরীর ভাষার ছটায় এমন একটা সঙ্গীত লহরী সৃষ্টি করে যে আখ্যায়িকার কথা পাঠকের মনেই আসে না। সংস্কৃত সাহিত্যিকরা গদ্য হলেও একে কাব্য আখ্যা দিয়ে সুবিচারই করেছেন। বর্ণনার কি পারিপাট্য! ভাষার খেলাও বেশ আছে—

'সদোষমপি সকল গুণাধিষ্ঠানম্'—মহাদোষী (মহাবাহু) হয়েও সকল গুণের আধার—'কুপতিমপি কলত্রচয়বল্লভম্', কুপতি (পৃথিবীর রাজা) হয়েও স্ত্রীগণের প্রিয়। বাণভট্টের মতো 'এমন বর্ণ সৌন্দর্য বিকাশের ক্ষমতা সংস্কৃত কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই।' (রবীন্দ্রনাথ)

উপরে বর্ণিত নাটকগুলি বাদে ভবভূতির উত্তররামচরিত ও মালতীমাধব, হর্ষবর্ধনের রত্নাবলী ও নাগানন্দ, বিশাখদত্তের (অষ্টম শতাব্দী) মুদ্রারাক্ষস, ভট্টনারায়ণের (নবম শতাব্দী) বেণীসংহার ও কৃষ্ণ মিশ্রের (একাদশ শতাব্দী) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। ভবভূতির উত্তররামচরিত করুণরসের সাগর, কিন্তু উত্তররামচরিতকে নাটক না বলে নাট্যকাব্য বললেই ঠিক হয়। মালতীমাধবকে শেকৃস্পিয়রের রোমীয়-জুলিয়েটের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কালিদাস বা শূদ্রকের কাল বা জন্মস্থান সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত কিছু জানি না, কিন্তু ভবভূতি সম্বন্ধে এ সমস্ত সংবাদই জানা আছে। ভবভূতি কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মার সভায় ছিলেন। অতএব তিনি অষ্টম শতাব্দীর লোক। তিনি বেরার দেশীয় ব্রাহ্মণ, পিতার নাম নীলকণ্ঠ, মাতার নাম জাতুকরণী ও পিতামহের নাম ভট্টগোপাল। তাঁর অপর নাম ছিল শ্রীকণ্ঠ। মুদ্রারাক্ষসে নাট্যপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবোধচন্দ্রোদয় রূপক নাটক। বিবেক, মোহ, প্রবৃত্তি, শম, দম, ক্ষমা, মানস, সংকল্প, মুদিতা, ধর্ম, বৈরাগ্য, তৃষ্ণা, দম্ভ, বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধা, মিথ্যাদৃষ্টি প্রভৃতি নাটকের চরিত্র। নাটকখানি খুবই চিত্তাকর্ষক। পড়তে পড়তে বিখ্যাত বেলজীয় নাট্যকার মেটারলিঙ্কের 'নীলপাখি' (*Blue Bird*) নামক নাটকের কথা মনে আসে। আমার মনে হয় নীলপাখির চেয়ে প্রবোধচন্দ্রোদয় অনেক উচ্চাঙ্গের নাটক। অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এই নাটক রচিত। এই নাটকে কাপালিক নিজের যে বর্ণনা দিয়েছে তা তার প্রকৃষ্ট পরিচয়: 'আমার গলার হার ও অলঙ্কার মৃত মানুষের অস্থি নির্মিত। আমি মৃতের ভস্মমধ্যে বাস করি এবং নরমুণ্ড আমার ভোজ্যপাত্র। উপবাসের পর আমরা মৃত ব্রাহ্মণমুণ্ডে রেখে মদ পান করি। আমাদের যজ্ঞাগ্নির হবনদ্রব্য মানুষের মাংস, ফুসফুস ও মগজ। আমাদের দেবতা মহাভৈরবকে সন্তুষ্ট করি গলদেশে সাঙ্ঘাতিক আঘাতের ফলে সদ্যরক্তধারায় সিক্ত মানুষকে উৎসর্গ করে।'

ভারতবর্ষে নাট্যকলা যে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল তা শুধু এই সমস্ত

নাটকের মারফতে নয়—উড়িষ্যার পণ্ডিত বিশ্বনাথ কবিরাজ কর্তৃক একাদশ শতাব্দীতে লিখিত সাহিত্য-দর্পণ থেকেও একথা বেশ বুঝতে পারা যায়। কি ভাবে নাটক লিখতে হবে, নাটকের নায়কের কি কি গুণ থাকবে, কিরকম জিনিস নাটকে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়—এ সমস্ত জিনিসেরই স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। সাহিত্য-দর্পণ নাটককে প্রধান দুইভাগে ভাগ করেছে. (১) রূপক ও (২) উপ-রূপক। আবার রূপকের দশ ও উপ-রূপকের আঠারো রকম বিভিন্ন বিভাগ স্বীকৃত হয়েছে। নাট্যসাহিত্যের ব্যাপকতার এই-ই প্রকৃষ্ট পরিচয়। আগেই বলেছি সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্ত নাটক নেই। আনন্দেই হিন্দুর সকল দুঃখের পরিসমাপ্তি। তাই রঙ্গমঞ্চে আত্যন্তিক দুঃখকর কোনো ঘটনাই দেখানো নিষেধ—যথা মৃত্যু। শুধু তাই নয়, কোনো প্রকারের দৃষ্টিকটু জিনিসও রঙ্গমঞ্চে দর্শকের সামনে অভিনীত হতে পারে না। হিন্দুদের নাট্যকলার এ উচ্চ আদর্শের পরিচয় দেয়।

সংস্কৃত নাটকে বিভিন্ন নাটকীয় চরিত্র বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করেছেন। সাধারণত নাটকের প্রধান নায়ক, রাজা, ব্রাহ্মণ ও সমাজের পদস্থ ব্যক্তিরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছেন। মেয়েরা ও সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করেছেন—অবশ্য এঁরাও যে সংস্কৃত বুঝতেন একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের প্রধান নায়িকা বসন্তসেনা অধিকাংশ সময় প্রাকৃত ভাষায় কথা বললেও নাট্যকার নায়িকার মুখ দিয়ে সংস্কৃত ভাষায়ও কথা বলিয়েছেন। মৃচ্ছকটিকের অর্ধেকের বেশিই প্রাকৃতভাষা। কাজেই মৃচ্ছকটিক যতটা সংস্কৃত নাটক, ততোধিক প্রাকৃত নাটক। প্রাকৃত সেকালকার কথ্যভাষা। প্রাকৃতের সঙ্গে সংস্কৃতের পার্থক্য খুব বেশি নয়। একটা উদাহরণ দিলেই তা সুস্পষ্ট হবে। শকুন্তলা নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারম্ভে অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলছেন, 'জইবি গান্ধব্বেন বিহিনা নিব্বুত্ত কল্লানা সউন্দলা অণুরূপভত্তুগামিনী সংবুত্তেত্তি নিব্বুদং মে হিঅঅং তহবি এত্তিঅং চিন্তনিজ্জং,'—এর সংস্কৃত—'যদ্যপি গান্ধর্বেন বিধিনা নিবৃত্তকল্যাণা শকুন্তলা অনুরূপভর্তৃগামিনি সংবৃত্তেতি নির্বৃতং মে হৃদয়ং তথাপি এতাবচ্চিন্তনীয়ম'—যদিও গন্ধর্ববিধিমতো মঙ্গলকার্য সম্পন্ন হওয়ায় শকুন্তলা উপযুক্ত বরেই সমর্পিত হয়েছে বলে আমার প্রাণে আনন্দ, তথাপি এই একটা কথা ভাববার আছে। কথ্য ভাষা স্থান-বিশেষে ভিন্নরূপ হয়। তাই প্রাকৃত ভাষারও বিভিন্ন রূপ আছে। কালিদাসের সম-

সাময়িক বররুচি তাঁর প্রাকৃতব্যাকরণে সৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও পৈশাচী—প্রাকৃতের এই চারটি ভাগ স্বীকার করেছেন। এতদ্ব্যতীত অবন্তী, আভিরী, অপভ্রংশ প্রভৃতি প্রাকৃতের আরো ভাগও আছে। অতএব যাঁরা প্রাকৃতে কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের লোক বিভিন্ন রকমের প্রাকৃত ব্যবহার করেছেন—কেউ বা সৌরসেনী, কেউ বা মহারাষ্ট্রী, কেউ বা মাগধী, আর কেউ বা অপভ্রংশ। এই সমস্ত প্রাকৃতভাষা থেকেই উত্তর ভারতের প্রচলিত বর্তমান ভাষাগুলির উৎপত্তি।

নাটকের বিষয় শেষ করবার আগে, দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙালী কবি জয়দেবের গীত-গোবিন্দের কথা উল্লেখ না করে পারি না। গীত-গোবিন্দ না নাটক, না গীতিকাব্য—এই দুইয়ের মাঝামাঝি। এমন সুমধুর সংস্কৃত সঙ্গীত আর কোনো সংস্কৃত কাব্যে বা নাটকে নেই। অনুপ্রাস ও পদলালিত্যের এমন অপূর্ব মিলন জগতের কোনো সাহিত্যে আছে বলে জানি না। কবি এমন সুন্দরভাবে শব্দ-যোজনা করেছেন যেন একটি কন্সার্ট—সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মতো কানে অমৃত-ধারা ঢেলে দেয়।

জয়দেবের গীত-গোবিন্দ আমার কাছে বেঠোফেনের কন্সার্টের মতোই মধুর লেগেছে। যাঁরা জয়দেব পড়েননি তাঁদের বোঝবার সুবিধার জন্য তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করলাম যদিও এরকম বহু শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'দিনমণি মণ্ডল মণ্ডন ভব খণ্ডন (এ)
মুনিজন মানস হংস ! জয় জয়দেব হরে ॥'

'অমল কমল দল লোচন ভব মোচন (এ)
ত্রিভুবন ভবন নিধান ! জয় জয়দেব হরে ॥'

'মণিময় মকর মনোহর কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড মুদারম্।
পীতবসন মনুগত মুনি মনুজ সুরাসুর বর পরিবারম্ ॥'

প্রথম দুই শ্লোকের বাংলা অনুবাদ অনাবশ্যক। তৃতীয় শ্লোকের গীত-গোবিন্দের বসুমতী সংস্করণের প্রদত্ত অনুবাদ দেওয়া হল—প্রিয় বল্লভের গণ্ডযুগল রমণীয়

মণিকুণ্ডলে অলঙ্কৃত হইয়া কেমন মোহনভাব ধারণ করে। সখি! সেই পীতাম্বর কৃষ্ণের সৌকুমার্যে মুনিপত্নী, মানবী, দেবী ও দানবী সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকে।

গল্প ও আখ্যায়িকায়ও হিন্দুপ্রতিভা নাটক ও কাব্যের চেয়ে কোনো অংশে কম প্রকাশ পায়নি। ভিনটারনিট্‌সের ভাষায় ভারতবর্ষ গল্প ও আখ্যায়িকার দেশ। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে জগতের অন্য কোনো দেশ এত বড় গল্পসাহিত্য সৃষ্টি করেনি। শুধু সমস্ত এশিয়াখণ্ড নয়, ইউরোপের গল্পসাহিত্য—বিশেষভাবে জার্মান সাহিত্য আমাদের গল্পসাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। আরব্যোপন্যাস আমাদের গল্পসাহিত্যের অনুকরণে লিখিত। মহাভারত অসংখ্য আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ। উপনিষদেও গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধজাতক গল্পের ভাণ্ডার—খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপে যে সমস্ত চিত্র আছে, তা থেকে ঐ সময়ে ভারতীয় জীবনে গল্প যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের যে সমস্ত গল্পের বই আছে, সেগুলির মধ্যে বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রই বিখ্যাত। পঞ্চতন্ত্র কোন সময়ে রচিত তা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে এর খ্যাতি দেশ-বিদেশে এতদূর বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে তৎকালীন পারস্য সম্রাট নৌসেরবনের আদেশক্রমে পহ্লবী (তৎকালীন পারস্যের ভাষা) ভাষায় এর অনুবাদ হয়। পঞ্চতন্ত্র জগতের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে, বাইবেল ভিন্ন জগতের অন্য কোনো বই-ই এত ভাষায় অনূদিত হয়নি, অন্তত ধর্মশাস্ত্র নয় এমন কোনো গ্রন্থ তো নিশ্চয়ই হয়নি—এটাই ম্যাক্‌ডোনেলের মত। পঞ্চতন্ত্রে জীবজন্তু যথা—সিংহ, শৃগাল, কাক, পেচক প্রভৃতি গল্পের চরিত্র। এই সমস্ত জীবজন্তুর মুখ দিয়ে অনেক নৈতিক ও ধর্মোপদেশ দেওয়া হয়েছে। প্রবাদ আছে যে রাজপুত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই গল্প রচিত। পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে লিখিত 'হিতোপদেশ'ও খুব জনপ্রিয় গল্পের বই। এ ছাড়া বেতাল পঞ্চবিংশতি, কথা-সরিৎসাগর প্রভৃতি আরো কয়েকখানা গল্পের বইও আছে। গল্পের বই কথ্যভাষায় লিখিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু এ সমস্ত বই-ই সংস্কৃতে লিখিত। কথা-সরিৎসাগর কাশ্মীরী কবি সোমদেবের (একাদশ শতাব্দী) রচনা। এই গ্রন্থ শালিবাহন রাজমন্ত্রী কবি গুণাঢ্যের

পৈশাচী ভাষায় রচিত 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে লিখিত; কিন্তু পৈশাচী ভাষায় রচিত মূল গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় না।

সূত্র হিন্দুদের অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি একথা আগেই বলেছি। ভারতবর্ষে ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করা এবং মুখে মুখে শিক্ষালাভ করার প্রথা সুবিদিত। যাতে লোকে সহজে মনে রাখতে পারে এইজন্য খুব সংক্ষেপে ব্যক্ত করার রীতি প্রবর্তিত হয়। তার ফলেই সূত্রের সৃষ্টি।

প্রবাদ আছে সূত্রকাররা একটি বাক্য থেকে যদি একটি স্বরবর্ণেরও সংক্ষেপ করতে পারতেন তবে তাঁদের পুত্রলাভের আনন্দ হত। কথাটা হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু কি কঠোর অধ্যবসায়েরই না পরিচয় দেয়! তাই সূত্রগুলি রাসায়নিক সংকেতের (*formula*) মতো সংক্ষিপ্ত অথচ যিনি তার অর্থ সঠিক বোঝেন তাঁর কাছে অনেক ভাবপ্রকাশক এবং মনে রাখার পক্ষে খুব সুবিধা-জনক। অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছে অবশ্য অর্থশূন্য মনে হয়। ভারতবর্ষে অনেক বিখ্যাত পুস্তক সূত্রের সমষ্টি, যথা—পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র ও বাদরায়নের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। ব্রহ্মসূত্র থেকে একটি সূত্র উদ্ধৃত করে সূত্র যে কি জিনিস তা বোঝাবার চেষ্টা করব।

'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।'—এটি ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র। আচার্য শঙ্কর এর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে 'অথ' অর্থ অনন্তর, এখন প্রশ্ন এই যে কার অনন্তর; —নিত্য কি, অনিত্য কি, এর জ্ঞান, পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখভোগে বৈরাগ্য, শম দমাদি সাধন সম্পদ এবং মুক্ত হওয়ার ইচ্ছা হলে পর। 'অথ'র পরে 'অতঃ' —অর্থ সেই হেতু, অর্থাৎ স্বর্গাদির অনিত্যতা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরম পুরুষার্থ সাধনতা হেতু। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থ ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছা। মোট কথা এই সূত্রের অর্থ এই যে, সাধনসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তি জগৎকে অনিত্য এবং ব্রহ্মকে পরম পুরুষার্থ মনে করে ব্রহ্মকে জানবার জন্য চেষ্টা করবে।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করেছি। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা অমরসিংহ ও পাণিনির কাছে যে রকম ঋণী, তাঁদের কথা এবং লিপি সম্বন্ধে কিছু না বলে সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নয়। অভিধান বা কোষ প্রত্যেক ভাষার শ্রীবৃদ্ধির অত্যাবশ্যক অঙ্গ স্বরূপ। কালিদাসের সমসাময়িক অমরসিংহ প্রণীত 'নামলিঙ্গানুশাসন'ই সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ অভিধান—সাধারণত 'অমরকোষ' নামে বিখ্যাত। প্রায় দেড়

হাজার বছর আগে ঐ জাতীয় অভিধান তৈরি একটা অদ্ভুত কীর্তি বলতে হবে। সংস্কৃত ভাষাকে এতটা বৈজ্ঞানিক করার কীর্তি পাণিনির কম নয়। পাণিনি জগতে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণিক। তাঁর ব্যাকরণের নাম 'শব্দানুশাসন।' আট অধ্যায়ে বিভক্ত বলে একে সাধারণত 'অষ্টাধ্যায়ী' বলা হয়। এক কথায় পাণিনিকে বর্তমান ভাষাবিজ্ঞান সৃষ্টির মূলে বলা যেতে পারে। পাণিনি খৃষ্টের জন্মের সাতশত বৎসব পূর্বে, পাঞ্জাবেব আটকের নিকটবর্তী সালতুর নামক স্থানে জন্মেছিলেন। তিনি তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। পাণিনির পূর্ববর্তী চৌষট্টিজন বৈয়াকরণিকের মধ্যে দশজনের নাম তিনি উল্লেখ কবেছেন। নিতান্ত পরিতাপেব বিষয় এই যে তাঁদেব কোনো পুস্তক পাওয়া যায না।। পাণিনির পর সংস্কৃত ভাষা তাঁর ব্যাকরণ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।
বর্তমান সংস্কৃত ভাষা যে লিপিতে লিখিত হয় তাকে দেবনাগরী অক্ষর বলে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে ঐ ব্রাহ্মী লিপি বর্তমান দেবনাগরী অক্ষরে পবিণত হয়েছে। সম্রাট অশোকের অধিকাংশ শিলালিপি ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত। এখন প্রশ্ন এই যে, এই লিপি ভারতবর্ষের নিজস্ব, না অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং কোন সময় থেকে এ ভাষাটি ভারতবর্ষে প্রচলিত। দেবদত্ত ভাণ্ডাবকরের মতে ঋগ্বেদেব সময়েই ভারতবর্ষে লিখন পদ্ধতির জ্ঞান ছিল এবং ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষেই উদ্ভূত হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই লিখন পদ্ধতি অনেক পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়েছে বলে মনে করেন, এবং বিশেষ করে যাঁর মত খুব আদৃত হয়েছে সেই ডাক্তার বিউহ্লারের মতে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় বণিকদের মারফত ফিনিসীয় দেশ থেকে ব্রাহ্মী লিপি ভারতবর্ষে আমদানী হয়।
এই মত সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। পশ্চিম এশিয়ার ফিনিসীয় জাতিগুলি ডান দিক থেকে আরম্ভ করে বাঁ দিকে লেখে, আর ভারতবাসীরা বাঁ দিক থেকে আরম্ভ করে ডান দিকে লেখে। ফিনিসীয়দের মধ্যে ২২টি অক্ষর প্রচলিত ছিল, কিন্তু পাণিনির সময় সংস্কৃতে মোট ৪৬টি অক্ষর ছিল। পাণিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর লোক একথা পূর্বেই বলেছি। অতএব বিউহ্লারের মতে যে সময়ে ভারতবর্ষে ফিনিসীয় লিপি আমদানী হয়েছিল সেই সময় ও পাণিনির সময়ের মধ্যে মোটে দুই-এক শত বৎসরের তফাত। এই অল্প সময়ের মধ্যে

২২টি অক্ষর ৪৬টিতে পরিণত হওয়া, লিখন পদ্ধতি উল্টে যাওয়া, শুধু তাই নয় স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথকভাবে, এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলিও উচ্চারণের তারতম্য হিসাবে পৃথকভাবে লিখিত হওয়া—এই আমূল পরিবর্তন সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব মনে হয়। সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেরকম কণ্ঠ, তালব্য, দন্ত্য বর্ণ প্রভৃতি হিসাবে পৃথক পৃথক লিখিত হয় সেরকম আর কোনো ভাষায় নেই। উচ্চারণের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সংস্কৃতই জগতের সমস্ত ভাষার মধ্যে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক। পাণিনির সময় এরকম উন্নত অবস্থা ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্রমোন্নতির ফলেই যে পাণিনি বা তাঁর পূর্বেও সংস্কৃতভাষা এই উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল, এবিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। অতএব ডাক্তার বিউহ্লারের মত যুক্তিযুক্ত নয় এবং পাণিনির বহু শতাব্দী পূর্বেই ভারতবর্ষে লিপিজ্ঞান ছিল। ব্রাহ্মীলিপি ভারতবর্ষের নিজস্ব বলেই আমার মনে হয়। রমেশচন্দ্র দত্তও তাঁর প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে এই মত ব্যক্ত করেছেন।

২ পালি

প্রাকৃত ও কথ্যভাষার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। বুদ্ধদেব তাঁর ধর্মমত কথ্যভাষায় প্রচার করেন এবং তাঁর মতসমূহও কথ্যভাষার একটি সাহিত্যিক সংস্করণে লিপিবদ্ধ হয়। সৌরসেনী, মাগধী প্রভৃতি কয়েকটি কথ্যভাষার যে একটি সাহিত্যিক সংস্করণে বুদ্ধের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয় তাই পালি ভাষা নামে প্রসিদ্ধ। পালি সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় ,খুবই ক্ষুদ্র। পালিতে অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিজ্ঞান বা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে কোনো গ্রন্থ নেই, কোনো নাটক বা উপন্যাস নেই বললেও চলে। পালি সাহিত্য বৌদ্ধধর্মপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বৌদ্ধধর্মপুস্তকের মূল ত্রিপিটক। 'পিটক' শব্দের অর্থ ঝুড়ি। তিন পিটকের নাম: (১) বিনয় (২) সুত্ত ও (৩) অভিধম্ম পিটক। বিনয় পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের পালনীয় নিয়মসমূহ, আর সুত্ত ও অভিধম্ম পিটকে যথাক্রমে বুদ্ধের ধর্মমত ও ধর্মমতের দার্শনিক ব্যাখ্যা রয়েছে। সুত্ত পিটকের পাঁচ ভাগ। ক্ষুদ্দক নিকায় নামক একভাগের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় পুস্তক 'ধম্মপদ' বুদ্ধের অতি মহান উপদেশে পরিপূর্ণ। ভিনটারনিট্সের মতে ত্রিপিটক সংগৃহীত হয়ে প্রথম মুখে মুখে একজনের কাছ থেকে আর

একজনের কাছে যায়, পরে সিংহলের রাজা ভট্টগামনীর সময় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে লিপিবদ্ধ হয়। বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে ও সদ্‌গুণে বৃদ্ধ তাঁদের 'থেরা' (বৃদ্ধ) ও 'থেরী' (বৃদ্ধা) নামে অভিহিত করা হয়। তাঁদের রচিত উচ্চাঙ্গের ধর্মভাবে পরিপূর্ণ পুস্তক থেরা-থেরী-গাথা নামে খ্যাত। এই সমস্ত পুস্তকে একদিকে যেমন উচ্চভাব তেমনি কাব্যরসও বর্তমান রয়েছে। কয়েকটি অনুবাদ দিলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে—

(১)

ফুলেরে না করি ক্ষত না নাশি বরণ
না হরি সুবাস তার ভ্রমর যেমন
ফুল হতে ফুলে করে মধু আহরণ,
সুধী তথা ধরা মাঝে কর বিচরণ।
(ধম্মপদ—রিজডেভিসের ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(২)

ভিক্ষু নহে কভু শুধু ভিক্ষা মাত্র সার
চলে সদা ধর্ম মানি,
সর্বদ্বন্দ্বাতীত যেবা পূত আত্মা যার
তারে ভিক্ষু বলে গণি।

(৩)

মৌন লাগি নহে মুনি,
প্রেয়ঃ ত্যজি যেবা
শ্রেয়ঃ করে সেবা
তারে মুনি বলে মানি।
(ধম্মপদ—বিমলাচরণ লাহার ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(৪)

ক) সেই ভিক্ষু প্রেম যার জীবনের সার
বুদ্ধ উপদেশ সদা মহানন্দ যার

নির্বাণ আনন্দধামে পশিবে নিশ্চয়
প্রশান্ত সে দেশ যেথা সংস্কারের লয়।

খ) করুণায় প্রাণ তার হউক সিঞ্চিত
সাধু আচরণে সদা থাকুক সে রত ;
মহান আনন্দে তবে ভরিয়া পরাণ
ভিক্ষু সে করিবে তার দুঃখ অবসান।
(রিজডেভিসের ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(৫)

ক) ছিন্ন করি তিন ঘৃণ্য পাপের শিকড়
নির্মল করেছে তারা আপন অন্তর
কলুষ রেখায় নহে কলঙ্কিত তারা
তারি লাগি মোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা।

খ) পরিপূর্ণ আনন্দেতে শ্রেষ্ঠ কর্মে রত
নহে তারা জড় প্রায় কর্মহীন যত,
সকল বাসনা ঘৃণা পিষ্ট করে তারা
তারি লাগি মোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা।

গ) মুদ্রা তারা নিজ হস্তে করে না ধারণ,
না পরশে কভু কোনো রজত কাঞ্চন ;
দিনের অভাব দিনে আহরয়ে তারা
তারি লাগি মোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা।

ঘ) বহু দেশ শ্রেণী হতে হয়ে সমাগত
এক সঙ্ঘ মাঝে তারা হয়েছে মিলিত
প্রেমের বাঁধনে বদ্ধ পরস্পর তারা
তারি লাগি মোর প্রিয় সেই ভিক্ষু যারা।
(থেরীগাথা—মিসেস রিজডেভিসের ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(৬)

সকলি নশ্বর হায়, নিখিল ভুবনে
জীবের নিশ্চিত লয় অন্তিম শয়নে,
জন্মমাত্র হয় শেষ অনেক জীবন,
শান্তিময় ভিক্ষুব্রত করহ গ্রহণ।

দূর করেছি পিয়াস
সর্বভব সুখ আশ
স্বর্গ সুখ যত আর
নাহি লেশ মাত্র তার
আমি লভেছি নির্বাণ
শান্তি চরম মহান।

(থেরীগাথা—নয়মানের জার্মান থেকে অনূদিত)

পালি সাহিত্যে গল্পের বই যথেষ্ট আছে। আগেই বলেছি জাতক—গল্পের ভাণ্ডার। বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র (একাদশ শতাব্দী) রচিত 'বোধিসত্ত্ব অবদান কল্পলতা' ও সরস গল্পের বই। কিন্তু এই সমস্তই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাধারণ সাহিত্য হিসাবে পালি সাহিত্য বলে তেমন কোনো একটা জিনিস গড়ে ওঠেনি।

৩ তামিল

তামিল সাহিত্যের যে সমস্ত পুস্তকের কাল নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করা সম্ভবপর হয়েছে, তাদের মধ্যে মহাত্মা তিরুবল্লুবর প্রণীত 'ত্রিক-কুরল' বা 'কুরল'ই প্রাচীনতম। 'কুরল' খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। এই গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের প্রস্তাবনায় সি. রাজাগোপালাচারী লিখেছেন, "যদি কেউ তামিল জাতির প্রতিভা সঠিক উপলব্ধি করতে চান তাঁকে 'ত্রিক-কুরল' অবশ্যই পড়তে হবে। ভারতীয় সাহিত্যের পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভের জন্যও এই পুস্তক পাঠ অত্যাবশ্যক।...এই গ্রন্থে উত্তর ভারত তার সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে তামিল জাতির সভ্যতা ও বৈদগ্ধ্যের ঐক্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাবে।

তদুপরি 'ত্রিক-কুরল' দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য পরিস্ফুট করে তুলেছে।" তিরুবল্লুবর অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর উচ্চ ধর্মভাবের জন্য দাক্ষিণাত্যের কবি ও দার্শনিকরা সকলেই খুব শ্রদ্ধা সহকারে তাঁর নামোল্লেখ করেছেন। তিরুবল্লুবর মাদ্রাজ শহরের সমীপবর্তী মায়লাপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই কাপড় বুনে জীবিকা অর্জন করতেন। তিনি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। জৈন, বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণব—তৎকালীন দাক্ষিণাত্যের এই চার প্রতিষ্ঠাবান সম্প্রদায়ের তিনি কোনো একটিরও অন্তর্ভুক্ত না হয়ে, সকল সম্প্রদায়ের মধু সংগ্রহ করে মধুর ভাণ্ড স্বরূপ 'কুরল' বা 'তামিল-বেদ' জগৎকে উপহার দিয়েছেন।

কোনোরকম ধর্মসঙ্কীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। জৈন ও শৈবরা উভয়েই তাঁকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ বলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করেন। তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং গার্হস্থ্য জীবনকে কখনো মোক্ষলাভের অন্তরায় মনে করেননি, তাঁর মতে 'যিনি ধর্মানুকূল গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন তিনি মুমুক্ষু ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।'

'কুরল' ভক্তিমূলক ও নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ। একে নিঃসন্দেহে এক সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ বলা যেতে পারে। 'সেই মানুষই ধন্য যার চিত্ত আদি-পুরুষের পাদপদ্মে নিবিষ্ট থাকে, যে কারো সঙ্গে প্রেমাবদ্ধ হয় না বা কাউকে ঘৃণা করে না।' 'ধনসম্পত্তি আর ইন্দ্রিয় সুখের উত্তাল সমুদ্র তারাই পার হতে সমর্থ—যারা ধর্মসিন্ধু মুনীশ্বরের চরণে লীন থাকে।' 'কেবল তারাই দুঃখ থেকে উদ্ধার পায়, যারা সেই অদ্বিতীয় পুরুষের শরণ গ্রহণ করে।' 'আত্ম-সংযমের দ্বারা স্বর্গ লাভ হয় কিন্তু অসংযত ইন্দ্রিয়লিপ্সা ঘোর নরকের জন্য সহজ ও সরল রাস্তা।'

অহিংসা, সত্য, সদাচার, ক্ষমা, নির্লোভত্ব, দয়া, ত্যাগ প্রভৃতি সম্বন্ধেও উপরোক্ত ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যকর উপদেশাবলী আছে। সে সমস্ত জিনিস উদ্ধৃত করা অসম্ভব। অতি প্রাচীন কাল থেকে তামিল জাতির মধ্যে যে একটা উদার ধর্মভাবের বিকাশ হয়েছিল এ তার নিদর্শন মাত্র।

এম. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মতে, 'তামিল ভাষায় মূল গ্রন্থ খুব বেশি নয়, হাতের আঙুলে গণনা করা যেতে পারে। তামিল সাহিত্যের বেশির ভাগই সংস্কৃত ইতিহাস ও পুরাণের পদ্যানুবাদ। স্কুলের ছাত্রদের উপযোগী এলাতি

ও তিরিকাডুকমের মতো ক্ষুদ্রাকাব নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ কবিতা এবং শৈব ও বৈষ্ণব ভক্তদের অসংখ্য ধর্মস্তোত্র ও সঙ্গীত অবশ্য এর ব্যতিক্রম।' ডাক্তার কল্ডওয়েলের মতেও তামিল সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় যোগ্য নয়। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গাব তামিল সাহিত্যেব ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করেছেন—(১) খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বা প্রথম যুগ, (২) ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্য বা দ্বিতীয় যুগ, আর (৩) দ্বাদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তৃতীয় বা আধুনিক যুগ। প্রথম যুগের সমস্তই কবিতা, 'কুবল' প্রথম যুগেব অন্তর্ভুক্ত।

তামিলরা প্রাচানকালে খুব নৃত্য, গীত, বাদ্যাদি প্রিয় ছিলেন। নৃত্যকলা খুব উন্নত অবস্থায় পৌছেছিল, এ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থও লিখিত হয়েছিল।

নৃত্যগীতেব দিকে যেমন নজর ছিল, নাটক সম্বন্ধেও ঠিক তেমনি। কিন্তু নাটক বলতে তৃতীয় শতাব্দাতে লেখা 'শিলপ্পাদিকবম্' ভিন্ন আব কোনো তামিল পুস্তক পাওয়া যাযনি। এই পুস্তকে বঙ্গমঞ্চ, নাটকীয় চবিত্র, গায়ক, বংশী ও ইয়াজ নামে সাত থেকে একুশ তাব সম্বলিত বাদ্যযন্ত্র ও বাদকের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে এবং একটি খুব মনোবম সঙ্গীতেরও নমুনা আছে।

মধ্য যুগেব সাহিত্যের মধ্যে বৈষ্ণব এবং শৈব ভক্তদের রচিত স্তোত্র ও সঙ্গীত উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব ভক্তদেব মধ্যে আলোয়ারবাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। 'আলোয়ার' শব্দেব অর্থ জ্ঞানে গভীর। তাঁরা সংখ্যায় মোটে বারো জন। তামিল দেশে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তাবের মূলে তামিল আলোয়াররা। তাঁরা বিষ্ণুভক্তদের মোক্ষলাভের মধ্যস্থ বলে খুব সম্মানেব ও শ্রদ্ধার পাত্র, এমন কি বিষ্ণুমন্দিরে বিষ্ণু ও তাঁর অবতারদের মূর্তির সঙ্গে আলোয়ারদের মূর্তিও পূজিত হয়।

তাঁদের রচিত বিষ্ণুস্তোত্রসমূহ দশম শতাব্দীতে বৈষ্ণবাচার্য নাথ মুনি কর্তৃক 'নলিয়ারাপ্রবন্ধম্' নামক গ্রন্থাকাবে সংকলিত হয়। তামিল বৈষ্ণবদের কাছে এটি বেদস্বরূপ। এই গ্রন্থের হিন্দী বা ইংরাজি অনুবাদ হয়নি, অন্য কোনো ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে বলে জানি না। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ তাঁর 'আর্য' পত্রিকায় আলোয়ারদের কয়েকটি স্তোত্রের অনুবাদ করেছেন। তা থেকে সংক্ষেপ করে কিছু লিখলে আলোয়ারদের প্রগাঢ় ভক্তির পবিচয় পাওয়া যাবে।

আলোয়ারদের মধ্যে অণ্ডাল নামে একজন মহিলা ছিলেন। তিনি মীরাবাঈয়ের মতো শ্রীকৃষ্ণকে নিজের স্বামী বলে মনে করতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন।

তিনি প্রেমে পাগল হয়ে বাগানের কোকিলকে ডেকে বলছেন, হে কোকিল, তুমি তোমার মধুর স্বরে আমার প্রিয়তমকে ডেকে নিয়ে এস। আমি তাঁর রূপ দেখিনি কিন্তু আমার হৃদয় তিনি দখল করে বসে আছেন। কোকিল, তুমি জানো প্রিয়তম-বিরহে মানুষের প্রাণে কি মর্ম-বেদনা উপস্থিত হয়, তাই তাঁর আগমনী গান কর। আবার বলছেন, দক্ষিণ হাওয়া ও চাঁদের জ্যোৎস্না আমার অস্থি মাংস বিদীর্ণ করছে, কোকিল, তুমি আর আমার দুঃখ বাড়িও না। তোমার গানে যদি আমার প্রভু আজ না আসেন, তবে তোমাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দেব। তিনি স্বপ্ন দেখছেন নানা বাদ্যভাণ্ডের মধ্যে মুক্তার মালা গলায় পরে তাঁর বিয়ের দিনে প্রিয়তম মধুসূদন এসে তাঁর হাত ধরেছেন এবং পরে উভয়ে মিলে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন।

নাথ আলোয়ারের 'প্রেমে পাগল' স্তোত্রে ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে কেমন করে সকল জিনিসে ভগবানকে উপলব্ধি করে, তার মধুর বর্ণনা রয়েছে। মাটিকে প্রেমে আলিঙ্গন করে (ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে) সে বলে, 'এই মাটি বিষ্ণুর।' আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'দেখ, সেই স্বর্গ, যা বিষ্ণু শাসন করে।' কোমলাঙ্গ ধেনুবৎসকে আলিঙ্গন করে বলে, 'আমার কৃষ্ণ এরকম গোবৎস চরাত।' বৃষ্টি পড়ে, সে নাচতে নাচতে চিৎকার করে, 'আমার প্রেমের দেবতা এসেছে।' বংশীধ্বনি শুনে মূর্ছা যায়, কারণ সে ভাবে 'কৃষ্ণ বাঁশি বাজাচ্ছে।' গোয়ালিনীরা যখন মাখন নিয়ে যায় সে ভাবে, 'কৃষ্ণ এই মাখন আস্বাদ করেছিল।'

কুলশেখর আলোয়ার ভগবানকে একমাত্র আশ্রয় জেনে বলছেন, হে ভগবান তুমি যদিও আমাকে জগতের দুঃখ দৈন্য থেকে উদ্ধার করনি, তবু তোমার পাদপদ্মই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। মা যদি রাগ করে শিশু সন্তানকে দূরে ফেলে, সেই শিশু মা'র ভালোবাসার জন্য না কেঁদে আর কি করতে পারে। আমি সেই শিশুরই মতো। ডাক্তার যখন রোগীর মাংস কাটে ও পুড়িয়ে দেয়, তখনও রোগী তাকে ভালোবাসে। হে প্রভু, যদিও তোমার মায়া আমার

উপরে অশেষ দুঃখের বোঝা চাপিয়ে দেয়, তবু আমি তোমারই দাস থাকব এবং তোমার চরণে আশ্রয় নেব। হে প্রভু, উত্তাল সমুদ্রে পাখি জাহাজের মাস্তুল ছেড়ে চারিদিকে যায়, কিন্তু কোনো দিকে তীর না দেখে আবার সেই মাস্তুলেই ফিরে আসে। আমিও সেই পাখির মতো। বৃষ্টি মাঠের কথা ভুলে যেতে পারে, কিন্তু মাঠ চিরকালই বৃষ্টির জন্য পিপাসিতের মতো চেয়ে থাকবে। হে প্রভু, তুমি আমার হৃদয়ের বেদনা উপশম না করলেও আমার হৃদয় চিবকাল তোমারই।

দশম শতাব্দীতে যেমন নাথ মুনি বৈষ্ণব আলোয়ারদের স্তোত্র সংগৃহীত করেন, তেমনি নাম্বিয়াদার নাম্বি নামক একজন শিবভক্তও শৈব-নায়ানার বা মহাপুরুষদের স্তোত্রাবলী এক গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এই গ্রন্থের নাম 'তিরুমুরাই'। 'তিরুমুরাই' প্রকাশিত হওয়ার পরই খুব সম্ভবত নাথ মুনি 'নলিয়ারাপ্রবন্ধম্' সংকলন করেন।

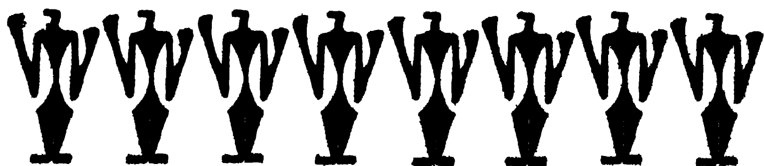
'তিরুমুরাই' এগারোখানি পুস্তকের সমষ্টি। প্রথম তিনখানি প্রসিদ্ধ শিবভক্ত তিরুনানসম্বন্ধের স্তোত্র ও কবিতার সমষ্টি। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে তিরু-মুরাইয়ের স্তোত্র ও কবিতাসমূহের রচয়িতা মহাপুরুষদের মধ্যে তিরুনানসম্বন্ধই সর্বাধিক সম্মান পেয়ে থাকেন। তিনি সপ্তম শতাব্দীর লোক। তাঁর স্তোত্রসমূহ গভীর ভক্তিরসে ভরপুর এবং সুললিত। দাক্ষিণাত্যের শিবমন্দিরে তাঁর মূর্তিও উপাসনার জন্য স্থাপিত হয়।

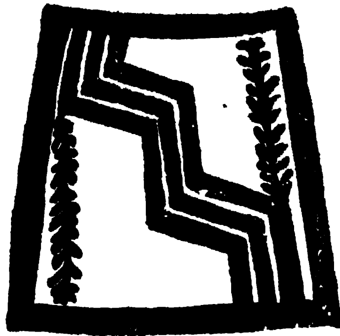
তিরুমুরাইয়ের অষ্টম পুস্তকের নাম তিরুভাষকম্ এবং রচয়িতা মানিকভাসগর। তামিলদেশে প্রত্যেক শৈব মন্দিরে মাণিক্কভাসগরের রচিত স্তোত্র প্রতিদিন গীত হয়। তিনি অষ্টম-নবম শতাব্দীতে তৎকালীন মাদুরার রাজমন্ত্রী ছিলেন। ভিন্‌টারনিট্‌সের মতে তামিলরা বলেন, 'তিরুভাষকম্ যার হৃদয় দ্রবীভূত করতে পারে না, তার নিশ্চয়ই পাষাণ-হৃদয়।'

খৃষ্টান ধর্ম-যাজক জি. ইউ. পোপ তিরুভাষকমের সঙ্গীতের গভীর ধর্মভাব দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন এবং তিনি এই সমস্ত সঙ্গীত রচয়িতা মাণিক্কভাসগরকে খৃষ্ট জগতের সুপ্রসিদ্ধ সেণ্ট পল এবং এ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

সংক্ষেপে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সংস্কৃত, পালি ও তামিল সাহিত্যের বর্ণনা দিয়েছি। সংস্কৃত সাহিত্যের যেরূপ সর্বতোমুখী বিকাশ হয়েছিল, পালি বা

তামিল সাহিত্যের তা হয়নি। পালি ও তামিল সাহিত্য একরকম ধর্মগ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্য অমূল্য রত্নরাজি পরিপূর্ণ। সেকালে জগতে তার তুলনা ছিল না। যে কোনো আধুনিক সাহিত্যের পাশেও সংস্কৃত সাহিত্য স্থান পেতে পাবে।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম

তপ্ত বৈশাখের বারিধারা, শরতের জ্যোৎস্না, বসন্তের মলয় বাতাস, প্রভাত-সূর্যের স্নিগ্ধ কিরণ, যদি কেউ একাধারে দেখতে চায়, তাকে ভারতবর্ষের ধর্মের ভিতরে অনুসন্ধান করতে বলি। ভারতবর্ষের ধর্ম হিমালয়ের মতো অত্যুচ্চ ও গম্ভীর, পাদদেশে উর্বর শস্যশ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র। গঙ্গার ধারা যেমন হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমস্ত দেশকে সরস ও সঞ্জীবিত করছে, ভারতবর্ষের ধর্মও তেমনি হিমালয় থেকে কুমারিকা, দ্বারকা থেকে আসাম পর্যন্ত গ্রাম-নগর, গিরি-গুহা-গহ্বর, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে সঞ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করছে। ভারতবর্ষের সকল জিনিসের মূলে ধর্ম। ভারতবর্ষে রাজ্য ধর্মার্থ ফলের নিমিত্ত। ভারতবর্ষে কবি অর্থ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। উপনিষদে ঋষি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 'বেদবিদ্যা, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ প্রভৃতি সবই অপরাবিদ্যা, যার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, শুধু তা-ই পরাবিদ্যা।' ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি গৌণ জিনিসের মূল্য ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা মুখ্যের (ধর্মের) সেবায় নিযুক্ত। এরা ধর্মের সেবা করতে কুণ্ঠা করেনি, ধর্মও এদের চিরকাল শক্তি ও প্রেরণা যুগিয়েছে। এই সুন্দর সামঞ্জস্যই প্রাচীন ভারতীয় জীবনকে মধুময় ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। ভারতবর্ষ শুধু প্রভাতসূর্যকিরণের মধ্যেই অমৃতের আস্বাদ পায়নি। স্মরণাতীত

কাল থেকে ভারতবর্ষ স্নিগ্ধ প্রভাত সূর্যের মতো প্রখর মধ্যাহ্ন ভাস্কর অস্তগামী সূর্যকেও বন্দনা করেছে। ভারতবর্ষই এক দেবতাকে রুদ্র ও শিব—ধ্বংস ও কল্যাণের মূর্তি বলে কল্পনা করেছে। ভারতবর্ষেই মহিষমর্দিনী দুর্গা মা অন্নপূর্ণা; ভারতবর্ষেই শ্মশানবাসিনী, মুণ্ডমালিনী, কঙ্কালিনী কালী মাতৃস্বরূপা। ভারতবর্ষেই কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। ভারতবর্ষেই পাঞ্চজন্য-শঙ্খ-ধ্বনিকারী শ্রীকৃষ্ণ 'চন্দনচর্চিত-নীলকলেবর-পীতবসন-বনমালী।' ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ধর্ম-সংমূঢ়চেতা হয়ে শিষ্যরূপে নিশ্চিত উপদেশ প্রার্থনা করেছেন। ভারতবর্ষেই অর্জুন ভক্তিরসামৃত পান করে, বিশ্বরূপ দর্শন করে, ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষেব ধর্মই শিক্ষা দিয়েছে মৃত্যুব ভিতর দিয়েই জন্মের সার্থকতা। ভারতবর্ষ তার ব্রহ্মের মধ্যে আলো ও অন্ধকারের মতো পরস্পর-বিরোধী সত্যের অপূর্ব মিলন সাধন করেছে। শুধু কল্পনার উৎকর্ষে নয়, উদারতার দিক দিয়েও ভারতবর্ষের ধর্ম অতুলনীয়। মধ্যযুগে ইউরোপে সর্বত্র ধর্মের নামে যে পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে, ভারতবর্ষে সে দৃশ্যেব অভিনয় কখনো হয়নি। ধর্মের নামে শত শত জীবন্ত মানুষকে পুড়িয়ে মারা বা নারী ও শিশুসন্তান নির্বিশেষে হাজার হাজার লোককে হত্যা করার কল্পনা ভারতবর্ষ কখনো মনেও স্থান দেয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথলিকরা সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়া তো দূরের কথা, সকল গুণে বিভূষিত হলেও তাঁরা সরকারী চাকরী পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতেন না। আজও কোনো রোমান ক্যাথলিক ইংলণ্ডের রাজা হওয়ার অধিকারী নন। ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে সমস্ত প্রাচ্যখণ্ডকে তার ধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত করেছিল। আজও তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। ভারতবর্ষের শরতের আকাশ যেমন 'কলহংস ধবল,' ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসও তেমনি পবিত্র ও মহিমাময়। ঋষি পতঞ্জলি তাঁর যোগশাস্ত্রে মোক্ষলাভের জন্য যে চারটি পন্থার নির্দেশ করেছেন তা ভারতবর্ষের ধর্মের আদর্শের জীবন্ত রূপ। পতঞ্জলির চারটি পন্থা যথাক্রমে এই—(১) ঈশ্বরের ধ্যান, (২) ঈশ্বরবাচক প্রণব বা 'ওঁ'কারের জপ ও তার অর্থ ভাবনা, (৩) যে সমস্ত পুরুষের চিত্ত বীতরাগ হয়েছে তাঁদের অর্থাৎ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে চিন্তা, (৪) যা অভিরুচি তাঁর ধ্যান।

এই কয়টি পন্থার মধ্যে তিনি কোনো তারতম্য করেননি। শুধু এই মাত্র বলেছেন, তিনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন না কেন তাতে কিছু আসে যায় না, যাঁর ভিতরে আবেগ বেশি তিনি শীঘ্রই মোক্ষলাভ করবেন। এই উদারতাই ভারতবর্ষের ধর্মের গোড়াকার কথা। এখানেই শেষ নয়, ভারতবর্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'সিদ্ধানাং কপিলো মুনি'—আমি সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি—এই কথা বলে সাংখ্যকার ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কপিল মুনিব শ্রেষ্ঠত্বই সপ্রমাণ করেছেন।

হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদ। অন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ততক্ষণই প্রামাণ্য যতক্ষণ পর্যন্ত বেদবিরোধী না হয়—বেদকে মান্য করে চলে। কিন্তু ভারতবর্ষ ধর্মজগতে মূলগত জিনিস ঠিক বেখে চিরকালই পবিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি প্রধান বৈদিক দেবতা। আজ ভারতবর্ষে তাঁদের উপাসনা একরকম নেই বললেও চলে। যদিও প্রত্যেক হিন্দুর বিবাহে বৈদিক যজ্ঞ প্রচলিত তথাপি বৈদিক যাগযজ্ঞাদি একপ্রকার লোপ পেয়েছে। গৌতম বুদ্ধ আপাত বেদবিরোধী, তিনিও কালক্রমে হিন্দুর দশ অবতাবের এক অবতার রূপে পূজিত হয়েছেন। বাঙালীব কণ্ঠে আজও জয়দেবের সুমধুর দশাবতার স্তোত্র গীত হয়। 'কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর জয় জগদীশ হরে'—সকল শিক্ষিত বাঙালীর সুবিদিত। সাধারণ কথায় বলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হযেছে; সেটা বাইরের দিকে সত্য হলেও ভিতরের কথা অন্যরূপ। অন্য প্রদেশের কথা জানি না, বাঙালীর সমস্ত পূজাতেই 'বুদ্ধায় নমঃ'—বুদ্ধকে নমস্কার—এই মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়। তাই আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম বিতাড়িত হলেও বুদ্ধদেব আজও বাঙালীর প্রাণের জিনিস ও আরাধনার বস্তু হয়ে আছেন।

ঋগ্বেদ ভারতের, শুধু ভারতের কেন সমস্ত জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ। ঋগ্বেদ বলতে আমি ঋক্‌সংহিতাব কথাই বলছি। এই গ্রন্থে বেদ সর্বত্রই সংহিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তিলকের মতে ঋক্‌সংহিতার কাল খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ বৎসরের কম ধরতে পারা যায় না। সেই প্রাচীনকালে ঋক্‌মন্ত্রেব ঋষিগণ জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে যে ধারণা করেছেন তা তৎকালীন জগতে আর কোথাও সম্ভবপর হয়নি। ভাবের মহত্ত্ব ও গাম্ভীর্যে, কল্পনার উৎকর্ষে তা চিরদিনই জগতের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের

দ্বিতীয় মন্ত্রে রয়েছে 'পুরুষ এবেদং সর্বম্ যদ্ ভূতম্ যশ্চভব্যম্'—বর্তমানে যা আছে, অতীতে যা ছিল, এবং ভবিষ্যতে যা হবে সে সমস্তই পুরুষ। শুধু একথা বললে বিরাট অসম্পূর্ণতা থেকে যায়, পুরুষসূক্তে ঋষি তা সম্যক্ উপলব্ধি করে তৃতীয় মন্ত্রে বলেছেন, এই দৃশ্যমান জগৎ সেই পুরুষের প্রকাশ, কিন্তু পুরুষ এই সমস্তের চেয়ে অনেক বৃহৎ। অর্থাৎ পুরুষ জীবজগৎ এবং জীব-জগতেরও অতীত। ঋগ্বেদে বহু দেবতার উপাসনার কথা রয়েছে, কিন্তু তা এই বিরাট পুরুষের ধারণার বিরোধী নয়। দীর্ঘতমা ঋষির মন্ত্রের 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এই দেবতা একই, বিপ্রগণ বহু বলেন—এই বাক্য তা সুস্পষ্ট করে। ঋক্‌সংহিতার প্রার্থনার মূলে ভক্তি, যাগযজ্ঞাদির মূলে কর্ম ও পুরুষসূক্তের এই ধারণার মূলে জ্ঞান; কিন্তু বৈদিকধর্ম কর্মপ্রধান ছিল। এই কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বিকাশলাভ করে ভারতবর্ষের ধর্মকে বিভিন্ন রূপ দিয়েছে। কিন্তু সেই প্রাচীন কালে ঋক্‌মন্ত্রের ঋষিরা যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তার উপরেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত। ছয় হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে যে বৃক্ষের অঙ্কুর জন্ম নিয়েছিল, তাই বড় হয়ে কালক্রমে সুগন্ধ ফুলে ও সুমিষ্ট ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদে যে জ্ঞানের বিকাশ দেখতে পাই, উপনিষদে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিলকের মতে ছান্দোগ্যাদি প্রাচীন উপনিষদের কাল প্রায় খৃষ্টপূর্ব ১৬০০। ভারতবর্ষের গৌরীশঙ্কর (এভারেস্ট) যেমন সর্বোচ্চ মস্তকে জগতের সামনে দণ্ডায়মান, উপনিষদের চিন্তাধারাও তেমনি। তিন হাজার বৎসরের অধিক পূর্বেকার কথা দূরে থাকুক, বিংশ শতাব্দীর যে কোনো মনীষী উপনিষদের ঋষির মতো জ্ঞানের পরিচয় দিলে জগৎ তাঁর কাছে নত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবে। উপনিষদ শুধু ভারতের নয়, সমস্ত সভ্যজগতের গৌরবের বস্তু। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মা বা অক্ষর পুরুষের যে বর্ণনা রয়েছে, সে সম্বন্ধে ম্যাক্‌ডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন, 'মানুষের চিন্তা-জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে, এখানেই আমরা সর্বপ্রথম অক্ষরের স্পষ্ট ধারণা ও ঘোষণা দেখতে পাই।' উপনিষদের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হয়ে, স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডেকে তাঁর সঙ্কল্পের কথা বলে, তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি অপর স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথা শুনে মৈত্রেয়ী বললেন, 'এই বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে কি আমি অমৃত লাভ করতে পারব?'

প্রত্যুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য যখন বললেন, 'না, ভোগোপকরণ সম্পন্ন মানুষের জীবন যেরকম হয় তোমারও সেরকম হবে।' তখন মৈত্রেয়ী যা বলেছিলেন, তা ভারতবর্ষেব প্রাণের অন্তরঙ্গ প্রদেশের কথা—'যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্'—'যা দিয়ে আমি অমৃতলাভ করতে পারব না তাতে আমার কি প্রয়োজন!' মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়ে ভারতবর্ষের ঋষি, ভারতের ধর্মের ভিত্তি যে ত্যাগ, সেই কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করা যায়—এই মহাবাক্য চিরকাল ভারতবর্ষের সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সকল মনীষীই নত মস্তকে গ্রহণ করে আসছেন। নচিকেতা যখন যম কর্তৃক নানা প্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে বলতে পেরেছিলেন, হে যম, এই জগতের সমস্তই ক্ষণস্থায়ী, ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহ জড়তাই প্রাপ্ত হয়; সমস্তই অল্পকাল বেঁচে থাকবে, অতএব তোমার হস্তী, অশ্ব, নৃত্যগীত তোমাতেই থাকুক'; তখনই যম নচিকেতাকে পবমতত্ত্বজ্ঞান লাভের অধিকাবী বলে বিবেচনা করেছিলেন। উপনিষদেব ঋষি সকল মানুষকেই পবম আশাব বাণী দিয়েছেন, 'আনন্দ থেকেই জীবেব জন্ম, আনন্দেই বিশ্রাম, আনন্দেই লয়।' এখানেই শেষ নয়, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—হে শ্বেতকেতু তুমিই সেই আত্মা—সেই ব্রহ্ম। এমন কথা জোর করে উপনিষদের ঋষিই জগতে প্রথম ঘোষণা করেছেন।

সমস্ত উপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষকে গীতামৃত পান করিয়েছেন। গীতাব মতো ধর্মগ্রন্থ জগতে বিবল। গীতাও উপনিষদের মতো সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। জার্মান পণ্ডিত ভিল্‌হেল্‌ম্ ফন হুম্‌বোল্ডট লিখেছেন, 'সম্ভবত গীতা জগতের সর্বাধিক গভীর ও মহান নিদর্শন। এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকার সৌভাগ্য লাভ করার জন্য আমি অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।'

গীতা, উপনিষদ ইত্যাদি পণ্ডিতদের জন্য। সর্বসাধারণের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ভারতবর্ষ সৃষ্টি করেছে, তার নাম পুরাণ। রামায়ণ, মহাভারত জনসাধারণকে কি ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। পুরাণের নাম শুনে অনেক আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোক নাসিকা কুঞ্চিত করলেও, একথা মুক্ত কণ্ঠেই বলছি যে জনসাধারণের ধর্মশিক্ষার জন্য, পুরাণের মতো এমন সুন্দর ধর্মগ্রন্থ জগতের আর কোথাও নেই। পুরাণে

ভক্তি পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। পূর্বেই বলেছি ভারতবর্ষে ধর্ম বিষয়ে সকলের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। সেই বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষে বহু মনীষী, বহু মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, স্বাধীন চিন্তা করে জীবের মোক্ষলাভের জন্য নানা পন্থার নির্দেশ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষ সে-সমস্তকেই ছাতে উঠবার বিভিন্ন রাস্তা বলে গ্রহণ করেছে। নদী যেমন বিভিন্ন পথ দিয়ে গিয়ে এক সমুদ্রেই পড়ে, তেমনি মানুষ বিভিন্ন পথ ধরে একমাত্র গন্তব্যস্থল সেই ভগবানেই পৌঁছয়—ধর্মে বিভিন্ন পথ সম্বন্ধে ভাবতবর্ষেব মনীষীরা এই সিদ্ধান্তই কবেছেন। ভাবতবর্ষের অসংখ্য ধর্মগ্রন্থ, বহু ধর্মমত, একদিকে যেমন স্বাধীন চিন্তাবৃত্তিব কথা সুস্পষ্ট কবে, অপর দিকে ধর্মজীবন লাভের ব্যাকুলতাই যে ভাবতীয় জীবনের প্রধান বিশেষত্ব তা সপ্রমাণ কবে। কিন্তু সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়েব মনীষীরাই বৈদিকধর্মের সনাতন শাশ্বত ভিত্তিকে বজায় বেখে, সময়োপযোগী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কবেছেন, এবং তাতে ধর্ম সবল ও সজীবই হযেছে। তিলকেব মতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও সনাতন বৈদিক ধর্মরূপ পিতারই পুত্র।

এ সবেব অর্থ এই নয় যে ভারতবর্ষেব ধর্মে কলঙ্কের মসীরেখা কখনও স্পর্শ করেনি। ধর্মের নামে তান্ত্রিক বামাচারীদের ও উচ্ছিষ্ট-গাণপত্য সম্প্রদায়ের কুৎসিত আচরণও সম্ভবপর হযেছে। কিন্তু একজন রূপলাবণ্য-সম্পন্না উদ্ভিন্নযৌবনা রমণীর বৃহৎ অন্ত্রের ভিতরে মল বর্তমান আছে বলে, যেমন কোনো দার্শনিক পণ্ডিত তাকে কুরূপা আখ্যা দেন না—রূপবতীই বলেন, ভারতবর্ষের ধর্মও তেমনি এ সব সত্ত্বেও মহান। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলে কোনো অতি-পণ্ডিত যদি শরতের পূর্ণিমা রাতের সৌন্দর্য উপভোগ না করে, দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর বসে থাকে, তবে তাকে লোক-সমাজে হাস্যাস্পদই হতে হয়। বায়ুতে রোগের বীজাণু আছে বলে, যদি কেউ নাকমুখ বন্ধ করে কুম্ভক করে বসে থাকে, তবে সে সব বীজাণুর হাত থেকে চিরতরে পরিত্রাণ পাবে—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয়ও নেই। বদ্ধজলে শেওলা গজায়—এ যেমন চিরন্তন সত্য, আবার স্রোতজল প্রবাহিত হলে শেওলা থাকতে পারে না, এও তেমনি পৃথিবীতে সূর্যের অস্তিত্বের মতো সত্য। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালেও স্রোত-প্রবাহ বন্ধ হয়ে শেওলা গজিয়েছে কিন্তু সময়মতো আবার বান এসে সে শেওলাকে সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছে। মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা

প্রত্যেক ভালো জিনিসকেই কালক্রমে অবনতির নিম্নতম স্তরে টেনে নিয়ে আসে।

আচার্য শঙ্কর মাত্র বত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এগারো খানা উপনিষদ (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও শ্বেতাশ্বতর), ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্য লিখে অদ্বৈতমত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ভারতবর্ষে তৎকালীন বড় বড় পণ্ডিতদের তর্কে পরাস্ত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, পদব্রজে কুমারিকা থেকে বদরিকাশ্রম, দ্বারকা থেকে পুরী, ভারতবর্ষের এই চার প্রান্ত ঘুরে হিমালয়ে যোশী মঠ, মহীশূরে শৃঙ্গেরী মঠ, দ্বারকায় সারদা মঠ, ও পুরীতে গোবধন মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত মঠ এক সময় হিন্দু সভ্যতাকে সুনিয়ন্ত্রিত করত। পরবর্তী কালে সেই কর্মবীর জ্ঞানী শঙ্করের শিষ্যেরাই মায়াবাদের দোহাই দিয়ে নিষ্কর্ম-নৈরাশ্যের প্রশ্রয় দিয়েছে।

যে জ্ঞানী প্রেমিকচূড়ামণি চৈতন্যদেব একদিন সারা বাঙলা দেশকে প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলেছিলেন, সেই চৈতন্যের ধর্মের দোহাই দিয়ে বাঙলায় একদল নেড়ানেড়ীর সৃষ্টি হয়েছে।

যে বুদ্ধদেব সমস্ত পার্থিব ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়ে এক মহান ত্যাগের ধর্মপ্রচার করেছিলেন, সেই বুদ্ধের তথাকথিত ভিক্ষু ভিক্ষুনীরাই একদিন ব্যভিচারের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছিল।

এমনি করে সকল ধর্ম-মতেরই অবনতি দেখানো যেতে পারে। খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে এরূপ প্রবাদ সুপ্রচলিত যে জগতে একজন মাত্র খৃষ্টান ছিলেন এবং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। গীতায় ভগবান সেই শাশ্বত সত্যকে অতি মধুর ভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখনি ধর্মের অভ্যুত্থানের জন্য আমি অবতীর্ণ হই।' এর ভিতরকার সহজ সত্য এই যে, ভগবানকেও বারবার আসতে হয়।

ভগবান স্বয়ং এসে প্রচার করে গেলেও সে সত্য অবিকৃত থাকে না, মানুষের দুর্বলতা তাকে বিকৃতরূপ দেয়, ভগবানকে পুনরায় আসতে হয় সত্যকে অবিকৃতরূপে তুলে ধরবার জন্য। অথবা সুবিজ্ঞ ডাক্তার যেমন রোগ বুঝে ওষুধ দেয়, একজন রোগীর উপর সমস্ত ডাক্তারখানার ওষুধ প্রয়োগ করে না, তেমনি ভগবানও মানুষের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত

করেন। পরে সময়ের পরিবর্তনে মানুষের প্রকৃতিগত পরিবর্তন হলে, ভিন্ন পন্থা নির্দেশ করেন। এই সহজ সরল সত্য ভারতবর্ষের ধর্ম স্বীকার করেছে। তাই ভাবতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আরম্ভ করে এক অখণ্ড ধর্মস্রোতকে অব্যাহত ও সবল রাখতে সমর্থ হয়েছে। প্রাচীনকালের কত সভ্যতা আজ বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমজ্জিত, শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা ও পণ্ডিতদের শ্রদ্ধার বস্তু, কিন্তু ভারতীর সভ্যতা বহু ভাগ্যবিপর্যয় সত্ত্বে আজও জীবন্ত, তার প্রধান কারণ ভারতবাসী ধর্মজীবনে এই শাশ্বত সত্যকে মেনে চলেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম কোনোদিনই অচলায়তনের বেড়া সৃষ্টি করেনি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়েব সৃষ্টি স্বাধীন চিন্তাকে অব্যাহতই রেখেছে—যখনই যে সম্প্রদায় তার অন্তরায় হয়েছে, তখনই সে অনাদরের মধ্য দিয়ে বিস্মৃতির শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছে। আব ধর্মের নামে যে সমস্ত অধর্ম সমাজে প্রবেশ করেছে, ধর্মজীবনে স্বাধীন চিন্তাব প্রভাব থাকায, তাও চিবস্থাযী ভাবে কোনো ক্ষতিসাধন করতে পাবেনি। সুস্থদেহের অন্তর্নিহিত শক্তির মতো ভারতবর্ষেব ধর্ম তার দেহে কোনো বিষাক্ত পদার্থ প্রবেশ করলে, তা সমূলে ধ্বংস করবার জন্যই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। তাই মনে হয়, বর্তমানে ভারতবর্ষে ধর্মের নামে যে সমস্ত অধার্মিক অনুষ্ঠান আজও চলছে, সে সব লোপ পেয়ে যাবে—ভারতের ধর্মের অতীত ইতিহাস সেই কথাই বলছে।

এখন সংক্ষেপে বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলে, ভারতীয় ধর্মের সবতোমুখী বিকাশের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করব।

১ ধর্মগ্রন্থ

পূর্বেই বলেছি ঋগ্বেদ ভারতের তথা জগতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ, কিন্তু ঋক্ সংহিতা একজনের রচিত নয়, বহু মন্ত্র বা ঋষিদের স্তব ও প্রার্থনার সমষ্টি। এই সমস্ত ঋষির মধ্যে গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ, বামদেব, অত্রি প্রভৃতি বিখ্যাত। বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-মন্ত্রের ঋষি। বিশ্বামিত্র ঋষি সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় থেকে ব্রাহ্মণ হওয়ার আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, কিন্তু ঋগ্বেদের বিশ্বামিত্র সেই বিশ্বামিত্র নন। বিশ্বামিত্র ঋষি একটি ভালো যোদ্ধা ছেলে

প্রার্থনা করেছিলেন, আমার মনে হয় তা থেকেই এই আখ্যায়িকার উৎপত্তি। সে সময়ে একজনেব চার পুত্র নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বৃত্তি অবলম্বন করতে পারত। দাসীপুত্র কবষ ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রেব ঋষি। 'বিশ্ববাবা নাম্নী একটি অত্রীবংশীয় স্ত্রীলোক ঋগ্বেদেব পঞ্চম মণ্ডলের অন্তর্গত (ঋগ্বেদ দশ মণ্ডলে বিভক্ত) একটি সম্পূর্ণ সূক্ত বচনা কবেন এইরূপ লিখিত আছে' (৺অক্ষয় কুমার দত্ত)। এতদ্ব্যতীত মেয়েদেব মধ্যে ঘোষা, অপালা, ও লোপামুদ্রা প্রভৃতি ঋষিব নাম পাওয়া যায়। 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'—স্ত্রী স্বাধীনতাব যোগ্য নয়—মনুব এরূপ বাক্য তখন হিন্দু ঋষিগণ কল্পনাও কবেননি, কিম্বা স্ত্রীলোক ও শূদ্রদেব উপব বেদ পাঠ বা শ্রবণের নিষেধাজ্ঞারূপ ১৪৪ ধারা জারি হয়নি।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, মিত্র প্রভৃতি তেত্রিশটি দেবতাব উপাসনা আছে। কিন্তু ইন্দ্রই সর্বাধিক প্রিয় দেবতা। সমস্ত ঋক্‌সংহিতার এক চতুর্থা শেবও বেশি ইন্দ্রের মহিমা গান। ইন্দ্রেব পবেই অগ্নিব স্থান, প্রায় এক পঞ্চমাংশ মন্ত্র অগ্নিব উদ্দেশ্যে বচিত। কিন্তু যখনই যে দেবতাব স্তুতি কবা হয়েছে, তখনই তাঁকে শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া হয়েছে, কাজেই মনে হয় যদিও ইন্দ্র বৈদিক ভাবতবাসীব সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন তবুও তাঁবা দেবতাদেব মধ্যে ছোট বড ভেদ কবেননি। শুধু তাই নয়, এই সমস্ত বহু দেবতা যে মূলে একই—'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—এই বাক্য সে কথাই সুস্পষ্ট করে। ঋগ্বেদের কোথাও প্রতিমাপূজা বা মন্দিবের উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদেব পুরুষসূক্তের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। পুরুষসূক্ত ঋগ্বেদের মুকুটমণি বলে প্রসিদ্ধ। এই সূক্তে একটি মন্ত্র আছে, সুপণ্ডিত সায়নাচার্য যাব জন্মগত জাতিভেদ সমর্থনকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং সেই মত আজ পর্যন্ত চলে আসছে। কাবো কারো মতে এই মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত—পরবর্তীকালে জন্মগত জাতিভেদরূপ অব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য ঋগ্বেদে এই মন্ত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই মন্ত্রকে প্রক্ষিপ্ত না বলেও প্রচলিত ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। সায়নাচার্য চতুর্দশ শতাব্দীতে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে তৎকালীন বিজয়নগর শহরে, বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলারী জেলার হাম্পী নামক স্থানে, তাঁর ঋগ্বেদভাষ্য রচনা করেন। তিনি ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাদ্রাজে ধর্মের নামে জাতিভেদের যে কঠোর

শৃঙ্খল হিন্দুসমাজের গলদেশে পরিয়ে দিয়েছে এবং যার ফলে হিন্দু সমাজের প্রায় শ্বাস রুদ্ধ হয়ে উঠেছে তা সমস্ত ভারতবর্ষে সুবিদিত। এও যে অনেক সুপণ্ডিত সমর্থন করেন তা বলাই বাহুল্য। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে জন্মগত জাতিভেদের ব্যবস্থা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারিপার্শ্বিক প্রভাবের হাত থেকে সুপণ্ডিত সায়নাচার্যও মুক্ত ছিলেন না—তাই তাঁর মতো পণ্ডিতও এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। দুঃখের বিষয় সায়নভাষ্যই বর্তমানে ঋগ্বেদের প্রাচীনতম ভাষ্য। অতএব এই মত চলে আসছে যে ঋগ্বেদ জন্মগত জাতিভেদ স্বীকার করে। তিলকের মতে ঋক্‌সংহিতা খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্বে রচিত। অর্থাৎ সায়নভাষ্য ঋগ্বেদ রচনার ছয় হাজার বৎসর পরে লেখা। ছয় হাজার বৎসর পরে একখানি গ্রন্থের ভাষ্য লিখতে গিয়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে একজন সুপণ্ডিতও ভুলপথে চালিত হতে পারেন—এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই যে ভারতবর্ষে ঋগ্বেদের যুগে জন্মগত জাতিভেদ প্রথা ছিল না। আমার মনে হয় পরবর্তীকালে পুরোহিতের ছেলের পক্ষে পুরোহিত, সৈনিকের ছেলের পক্ষে সৈনিক হওয়া সহজ—এই ধারণার দরুন সমাজে এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়, কিন্তু ফলে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের বোঝাই ভারি হয়ে উঠেছে।

ঋগ্বেদ ভিন্ন আরও তিনটি বেদ আছে: সাম, যজু, ও অথর্ব। অথর্ববেদকে অনেক শাস্ত্রকার বেদ বলে স্বীকার করেন না। মনুসংহিতায়ও বেদ হিসেবে অথর্ববেদের নাম নেই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও অথর্ববেদের স্থান ঋক্, সাম ও যজুর সমান বিবেচিত হয়নি। কৌটিল্যে আছে, 'সাম ঋক্ ও যজু এই তিন বেদ—ত্রয়ী, অথর্ববেদ ও ইতিহাসবেদও বেদপর্যায়ভুক্ত।' যা হোক, প্রচলিত ধারণা এই যে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চার বেদ। সামবেদের ৭৫টি স্তোত্র ব্যতীত সমস্তটাই ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র—শুধু তফাত এই যে সামবেদে ঐ সমস্ত মন্ত্র গীত হত। অন্তত ঐ সময় থেকেই ভারতীয় সঙ্গীত বিদ্যার উৎপত্তি। অথর্ববেদে বশীকরণের মন্ত্র, ওষুধ ইত্যাদির কথা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। কিন্তু তাই বলে উচ্চাঙ্গের ধর্মভাব যে নেই তা মোটেই নয়। অথর্ববেদের বরুণস্তোত্র বাস্তবিকই অতি মহান ভাবে পরিপূর্ণ; 'দুজন একত্র হয়ে যখন ষড়যন্ত্র করে এবং ভাবে, মাত্র তারাই আছে,

তখন তাদের মধ্যে তৃতীয় হিসাবে বরুণ উপস্থিত এবং তাদের সমস্ত পরিকল্পনাই তাঁর নিকট জ্ঞাত। এই পৃথিবী তাঁরই, ঐ দিগন্তব্যাপী অনন্ত আকাশও তাঁর। উভয় সমুদ্র তাঁর মধ্যে অবস্থিত। অথচ ঐ সামান্য জলটুকুর মধ্যেও তিনি রয়েছেন। আকাশে, পৃথিবীতে এবং আকাশের ওপারে যা কিছু বর্তমান সে সমস্তই বরুণের দৃষ্টির কাছে উন্মুক্ত।'

যজুর্বেদের দুইটি শাখা—শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। সংহিতার পরেই ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ একটি না একটি বেদের অন্তর্ভুক্ত। কৌষীতকি ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত, শতপথ ব্রাহ্মণ শুক্ল যজুর্বেদের ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত। যাগযজ্ঞাদির বিষয় সংহিতায় সংক্ষেপে এবং ব্রাহ্মণে বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে। বলতে গেলে ব্রাহ্মণ-সমূহকে যাগযজ্ঞবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন যজ্ঞের কিরূপ বিধি, কোন যজ্ঞে কিরূপ দক্ষিণা দিতে হবে, কোন যজ্ঞে যজমানের কিরূপ ফললাভ—এ সব ব্রাহ্মণে খুব স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণসমূহে যাগযজ্ঞের উপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে যে যজমানের ভক্তি অভক্তির উপর কিছু নির্ভর করে না, বিধিমতো যজ্ঞ হলেই ফললাভ নিশ্চিত। আর যজমানের শত ভক্তি থাকলেও যদি বিধি-বহির্ভূত কোনো কাজ হয় তবে যজ্ঞ পণ্ড হবে বা বিপরীত ফল হবে। মন্ত্রের উচ্চারণ ভুলের জন্যও একেবারে বিপরীত ফল হওয়ার উল্লেখ আছে।

ব্রাহ্মণের পর আরণ্যক ও উপনিষদের সৃষ্টি। যখন বানপ্রস্থ অবলম্বন করে লোক অরণ্যবাসী হতেন তখন তাঁদের পক্ষে ক্রিয়াবহুল যাগযজ্ঞ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁদের শিক্ষার জন্য যে সমস্ত পরম রহস্যময় দার্শনিক গ্রন্থের সৃষ্টি হয়—তা-ই আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। আরণ্যকে যে দার্শনিক চর্চা আরম্ভ হয়, উপনিষদে তা পরিণতি লাভ করে। ব্রাহ্মণে বেদের কর্মকাণ্ড ও উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এজন্য উপনিষদকে বেদান্ত বলে। কিন্তু যেমন ব্রাহ্মণের মূল বেদে, তেমনি আরণ্যকের চর্চার মূলও ঋগ্বেদে রয়েছে। চার বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ শিষ্যপরম্পরায় ঋষিদের মুখ থেকে শ্রুত হত বলে এদের শ্রুতি বলে। বৈদিক গ্রন্থ বলতে এই সমস্তই বোঝায়। বেদ অপৌরুষেয় আপ্তবাক্য বা স্বয়ংপ্রকাশ, এই হিন্দুর বিশ্বাস। এজন্য সমস্ত বৈদিক গ্রন্থের সঙ্গে পরবর্তী

ধর্মগ্রন্থগুলির মস্ত বড় একটা তফাত রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে যখন কোনো মত বিরোধ উপস্থিত হয় তখন শ্রুতিই প্রামাণ্য। এই সমস্ত বৈদিক গ্রন্থই প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের; কিন্তু এদের কোনটি কোন সময়ে লেখা একথা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। ম্যাক্‌সমুলার কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করে ঋগ্বেদের কাল খৃষ্টপূর্ব ১০০০-১২০০ সালেব পূর্বে নির্দেশ করেন। যদিও ম্যাক্‌সমুলারের মত সম্পূর্ণরূপে পবিত্যক্ত হয়েছে তবুও এই মত ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মনে এমন একটা সংস্কাব সৃষ্টি করেছে যে অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত আর ঋগ্বেদকে বেশি প্রাচীন বলে স্বীকার কবতে চান না। ভিনটারনিট্‌স এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে এক অনিশ্চিত অতীত কাল থেকে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৈদিক যুগ বলে ধরা যেতে পারে এবং এই অনিশ্চিত কাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্র বর্ষ। এই মতেব পিছনেও কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তিলক তাঁর গীতা-রহস্যে লিখেছেন—'পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহা-তাহা একটা অনুমান করিয়া লইয়া বৈদিক-গ্রন্থের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা ভ্রমমূলক, বৈদিক কালেব (ঋক্‌সংহিতার) পূর্বসীমা খৃষ্টপূর্ব ৪৫০০ বছরের কম ধরিতে পারা যায় না।...সার কথা, এই সব গ্রন্থের কাল নির্ণয় এই ভাবে হইয়া গিয়াছে যে ঋগ্বেদ খৃষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ববর্তী, যাগ-যজ্ঞাদিবিষয়ক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ খৃষ্টের প্রায় ২৫০০ এবং ছান্দোগ্যাদি জ্ঞানপ্রধান উপনিষদ খৃষ্টের প্রায় ১৬০০ বৎসর পূর্ববর্তী' (তিলক)।

গীতা প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের—একথা আগেই বলেছি। গীতায় উপনিষদ থেকে প্রায় অক্ষরশঃ শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে এবং গীতা নিজেকেও একটি উপনিষদ বলে স্বীকার করে। উপনিষদের মধ্যেও সময়ের তারতম্য আছে। কাজেই ছান্দোগ্য প্রভৃতি প্রাচীন উপনিষদের কাল খৃষ্টপূর্ব ১৬০০ অযৌক্তিক নয়। যদিও তিলকের মত অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হয়নি তবুও বৈদিক গ্রন্থের কাল সম্বন্ধে আমি এই মতই সর্বাধিক সমর্থনযোগ্য মনে করি। উপনিষদ ভারতীয় জীবনের উপর খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে, কিন্তু মীমাংসকগণ উপনিষদকে শ্রুতি পর্যায়ভুক্ত করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা যাগযজ্ঞের উপরে উঠতে পারেননি। অবশ্য হিন্দু সমাজ তাঁদের মত গ্রহণ করেনি। উপনিষদে ভারতীয় ঋষিরা প্রাচীনকালে যে মহান, প্রশান্ত, গম্ভীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন—প্রাচীনজগতে অন্য কোথাও সেরকম ছিল না। শুধু চিন্তাশক্তি

নয়, অন্তর্দৃষ্টি উপনিষদের বিশেষত্ব। উপনিষদ কখনও যুক্তির প্রাধান্য দেয়নি, 'যং তৎ পশ্যসি তদ্ বদ'—আপনি যা দেখছেন অর্থাৎ উপলব্ধি করছেন তা-ই বলুন, এটাই উপনিষদের ভিতরকার কথা। ১০৮ খানা উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে ঈশ, কেণ, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর এই এগারোখানা উপনিষদই প্রসিদ্ধ ও সুপ্রচলিত। উপনিষদ জনপ্রিয় হওয়ার দরুন পরবর্তীকালে এমন উপনিষদও রচিত হয়েছে যেগুলিকে কিছুতেই শ্রুতি পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে না। এমন কি মুসলমানদের দ্বারা আল্লোপনিষদও রচিত হয়েছে। উপনিষদ যে পরম জ্ঞানের নির্দেশ দিয়েছে তা শুধু উপনিষদ পাঠেই লাভ করা যায় না। উপনিষদও সেই কথাই বলছে, 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'—এই আত্মা অধ্যাপনা, মেধা, বা বহুশাস্ত্র পাঠে লাভ হয় না।

মুণ্ডকোপনিষদে ঋষি প্রকৃত গুরু ও শিষ্য উভয়েরই লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। শিষ্য সংসারের সমস্ত অনিত্য এই বিবেচনা করে ভিতরে বৈরাগ্য আনবে; তারপরে ব্রহ্মকে জানবার জন্য উৎসুক হয়ে যথোপযুক্তভাবে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে যাবে এবং গুরুও তখন এমন প্রশান্তচিত্ত ও শমযুক্ত শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেবেন। গুরু হবেন বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আর শিষ্য প্রশান্ত-চিত্ত, শমযুক্ত, বিরাগী ও জিজ্ঞাসু। আচার্য শঙ্কর তাঁর বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারীর যে চারটি অত্যাবশ্যক গুণের নির্দেশ করেছেন তা এই: (১) নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, (২) ইহামুত্রফলভোগ বিরাগ, (৩) শমদমাদি সাধন সম্পদ ও (৪) মুমুক্ষুত্ব। মুণ্ডকোপনিষদে বিবৃত শিষ্যের গুণের এ ভাষান্তর মাত্র। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই আত্মা (ব্রহ্ম)—ছন্দোগ্যোপনিষদের এই মহাবাক্যের মধ্যে উপনিষদ প্রতিপাদ্য সমস্ত জ্ঞান সন্নিবেশিত। জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, শুধু অজ্ঞানতা বশত আমরা ভেদ উপলব্ধি করি। শঙ্কর এই অজ্ঞানতাকে মায়া নাম দিয়েছেন। এই অজ্ঞানতা দূর হলেই অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হলেই জীবের মোক্ষ লাভ। এই আত্মা 'অণোরনীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ'—অণু হতে অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র, বৃহৎ হতেও বৃহৎ, বসে থেকেও দূরে, শুয়ে থেকেও সর্বত্র গমন করে, অর্থাৎ আত্মা সর্বব্যাপক। নামরূপই আমাদের সে জ্ঞান লাভের অন্তরায়। মুণ্ডকোপনিষদের ঋষি অতি সুন্দর

উপমা দিয়ে বলেছেন, 'নামরূপ ত্যাগ করেই নদী সমুদ্রে লীন হয়, তেমনি বিদ্বান সমস্ত নামরূপ ত্যাগ করে সেই অক্ষর (পরাংপর) পুরুষকে লাভ করে।' উপনিষদে ব্রহ্ম এবং আত্মা একার্থবাচক। উপনিষদের ব্রহ্ম, ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ, আর গীতার পুরুষোত্তম একার্থ বাচক।

জ্ঞানমূলক উপনিষদ ও যাগযজ্ঞমূলক ব্রাহ্মণ এই দুইয়ের পার্থক্য শঙ্কর বেশ ভালোভাবে নির্দেশ করেছেন। যাগযজ্ঞাদির ফল স্বর্গলাভ ইত্যাদি—মোক্ষ লাভ নয়। যাঁরা যাগযজ্ঞ করেন তাঁরা উপনিষদের পরম জ্ঞান লাভের অধিকারী নন। আর যাঁরা উপনিষদ প্রতিপাদ্য জ্ঞানলাভে নিযুক্ত তাঁদের বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতি কোনো আকর্ষণও নেই, প্রয়োজনও নেই। শঙ্করের মতে যাগযজ্ঞাদি নিম্নস্তরের লোকের জন্য। উপনিষদ পাঠ করলে একটা ব্যাপার দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয় যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রথম ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই উৎপত্তি লাভ করেছিল। অনেক ব্রাহ্মণ ঋষি ক্ষত্রিয় রাজাদের কাছে এ বিদ্যা শিক্ষা করতে গিয়েছেন—একথাও উপনিষদে আছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে পাই, ঋষি গৌতম রাজা প্রবাহনের কাছে শিষ্যত্ব স্বীকার করে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য গিয়েছিলেন। বৃহদারণ্যক ও কৌষীতকি উপনিষদে এমন আরো উদাহরণ আছে। আগে এই বিদ্যা ব্রাহ্মণরা অবগত ছিলেন না, উপনিষদে একথা স্পষ্ট লেখা রয়েছে।

বিভিন্ন উপনিষদে যে পরম জ্ঞান বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত, বাদরায়ণ তাঁর ব্রহ্মসূত্রে বা বেদান্তশাস্ত্রে এক জায়গায় সে সমস্ত সন্নিবেশিত করেছেন। আর সর্বোপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করে যে দুধ বা অমৃত লাভ করা গিয়েছে তা-ই গীতা—এরূপ প্রবাদ প্রসিদ্ধ। গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে এবং ব্রহ্মসূত্র স্মৃতি বলতে গীতাকেও বুঝেছে, কাজেই এই দুই গ্রন্থ যে সমসাময়িক এরকম সিদ্ধান্ত করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। প্রচলিত বিশ্বাস, বাদরায়ণ ব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করেছেন, আর গীতাও ব্যাসদেবের রচনা। এই দুই শাস্ত্র একজনের রচিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতা—এই তিন প্রস্থানত্রয়ী বা বেদান্তশাস্ত্রের তিন শাখা বলে প্রসিদ্ধ। তাই পরবর্তী যুগে সকল ধর্মাচার্যই (শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি) নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতাভাষ্য রচনা করেছেন। এই তিনের মধ্যে গীতাই সর্বাধিক জনপ্রিয়, কিন্তু গীতা শ্রুতিপর্যায়ভুক্ত নয়।

গীতায় উক্ত ধর্ম কি এ বিষয়ে নানা মনীষী নানা মত ব্যক্ত করেছেন। প্রাচীন-কাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সময় পর্যন্ত গীতার নূতন নূতন ভাষ্য রচিত হচ্ছে। সকলেই নিজ নিজ মতের জন্য একচেটে সত্যের দাবি করেছেন। এদের মধ্যে কোনটি সত্য তা নির্ধারণ করার ব্যর্থ প্রয়াসে আমি কিছুতেই প্রবৃত্ত হতে রাজী নই। যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে ধর্মাচার্যগণ গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন তাও আমাব নেই, গীতা পাঠ করে সাধারণ ভাবে যা বুঝেছি আমি শুধু সেই কথাই ব্যক্ত করব।

আগেই বলেছি—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করে রাজ্যলাভ করা নিরর্থক ভেবে অর্জুনের মনে বিষাদ উপস্থিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিমূলক নানারকম যুক্তি দিয়ে, এমন কি বিশ্বরূপ দর্শন করিয়ে অর্জুনের মানসিক জড়তা দূর করেছিলেন। অর্জুনের বিষাদে গীতার প্রারম্ভ, আর 'নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত। স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহ করিষ্যে বচনং তব॥'—হে ভগবন্, তোমার প্রসাদে আমার মোহ নষ্ট হয়েছে, আমি স্মৃতিলাভ করেছি, স্থিত ও গত সন্দেহ হয়েছি, এখন তোমার বাক্যানুযায়ী কাজ করব—অর্জুনের এই উক্তির সঙ্গেই গীতার সমাপ্তি। অর্থাৎ অর্জুনের কর্মে অপ্রবৃত্তিরূপ জড়তায় গীতার প্রারম্ভ, কর্মে প্রবৃত্তি ফিরে আসাব সঙ্গেই গীতার শেষ। কোনো মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করাব জন্য গীতা রচিত হয়নি, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল অর্জুনের বিষাদ দূর করে তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত করানো, তাতে তিনি সফলকাম হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ভক্তিজ্ঞানের পরম তত্ত্ব, এমন কি যশোকামী সাধারণ লোকের ভিতরে কর্মপ্রেরণা জাগ্রত করাব জন্য যে সমস্ত কথা বলতে হয়, সে সমস্তই বলেছিলেন! 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'—সর্বধর্ম পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও—শ্রীকৃষ্ণ একথাও যেমন বলেছেন, তেমনি 'তস্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশোলভস্ব, জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্'—সেই হেতু তুমি ওঠ, যশ লাভ কর, শত্রু জয় করে সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর—এই উক্তিও করেছেন। একদিকে উচ্চাঙ্গের দর্শন—কে কাকে মারে, কেই বা মরে; আত্মা অমর, মানুষ যেমন জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করে নূতন বস্ত্র পরিধান করে তেমনি আত্মাও জীর্ণ শরীর পরিত্যাগ করে নূতন শরীরকে আশ্রয় করে। আবার অপর দিকে লৌকিক যুক্তি—তুমি যদি যুদ্ধ থেকে বিরত

হও, তাহলে তুমি ভয়ের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে বিমুখ হয়েছ বলে লোকসমাজে তোমার অকীর্তি প্রচারিত হবে, এবং সম্মানিত ব্যক্তির পক্ষে অকীর্তির চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়, অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধে প্রবৃত্ত করানোর জন্য এই উভয় প্রকারের যুক্তিই প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সমস্ত যুক্তিরই সমষ্টিগত ফল অর্জুনের মোহমুক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়ে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব বিশদ-ভাবে ব্যাখ্যা করে পরিশেষে বললেন, 'আমি তোমাকে গুহ্য হতে গুহ্যতর জ্ঞানের কথা বলেছি, এখন তুমি এ সমস্ত সম্যক্‌রূপে পর্যালোচনা করে তোমার ইচ্ছানুরূপ কাজ কর।' অর্জুন সব দিক বিবেচনা করে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করাই শ্রেয় স্থির করে, 'তোমার কথামতো কাজ করব'—অর্থাৎ যুদ্ধ করব বললেন। এতে অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের উপর একান্ত নির্ভরতা বা আত্মসমর্পণের কথা অনেকে বলেন, কিন্তু অর্জুন তখনই শ্রীকৃষ্ণের কথামতো কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন, যখন তিনি সব দিক দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করেছিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষই এরকম করেন—তার মধ্যে আত্ম-সমর্পণের কথা কি করে আসতে পারে! বিশ্বরূপ দর্শন করার পরও অর্জুন ভক্তিগদগদ চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। তারপরেও অর্জুনের সমস্ত সন্দেহ দূর করার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে অনেক কথা বলতে হয়েছিল—তাই-ই গীতার শেষ পাঁচ অধ্যায়। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করে, জ্ঞান লাভ করে, পরম-ভক্তিতত্ত্ব অবগত হয়ে, ভীষণ লোকক্ষয়কারী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, এতে গীতায় কর্মের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এমন সিদ্ধান্তও অনেকে করেছেন। এই মতও আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। এ শুধু এই কথাই প্রমাণ করে, যে পরম ভক্তি ও জ্ঞানলাভ করেও কর্ম করা যেতে পারে, তার মধ্যে অসামঞ্জস্য কিছু নেই। গীতায় কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তি কোনোটার প্রাধান্য দেখানো হয়নি, বরং তাদের সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে। পরম জ্ঞানী ও ভক্ত সমাজের ও দেশের কল্যাণের জন্য ধর্মবুদ্ধিতে কর্ম করতে পারেন, এই গীতার প্রতিপাদ্য ধর্ম। অর্জুনের পক্ষে ঐরকম কর্মের প্রয়োজন ছিল, তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে ঐ উপদেশ দিয়েছিলেন। গীতা এই হিসেবে কর্মমূলক বটে কিন্তু তা ভক্তি ও জ্ঞানের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্য নয়। অর্জুন 'ধর্ম-সংমূঢ় চেতা' হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে শিষ্যভাবে নিশ্চিত উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—ধর্মের এই তিনদিকই বোঝান। তার ফলে

যখন অর্জুন বুঝতে পারলেন, উচ্চাঙ্গের ধর্মের সঙ্গে ঘোরতর কর্মময় জীবনের কোনো অসামঞ্জস্য নেই এবং তাঁর পক্ষে তখন কর্ম করাই শ্রেয়, তখনই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হলেন। অর্জুনের কাছে কর্তব্যের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, জ্ঞান ও ভক্তির পরম তত্ত্বলাভ তাঁর কর্তব্য নির্ধারণের পথ পরিষ্কার করে দেয়। কর্মময় জীবনে অনেক সময় মানুষকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে হয়, ভক্তি ও জ্ঞানের আলোকে হৃদয় উদ্ভাসিত হলে, কর্তব্য নির্ধারণ সহজ হয়ে ওঠে, অর্জুনের এই ইতিবৃত্ত তা-ই সুপ্রমাণ করে।

কয়েক অধ্যায়ে সমস্ত যুক্তির শেষে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত'—অতএব হে অর্জুন যুদ্ধ কর—শ্রীকৃষ্ণের এরকম উক্তি থেকে অনেকে মনে করেন কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁর উদ্দেশ্য। অর্জুন দুর্বলতা বশত মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্মের ভুল ধারণা করে কর্মত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্মজড়তা দূর করে কর্ম করতে প্রবুদ্ধ করেন। মোহ বশত কর্মবিমুখ ব্যক্তির ভক্তি ও জ্ঞানের অন্তরালে আশ্রয় নেওয়া ধর্ম নয়, তাঁর পক্ষে কর্মবিমুখতা দূর করাই ধর্ম। কাজেই কর্মবিমুখতা দূর করে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বারবার বলার মধ্যে কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন নেই—আছে জগতের শাশ্বত ধর্মকে পরিস্ফুট করা। যে ভক্তি ও জ্ঞান কর্মবিমুখতাকে সমর্থন করে, তা তামসিকতার নামান্তর মাত্র—ধর্মের নামে অধর্ম। কর্মবিমুখ ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে কর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—গীতায় ভগবানের 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব' এই কথাই প্রমাণ করে—ভক্তি ও জ্ঞানের উপর কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে না। গীতার মহাবাক্য কী—অনেকে এ প্রশ্ন তুলেছেন। কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করে গীতার মহাবাক্য নির্দেশ করা ভুল হবে। কর্মবিমুখ ব্যক্তির পক্ষে কর্মজড়তা দূর করে কর্ম করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং পরম ভক্তি ও জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে তার পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যও রয়েছে—যদি বলতে হয়, তবে এই-ই গীতার মহাবাক্য।

আগেই বলেছি উপনিষদ বা গীতা পণ্ডিতলোকদের জন্য। সর্বসাধারণের ধর্ম-শিক্ষার জন্য হিন্দু প্রতিভা পুরাণ সৃষ্টি করেছে। ঠাকুরমার ঝুলির গল্পের মতো অনেক অতিরঞ্জিত গল্প পুরাণে আছে। সে সমস্তকে ইতিহাস বলে যদি কেউ পুরাণের বিচার করতে যান, তবে তিনি পুরাণের প্রতি অবিচারই করবেন। তার অন্তর্নিহিত হৃদয়-মন-মুগ্ধকারী ভক্তিরসামৃত আস্বাদ করলেই পুরাণের

মর্যাদা রক্ষা করা হবে। অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাবে পুরাণে উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব-সমূহ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কাহিনী সারা বাঙলায় সুবিদিত। প্রহ্লাদ ভক্তের আদর্শস্থানীয়। প্রহ্লাদের চরিত্র শুকতারার মতো সামনে রেখে ভক্ত অশেষ দুঃখের মধ্যেও ভগবানের কল্যাণময় বরাভয় দেখতে পায়! পদ্মপুরাণের বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী আজও বাঙলার কোনো কোনো গ্রামে প্রতি বছর গীত হয়। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, যেমন নারী জাতির আদর্শ, বেহুলাও তেমনি।

'আমি নরকে বাস করলে যদি আর্তজনের দুঃখের লাঘব হয় তবে অনন্তকাল নরকে বাস করাই শ্রেয় মনে করি'—মার্কণ্ডেয় পুরাণের রাজা বিপশ্চিতের এই উক্তি জগতের যে কোনো ধর্মানুগামী মহাপুরুষের উপযুক্ত বাক্য। মহাপুণ্যবান রাজা বিপশ্চিতকে সামান্য ত্রুটির (ত্রুটি কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে) জন্য নরকে যেতে হয়েছিল। অল্পক্ষণ নরকে থাকার পর যমদূতের আদেশ মতো যখন তিনি স্বর্গে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলেন, তখনই নরকবাসীরা তাঁকে মুহূর্তকাল অপেক্ষা করার জন্য চিৎকার করে উঠল, কারণ তাঁর শরীর থেকে এমন মধুর গন্ধ নির্গত হচ্ছিল যাতে নরকযন্ত্রণা লাঘব করে। তাদের করুণ আবেদন শুনে তিনি নরক পরিত্যাগ করতে অস্বীকৃত হযে বললেন, 'আমার মনে হয়, মানুষ আর্তের দুঃখ লাঘব করে যে আনন্দ লাভ করে, স্বর্গে কিম্বা ব্রহ্মলোকে তা কখনো লাভ করতে পারে না। আমার উপস্থিতিতে যদি সমস্ত আর্তের দুঃখের লাঘব হয়, তবে আমি এখানেই স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকব, এখান থেকে বিন্দুমাত্রও নড়ব না।'

যমদূত তাঁকে বললেন, 'ঐ সমস্ত লোক নিজ কর্মদোষে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তুমি যাও, স্বর্গে গিয়ে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ কর।' তখন রাজা তাকে বললেন, 'এই সমস্ত নরকের অধিবাসী যদি আমার উপস্থিতিতে আনন্দ পায় তবে আমি কিছুতেই এ স্থান পরিত্যাগ করব না। আর্তের জন্য যার হৃদয়ে করুণার উদ্রেক না হয়, তার জীবন কলঙ্ক ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ। এদের জন্য যদি আমার নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, ক্ষুধাতৃষ্ণায় যদি আমার বোধ শক্তি রহিত হয়, তবুও আমি এদের আশ্রয় দেওয়া স্বর্গ-সুখের চেয়েও প্রীতিকর মনে করি। আমার একার কষ্টে যদি অসংখ্য হতভাগ্যের আনন্দ হয় তবে

আমি তার চেয়ে বেশি আর কিছুই চাই না।' এমন উচ্চভাব খুব কম ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণের অন্তর্গত এবং সমস্ত পুরাণের মধ্যে বর্তমানে ভাগবতই সর্বাধিক আদৃত। ভাগবতের দশম স্কন্ধ রাসলীলা বা পরমহংসগীতা। যাঁদের চিত্ত-মন সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হয়েছে, একমাত্র তাঁরাই রাসলীলা শুনবার অধিকারী। রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের গোপীপ্রেমের বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এখানেও শ্রীরাধার উল্লেখ নেই। (মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্রসংহিতায় উল্লেখ আছে।)

ভাগবতে বুদ্ধও দশ অবতারের এক অবতার। পুরাণ সংখ্যায় অষ্টাদশ, এই অষ্টাদশ পুরাণই ব্যাসদেবের রচিত—এই সাধারণ বিশ্বাস। বিষ্ণু, পদ্ম, ভাগবত, বায়ু, ব্রহ্মবৈবর্ত, ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ—পুরাণসমূহের মধ্যে অধিক প্রচলিত। পুরাণসমূহ কোন সময়ে রচিত তা স্থির করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। পুরাণের উল্লেখ অথর্ববেদেই পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পুরাণের উল্লেখ আছে। আপস্তম্ভের ধর্মসূত্র (কোনো মতে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী, কোনো মতে পঞ্চম শতাব্দী) পুরাণ থেকে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছে, তার মধ্যে একটি ভবিষ্যৎপুরাণ থেকে। কিন্তু ঐ শ্লোক বর্তমান ভবিষ্যৎপুরাণে নেই। কাজেই মনে হয়, অতি প্রাচীনকালে যেসব পুরাণ ছিল, সে সমস্ত এখন আর পাওয়া যায় না, হয়তো সেগুলিই পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান আকার লাভ করেছে। বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ একাদশ শতাব্দীর আগেই রচিত, কারণ সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময় আলবিরুণী নামে একজন পণ্ডিত এসেছিলেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করেছেন। কবি বানভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে তাঁর গ্রামে বায়ুপুরাণ পাঠ শুনেছেন। কাজেই বায়ুপুরাণ যে সপ্তম শতাব্দীর অনেক আগে রচিত—এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিষ্ণুপুরাণে মৌর্যবংশীয় রাজাদের (৩২১-১৮৫ খৃষ্টপূর্ব), মৎস্যপুরাণে অন্ধ্ররাজাদের (প্রায় ২২৫ অব্দে তাঁদের রাজত্ব শেষ হয়), এবং বায়ুপুরাণে গুপ্তবংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের (৩২০-৩৪০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বের বর্ণনা আছে। কাজেই যথাক্রমে উপরোক্ত ঐ সময়ের পরে ঐ তিন পুরাণ রচিত হয়েছে। ভিন্টারনিট্‌সের মতে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণসমূহ সপ্তম শতাব্দীর আগেই রচিত। রামকৃষ্ণ

ভাণ্ডারকরের মতে ভাগবত দশম শতাব্দীতে রচিত, ভিনটারনিট্‌সের মতও তদনুরূপ।

পুরাণসমূহ ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ, বিশেষত শিব-বিষ্ণুভক্তি। আগেই বলেছি বৈদিক গ্রন্থে কোথাও প্রতিমাপূজার কথা নেই। কিন্তু প্রতিমাপূজা পুরাণের বিশেষত্ব। বর্তমানে বাঙলায় যে সমস্ত পূজা প্রচলিত তা পুরাণোক্ত বা তন্ত্রোক্ত। এখন স্বতঃই এই প্রশ্ন মনে ওঠে: কোন সময় থেকে ভারতবর্ষে প্রতিমাপূজা প্রচলিত হয়। প্রতিমাপূজা কোন সময় থেকে আরম্ভ হয়, একথা নিশ্চিত বলা শক্ত। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই যে প্রতিমাপূজা ও মন্দির সুপ্রচলিত হয়েছে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পতঞ্জলি (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) শিব, স্কন্দ প্রভৃতি দেবতার প্রতিমা বিক্রির কথা লিখেছেন। 'চিতোরের নিকটবর্তী নগরী নামক স্থানের এক শিলালিপিতে (খৃষ্টপূর্ব ৩৫০-২৫০) বাসুদেব ও সংকর্ষণের মন্দিরের উল্লেখ আছে। ইহাই বৈষ্ণব মতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রাচীনতম শিলালিপি। এই শিলালিপি সংস্কৃতে লিখিত—সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালিপি হিসাবেও ইহা প্রাচীনতম।'—(কুমারস্বামী)

মালবের অন্তর্গত বেসনগর (বর্তমান গোয়ালিয়র রাজ্যে) নামক স্থানে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর এক শিলালিপিতে পাওয়া যায় হিলিওডোরা নামক গ্রীক রাজদূত বিষ্ণুর সম্মানার্থ এক গরুড়ধ্বজ তৈরি করেছিলেন। হিলিওডোরা ভাগবত ছিলেন। প্রতিমাপূজা ও মন্দির খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এতদূর প্রচলিত হয়েছিল যে একজন বিদেশী ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করে গরুড়ধ্বজ নির্মাণ করেছিলেন। কুশান বংশীয় রাজা বিমকডফিসেস্ (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) তাঁর মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্তি অঙ্কিত করেছেন। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে পাণিনির সময় বাসুদেব-উপাসনা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে সময় তাঁর প্রতিমা পূজা হত বা তাঁর নামে যে মন্দির ছিল—একথা নিশ্চিত বলা যায় না।

পুরাণ একই ভগবানকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, পালনকর্তা বিষ্ণু ও সংহারকর্তা শিব এই ত্রিমূর্তিতে কল্পনা করেছে, তবুও বিষ্ণু ও শিবপূজাই পুরাণের বিশেষত্ব। বিষ্ণু ও শিব মন্দির ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যমান; কিন্তু সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র পুষ্করে (রাজপুতানা) একটি ব্রহ্মার মন্দির আছে, আর কোথাও নেই।

শ্রীমদ্ভাগবতে বুদ্ধদেব দশ অবতারের এক অবতার—একথা বলেছি, এর

মানে এই যে পুরাণের সময় অবতারবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। একথা বলাই বাহুল্য যে বেদে অবতারবাদ নেই। অবতারবাদ কোন সময় থেকে ভারতবর্ষের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছে, তা বলা যায় না। মহাভারতের শান্তিপর্বে ছয় অবতারের (বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, ও বাসুদেব-কৃষ্ণ) উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐ অধ্যায়ের কয়েক শ্লোক পরেই আবাব প্রথমে হংস, মৎস্য, কূর্ম, এবং কৃষ্ণের পর সর্ব শেষে কল্কি অর্থাৎ দশ অবতারের উল্লেখ রয়েছে। হরিবংশেও প্রথমোক্ত ছয় অবতারের বর্ণনা পাওয়া যায়। কাজেই মনে হয় মহাভারতের দশ অবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকটি পরবর্তী কালে শান্তিপর্বে স্থান পেয়েছে। হরিবংশ—রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে রচিত। সুতরাং তৃতীয় শতাব্দীর আগে যে অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান দশ অবতার (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, বাসুদেব-কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কি) বরাহপুরাণে পাওয়া যায়। জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্র রচিত হওয়ার পর উপরোক্ত দশ অবতার বাঙলার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সুপরিচিত। গীতার 'সম্ভবামি যুগে যুগে' এই বাক্য অবতারবাদের স্পষ্ট আভাস দেয়, যদিও গীতায় অবতার শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

বাঙালীর সমস্ত পূজা পুরাণোক্ত বা তন্ত্রোক্ত বলেছি। তন্ত্র মুখ্যত বাঙলার সৃষ্টি। শিব ও পার্বতীর মধ্যে কথোপকথন আকারে তন্ত্র রচিত। সাধারণত তন্ত্র সংখ্যায় ৬৪ খানা বলে খ্যাত। তন্মধ্যে মহানির্বাণ তন্ত্রই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে জনপ্রিয়তা হিসাবে গীতার পরেই মহানির্বাণ তন্ত্রের স্থান। ভগবানকে শক্তি বা মাতৃরূপে আরাধনা তন্ত্রের বিশেষত্ব। দুর্গা, কালী, উমা, লক্ষ্মী প্রভৃতি সবই জগন্মাতার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র। এই জগন্মাতাই জগতের সমস্ত শক্তির উৎস স্বরূপ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই তিনই মা'র মধ্যে বর্তমান। এই শক্তিপূজা থেকেই সকল নারীকে মাতৃরূপে দেখবার ধারণা এসেছে। তন্ত্রে মেয়েরা গুরু হতে পারেন এমন ব্যবস্থা আছে। এখনও পাশ্চাত্যদেশ মেয়েদের এতটা সম্মানের স্থান দেয়নি। স্যর জন্ উড্রফের মতে তন্ত্রে অদ্বৈতবাদের সাধনা বাস্তবরূপ গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে এটা স্বাভাবিক, কারণ প্রাচীন গৌড় দেশ (বাঙলা) অদ্বৈতবাদ ও তন্ত্রশাস্ত্র উভয়েরই গুরু। বাঙলায় গৌড়পাদাচার্য, 'অদ্বৈতসিদ্ধির' রচয়িতা মধুসূদন

সরস্বতী, চিৎসুখাচার্য প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'ব্রহ্মাপরায়ণ বাঙালী প্রকৃতির ভিতরে অদ্বৈতবাদের প্রতি খুব একটা ঝোঁক আছে বলে আমার মনে হয়' (উড্রফ)।

তন্ত্রের শারীরসংখ্যানবিদ্যা (Anatomy) আধুনিক বিজ্ঞান বা হিন্দু চিকিৎসা-শাস্ত্র অনুযায়ী শারীরসংখ্যানবিদ্যা থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক। তন্ত্রমতে মানুষের শরীরে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি অনেক নাড়ী বর্তমান, এবং সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গে ছয়টি চক্র যুক্ত আছে। সর্বনিম্ন চক্রে বা মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনীশক্তি বিদ্যমান। যোগ ও সাধনার বলে যখন ঐ শক্তি উর্ধ্বতমচক্রে বা সহস্রদল পদ্মে পৌঁছয়, তখনই জীবের মুক্তি লাভ হয়। শরীর ব্যবচ্ছেদের দ্বারা ঈড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়ী, ষড়চক্র বা কুণ্ডলিনীশক্তি কিছুরই অস্তিত্ব নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু যোগীরা বলেন এটা তাঁদের উপলব্ধিভূত সত্য। স্বামী বিবেকানন্দের মতো মনীষীও এসবের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন। তন্ত্রোক্ত সাধনা অদ্বৈত-বাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর পিছনে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবধারা প্রবাহিত এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকলেও এবং এ পথে অনেকেই ধর্মজীবনের উন্নত সোপানে আরোহণ করেছেন—এমন উক্তি সত্য হলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা সমাজে অশেষ অকল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করেছে, ফলে ধর্মের নামে, এমন কি এখনও অনেক কুৎসিত জিনিস চলছে।

তন্ত্র কোন সময়ে রচিত তা নিশ্চিত বলা যায় না। নেপালে অনেক তন্ত্রের সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। কাজেই মনে হয় অনেক তন্ত্র ঐ সময়ের পূর্বে রচিত, কিন্তু কত পূর্বে তা নির্ণীত হয়নি।

আর এক প্রকারের ধর্মশাস্ত্রের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি স্মৃতিশাস্ত্রের কথা বলছি। শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ ও ব্যাকরণ বেদাঙ্গের ছয় ভাগ। বেদাঙ্গ বেদবিদ্যা আয়ত্বের সহায়ক স্বরূপ কিন্তু শ্রুতি পর্য্যায়ভুক্ত নয়। বৈদিকসংহিতার মন্ত্রসমূহ পাঠের উচ্চারণ-বিধি ও আবৃত্তি করতে কোথায় কি ভাবে শব্দ বিভাগ করতে হবে ইত্যাদি যে সমস্ত গ্রন্থে আছে তাদের শিক্ষা বলে। নিরুক্ত বলতে বর্তমানে যাস্ক প্রণীত গ্রন্থ ছাড়া আর কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব নেই। এই গ্রন্থে বৈদিক শব্দ প্রকরণ, অনেক শব্দার্থ, এবং ব্যাকরণের অনেক বিষয় আছে। মোটকথা

বেদ বুঝবার জন্য এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থকে একপ্রকার বৈদিকভাষ্যও বলা যেতে পারে। কল্পসূত্র তিনভাগে বিভক্ত—শ্রৌত, গৃহ্য ও ধর্মসূত্র। শ্রৌতসূত্রে যাগযজ্ঞাদির বিষয় ও গৃহ্যসূত্রে জাতকর্ম থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হিন্দুর সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। শুল্বসূত্র বা হিন্দু জ্যামিতি শ্রৌতসূত্রের অন্তর্গত—যাগযজ্ঞের বেদী ইত্যাদি নির্মাণের জন্য জ্যামিতির চর্চা করতে হয়েছিল। বিজ্ঞানের অধ্যায়ে হিন্দু জ্যামিতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। গৃহ্যসূত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট—বলতে গেলে গৃহ্যসূত্রেরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ ধর্মসূত্র। গৌতমের ধর্মসূত্রই প্রাচীনতম বলে খ্যাত। ধর্মসূত্রের উপর ভিত্তি করেই মানবধর্মশাস্ত্র বা মনুস্মৃতি প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয়েছে। হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থা অনেকাংশে স্মৃতি নিয়ন্ত্রিত। মনুস্মৃতি ব্যতীত যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর স্মৃতিও রয়েছে, কিন্তু মনুস্মৃতিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মনু প্রতিমাপূজার বিরোধী, যাগযজ্ঞের উপরই জোর দিয়েছেন। মনু দেবমন্দিরের পুরোহিতদের তাচ্ছিল্য সহকারে মদ্য ও মাংস বিক্রেতা এবং সুদখোরের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন। মনু পণপ্রথা ও বিধবা বিবাহের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মনুর সময় বিধবা বিবাহ যে প্রচলিত ছিল, সে কথা মনুতেই পাওয়া যায়। অবশ্য যাদের পতি সহবাস হয়নি সেইরকম বিধবার বিবাহের অনুমতি মনু দিয়েছেন। মনু স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন এবং তিনি মেয়েদের উপর ঘোর অবিচার করেছেন। 'পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥' —বাল্যকালে পিতা, যৌবনে স্বামী, এবং বৃদ্ধ বয়সে ছেলেরা স্ত্রীলোককে রক্ষা করবে, স্ত্রীলোক কখনই স্বাধীনতার যোগ্য নয়—এই মনুর বিধান।

মনু এমন কি মেয়েদের অত্যন্ত কুৎসিতভাবে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেন-নি। শ্লীলতা ও ভদ্রতার সীমা রক্ষা করে সে সব শ্লোক উদ্ধৃত করা যায় না, তাই তা থেকে বিরত হলাম। মনুর সময়ে জন্মগত জাতিভেদ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মনু শূদ্রদের উপর যেভাবে অপমানের বোঝা চাপিয়েছেন, তা স্ত্রী-জাতির উপর ঘোর অবিচারের মতোই দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের অন্যায় ভাবে নিন্দা বা অপযশ কীর্তন করে তবে তার দণ্ড হচ্ছে জিভ কেটে ফেলা, আর সেই অপরাধের জন্য ব্রাহ্মণের মোট ১২ পণ অর্থদণ্ড। এমন কি টাকা ধার করলে শূদ্রের জন্য সুদের হারও বেশি। মনু চার বর্ণের বাইরে পঞ্চম

বর্ণ সৃষ্টি করেছেন—তাদের তিনি বর্ণশঙ্কর আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু যে ভাবে তিনি বর্ণশঙ্করদের উৎপত্তি বর্ণনা করেছেন, তা সমস্ত বিচারবুদ্ধিকে গঙ্গার জলে বিসর্জন না দিলে বুঝে ওঠা যায় না। যথা শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতা হতে চণ্ডালের উৎপত্তি। তিনি যাদের চণ্ডাল বলে অভিহিত করেছেন তাদের সংখ্যা বহুদিন যাবতই ব্রাহ্মণের চেয়ে বেশি, অথচ প্রথমে তাদের অস্তিত্বই ছিল না। মনুর মতে শূদ্র ও ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ সমাজে ভালো বলে বিবেচিত হত না। কাজেই সেরকম বিবাহ কি ভাবে এত সংঘটিত হয়ে এত বর্ণশঙ্কর সৃষ্টি হল, তা কিছুতেই ভেবে ওঠা যায় না। মনু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন না—আমি একথা বলছি না, তবে ধর্মের নামে অনেক তথাকথিত ধার্মিক যে রকম সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের পরিচয় দেন তিনিও সেই রূপ দিয়েছেন। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে মনুর ব্যবস্থা অপরিবর্তনীয় বিধির মধ্যে গণ্য নয়। তাঁর সমস্ত বিধি পরিবর্তন করেও, হিন্দু নিষ্ঠাবান হিন্দু বলে গণ্য হতে পারেন। মনুতে আছে, 'যথাযোগ্য ভাবে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে যদি কোনো ব্রাহ্মণ মাংস না খায় তবে সে একবিংশতিবার পশুজন্ম গ্রহণ করবে।' বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই মনুর এ ব্যবস্থাকে অপব্যবস্থা বলেই গ্রহণ করেন। মনু প্রতিমাপূজার বিরোধী হলেও বর্তমানে অধিকাংশ হিন্দুই প্রতিমাপূজক। মনুস্মৃতি খুব সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত।

বৈদিক ধর্ম প্রথম অবস্থায়, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ যুগে, যাগযজ্ঞাদিরূপ কর্মপ্রধান, উপনিষদের যুগে জ্ঞানপ্রধান, ও পৌরাণিক যুগে ভক্তিপ্রধান ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্যের পরে ধর্মমতসমূহকে শুধু কর্ম, জ্ঞান বা ভক্তির মাপকাঠিতে বিচার না করে এভাবেও দেখবার অভ্যাস হল যে—এ অদ্বৈতবাদ, এ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং ইনি দ্বৈতবাদী।

ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক যুগে বুদ্ধ ও শঙ্করের মতো প্রতিভাবান ব্যক্তি আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি—একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। শঙ্করাচার্য (৭৮৮-৮২০ খৃষ্টাব্দ) একজন মালাবার ব্রাহ্মণ। তিনি খুব অল্প বয়সে —মাত্র ১০ বৎসর বয়সে—গোবিন্দাচার্যের কাছে দীক্ষা লাভ করেন। পরে তৎকালীন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত করে, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদের (বৌদ্ধ পণ্ডিতদেরও) তর্কে পরাস্ত করে স্বীয় অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্বৈতবাদ যদিও উপনিষদ প্রতিপাদ্য মত তবু ঐতিহাসিক যুগে এই

প্রতিষ্ঠার ভিত্তিস্থাপন করেন আচার্য গৌড়পাদ—তাঁর মাণ্ডুক্যোপনিষদের কারিকায়। গৌড়পাদ গোবিন্দের গুরু। উড্রুফের মতে গৌড়পাদ বাঙালী ছিলেন। গৌড়পাদ যে ভিত্তি স্থাপন করেন, শঙ্কর তার উপর সুরম্য হর্ম্য নির্মাণ করেছেন। সেই বিরাট সৌধ তাজমহলের মতো মহিমাময় ও শুভ্র, আজ প্রত্যেক ভারতবাসী নত মস্তকে তার সামনে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে। শঙ্কর তাঁর উপনিষদ, বেদান্ত ও গীতাভাষ্যে অলোকসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। শঙ্করের মতো প্রতিভা সকল যুগে সকল দেশে সকল জাতির মুখই উজ্জ্বল করে। কারো নাম না করে বেদান্তভাষ্যের উল্লেখ করলে শঙ্করকৃত বেদান্তভাষ্যই বোঝায়। শঙ্করের আগেও বেদান্তভাষ্য রচিত হয়েছিল, কিন্তু শঙ্করভাষ্য রচিত হওয়ার পর অন্য সকল ভাষ্যেরই আদর চলে যায়, এবং কালক্রমে তারা নির্লুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

শঙ্করের মতে ব্রহ্ম অনন্ত, অসীম, নির্গুণ ও নির্বিশেষ, এক ও অদ্বিতীয় এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। ব্রহ্মই সমস্ত জীব জগৎ এবং জীব জগতের অতীত। জীব ও ব্রহ্মে যে ভেদ বোধ হয় তা অজ্ঞানতাবশত। শঙ্কব একে মায়া নাম দিয়েছেন। এই মতবাদই অদ্বৈতবাদ।

রামানুজাচার্য বিশিষ্ট দ্বৈতবাদী। তাঁব মতে ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, কিন্তু জীব ও ব্রহ্ম সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নয়। জীব ব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত, ব্রহ্মের অংশ মাত্র, দৃশ্যমান জগৎও ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন, ব্রহ্মশক্তির পরিণাম। জীব ও জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক। জীব ব্রহ্মের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। অতএব ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ও জীব অল্পশক্তি এবং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন নয়। শুধু ভিন্ন নয়, চিরকালই ভিন্ন থাকবে। ভগবদ্ভক্তির দ্বারা জীবের মুক্তি, এবং মুক্তাবস্থায় জীব ব্রহ্মের সান্নিধ্য লাভ করে পরমানন্দ উপভোগ করবে—তখনও উভয়ে ভিন্নই থাকবে।

মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী। তাঁর মতে জীব ব্রহ্মের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে পৃথক। ভগবান স্বতন্ত্র বা স্বাধীন আর জীব তাঁর অধীন। জীব ভগবানের অংশ নয়, তাঁর দাস। জীব ভগবান থেকে চিরকাল পৃথক থাকবে। জীবের কর্তব্য থাকবে। জীবের কর্তব্য চিরকাল ভগবানের সেবা করা। এই সেবাতেই তার মুক্তি।

২ ধর্ম সম্প্রদায়

বৈষ্ণব—বিষ্ণু, নারায়ণ, হরি, বাসুদেব-কৃষ্ণ, রাম বা লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ, সীতারাম প্রভৃতির উপাসকগণই বৈষ্ণব নামে খ্যাত। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, কিন্তু ঋগ্বেদে বিষ্ণুর স্থান ইন্দ্রের নিচে, বৈষ্ণবের কাছে বিষ্ণু দেবাদিদেব ভগবান। যদিও শতপথ ব্রাহ্মণে বিষ্ণু দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছেন, তথাপি তখনও পরমপদ লাভ করেননি। বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীনকালে ভাগবতধর্ম বলে খ্যাত ও বাসুদেব-ভক্তিমূলক ছিল। বৈষ্ণব শব্দটি আমরা প্রথম পাই মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে। 'অষ্টাদশ পুরাণানাম্ শ্রবণাৎ যৎ ফলম্ ভবেৎ। তৎ ফলম্ সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ॥'—অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল লাভ হয় বৈষ্ণব সেই ফল লাভ করবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এই শ্লোক অষ্টাদশ পুরাণ রচিত হওয়ার পর মহাভারতে স্থান পেয়েছে, অতএব এ খুব প্রাচীন নয়। পূর্বে বলেছি পাণিনি বাসুদেব ভক্তিতত্ত্বের কথা অবগত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে ভাগবতধর্মের উল্লেখ আছে। 'তাই ইহা নির্বিবাদে প্রকাশ পাইতেছে যে জ্ঞানমূলক উপনিষদের পর এবং বুদ্ধের পূর্বে বাসুদেব ভক্তিমূলক ভাগবতধর্ম বাহির হইয়াছে' (তিলক)।

ডাক্তার বিউহ্লারের মতে জৈনধর্মের আবির্ভাবের অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে নারায়ণ ও দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উপাসনামূলক ভাগবতধর্ম বর্তমান ছিল। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে আছে, 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—এই দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র জপ করলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। অতএব বৌধায়নের পূর্বে বাসুদেব-পূজা সর্বজনমান্য হয়েছিল। কালে-র মতে বৌধায়নের কাল খৃষ্টপূর্ব অষ্টম বা সপ্তম শতাব্দী, আর তিলকের মতে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী। মৈত্র্যুপনিষদে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে রুদ্র, বিষ্ণু, অচ্যুত, নারায়ণ—ইহারা ব্রহ্মই। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে রুদ্রের কিম্বা বিষ্ণুর কোনো না কোনো স্বরূপের উপাসনা ভাগবতধর্ম বাহির হইবার পূর্বেই শুরু হইয়াছিল' (তিলক)। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে উপনিষদের সঙ্গে যে চিন্তাস্রোত প্রবাহ আরম্ভ হয় এবং অবশেষে যা বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মে পরিসমাপ্তি লাভ করে সেই প্রবাহ থেকেই বাসুদেব-কৃষ্ণ উপাসনার আরম্ভ।

বাসুদেব-ধর্ম সম্বন্ধীয় শিলালিপি ও গ্রীকদের মধ্যে ভাগবতধর্মের প্রসারের কথা পূর্বেই বলেছি। মেগাস্থিনিস্ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মথুরার নিকটবর্তী স্থানসমূহে বাসুদেব-ভক্তদের কথা উল্লেখ করেছেন। মোট কথা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর ভাবতে ভাগবতধর্ম বেশ প্রসার লাভ করেছিল। গুপ্তরাজারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন এবং তাঁরা পরম ভাগবত বলে পরিচিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে ভাগবতধর্ম সমস্ত ভাবতবর্ষে বিস্তার লাভ কবে।

দক্ষিণ ভারতে তামিলদের মধ্যে বৈষ্ণবধম খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে তামিল ভক্তদেব উল্লেখ বয়েছে। তামিলদেশে বৈষ্ণবধর্ম বিস্তারের মূলে তামিল আলোয়াররা। আলোয়ার সম্বন্ধে সাহিত্যের অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছি। বামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকবের মতে প্রাচীনতম আলোয়ার-দের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীব কাছাকাছি। আলোয়ার-দের পব দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবাচার্যদের আবির্ভাব। নাথ মুনির নাম আগে উল্লেখ করেছি। তিনি ব্যতীত আরও দুই জন প্রসিদ্ধ আচার্য ছিলেন—যমুনাচার্য ও রামানুজাচায। শঙ্করেব প্রভাবে আসমুদ্রহিমাচল প্রভাবান্বিত হয়েছিল, তাঁব হাত থেকে বৈষ্ণবধর্মকে রক্ষা করাব জন্য এই আচার্যরা অশেষ চেষ্টা করেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকাম হন। যমুনাচার্যের স্তোত্র হৃদয়-মন-মুগ্ধকর। উদাহরণ স্বরূপ দু-একটি বলছি :

'ন ধর্মনিষ্ঠোঽস্মি ন চাত্মবেদী
ন ভক্তিমাংস্তচ্চরণারবিন্দে।
অকিঞ্চন অনন্যোগতি শরণ্যং
ত্বৎপাদ মূলম্ শরণং প্রপদ্যে ॥'

আমি ধর্মনিষ্ঠ বা আত্মজ্ঞ নই, তোমার চরণ পদ্মেও আমার ভক্তি নেই, আমার অন্য কোনো গতি বা আশ্রয় নেই, তোমার পাদমূলেই আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।

'তবামৃতস্যন্দিনী পাদপঙ্কজে
নিবেশিতাত্মা কথমন্যদিচ্ছতি।

স্থিতেঽরবিন্দে মকরন্দ নির্ভরে
মধুব্রত ন ক্ষুরকং হি বিক্ষতে ॥'

তোমার অমৃতসম পাদপদ্মে যার মন স্থান পেয়েছে সে কি করে অন্য জিনিস আকাঙ্ক্ষা করবে! পদ্মের মধুপায়ী ভ্রমর কখনও তিল ফুলের দিকে তাকায় না।

'কৃপয়ৈব মনন্য ভোগ্যতাং
ভগবন্ ভক্তিময়ি প্রযচ্ছমে ॥'

হে ভগবন্! কৃপা করে আমাকে এমন ভক্তি দাও যেন আমি আর কিছু ভোগের আকাঙ্ক্ষা না করি।

যমুনাচার্যের পর রামানুজ তাঁর স্থান অধিকার করেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে যমুনাচার্য বামানুজকে বৈষ্ণব মতানুযায়ী বেদান্তভাষ্য লিখতে বলে যান। রামানুজ যে ভাষ্য লেখেন তা শ্রীভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। আগেই বলেছি রামানুজ (খৃষ্টীয় ১০১৬-১১৩৭) বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন, তাঁর গুরু যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু রামানুজ অদ্বৈতবাদে মনের তৃপ্তি না পেয়ে মতের পরিবর্তন করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শিরোমণি তা শ্রীসম্প্রদায় নামে পরিচিত। শ্রীসম্প্রদায়ে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যের দীক্ষাগুরু হবার অধিকার নেই কিন্তু শিষ্য সকলেই হতে পারেন। এই সম্পর্কে একথা না বললে তামিল বৈষ্ণবদের প্রতি অবিচার করা হয় যে তিরুপ্পন-আলোয়ার অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। আলোয়াররা দাক্ষিণাত্যের সব বৈষ্ণবের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র।

তিরুপ্পন-আলোয়ার সম্বন্ধে গল্প প্রচলিত আছে যে তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে তাঁকে শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না।

একদিন রঙ্গনাথ লোকসরঙ্গ নামে এক সাধুর উপর তিরুপ্পন-আলোয়ারকে কাঁধে করে তাঁর মন্দিরে নিয়ে আসার হুকুম দেন। এই থেকেই উপরোক্ত আলোয়ার 'মুনিবাহন' নামে খ্যাত।

রামানুজ গোপীলীলা বা রাধার কথা কিছুই বলেননি। তিনি উপাস্য দেবতা হিসেবে নারায়ণ নামের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন।

রামানুজের পরেই দাক্ষিণাত্যে আর একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্যের আবির্ভাব হয়—তাঁর নাম মধ্বাচার্য (খৃষ্টাব্দ ১১৯৭-১২৭৬) বা আনন্দতীর্থ। মধ্বাচার্য দ্বৈতবাদী ছিলেন। ইনিও গোপীলীলা বা রাধার উল্লেখ করেননি। তিনি বাসুদেব বা কৃষ্ণ আরাধনার উপর জোর না দিয়ে বিষ্ণু আরাধনার উপর জোর দিয়েছেন। মধ্বের মতাবলম্বী সম্প্রদায় মাধ্ব-সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

দাক্ষিণাত্যের দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই গোপীলীলা বা রাধার কথা নেই। কিন্তু উত্তর ভারতে নিম্বার্ক (দ্বাদশ শতাব্দী) ও চৈতন্যের যে দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলা প্রধান স্থান অধিকার করেছে। নিম্বার্ক যদিও অন্ধ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ তবু তিনি বৃন্দাবনেই বাস করতেন। তাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের নাম 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ'। বাঙলাদেশেও তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব আছেন। তিনি রাধাকৃষ্ণ-লীলার উপরেই সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। বাঙলায় চৈতন্যের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি। এমন কি অনেকে এ কথাও বলেন: 'শ্রীচৈতন্যের বাঙলা'। চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩) বাঙলাকে প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এই বইয়ে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হবে, কাজেই শুধু চৈতন্যের নাম মাত্র উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

উত্তর ভারতে বৈষ্ণবদের মধ্যে রাম-উপাসকের সংখ্যাই বর্তমানে বেশি। তুলসীদাসের রাম-চরিত-মানসের প্রভাব বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশে যে কোনো ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বেশি। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে রাম বিষ্ণুর অবতার এ বিশ্বাস খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রচলিত ছিল। বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্র অবতার নন—নরচন্দ্রমা, একথা আগে বলেছি। কিন্তু কালিদাসের রঘুবংশে রামচন্দ্র অবতার। মহাভারতের শান্তিপর্বে রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার বলে উল্লেখ আছে। ঠিক কোন সময় থেকে রামের পূজা আরম্ভ হয় একথা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত। মধ্বাচার্য বদরিকাশ্রম থেকে রামের মূর্তি নিয়ে আসেন, কাজেই মনে হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর অনেক আগে রামের পূজা আরম্ভ হয়েছে। রামানন্দ, তুলসীদাস প্রভৃতি রামভক্তচূড়ামণিরা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নন, কারণ তাঁদের সকলেরই আবির্ভাবকাল দ্বাদশ শতাব্দীর পর।

শৈব—রুদ্র বৈদিক দেবতা কিন্তু বেদে তাঁর স্থানও ইন্দ্রের নিচে। রুদ্র প্রাচীনকালে ধ্বংস ও অকল্যাণের দেবতা বলেই খ্যাত ছিলেন। ঋগ্বেদে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রার্থনা রয়েছে। যজুর্বেদের বিখ্যাত শত রুদ্রীয়ে রুদ্রের অমঙ্গলের দিক বাদে একটা মঙ্গলের বা কল্যাণের দিকও পরিস্ফুট। তাঁর রুদ্রভাব যখন শান্ত হয় তখন তিনি কল্যাণময় হয়ে ওঠেন এবং তখন তিনি শম্ভু, শঙ্কর বা শিব। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিব, উপনিষদের ব্রহ্মের স্থান অধিকার করেন। সেখানে তিনি সকল জীবের অন্তর্যামী সকলেব স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা, অনাদি, অপরিবর্তনীয় এবং ভাব বা শ্রদ্ধাভক্তি দিয়ে তাঁকে জানতে পারা যায়। রামকৃষ্ণ ভাণ্ডাবকরেব মতে ভক্তিমূলক উপাসনা হিসেবে শিবের উপাসনা বাসুদেব-উপাসনার চেয়ে প্রাচীনতর, কিন্তু বাসুদেব ভগবান হয়েও মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়ে, তাদের সঙ্গে বসবাস করে তাদের সুখদুঃখের ভাগী হওয়ার জন্য অধিকতর জনপ্রিয় হযে ওঠেন। অসাম্প্রদায়িক গৃহ্যসূত্র সমূহে শিবের উপাসনার কথা আছে বলে ভাণ্ডারকব মনে করেন শিব প্রথমে সাম্প্রদায়িক দেবতা ছিলেন না। বৌধায়নের গৃহ্যসূত্রে বাসুদেব আরাধনার কথা আছে। অতএব ভাণ্ডারকবের যুক্তি অনুসারে বাসুদেব উপাসনাও সাম্প্রদায়িক ছিল না। আগেই বলেছি পতঞ্জলি শৈব সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করেছেন—তাদের শৈব-ভগবত বলা হত। পতঞ্জলি শিবমূর্তি বিক্রির কথাও বলেছেন। কুশান সম্রাট বিমকডফিসেস শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁর মুদ্রার একদিকে ত্রিশূলধারী শিবমূর্তি রয়েছে। একজন বিদেশী সম্রাট কর্তৃক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে শৈবধর্ম গ্রহণ ও খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শিবমূর্তি বিক্রি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীরও অনেক আগে শিবের মূর্তি-পূজা ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে শিবের মূর্তি-পূজার চেয়ে লিঙ্গ-পূজাই সমধিক প্রচলিত হয়। ঋগ্বেদে শিশ্ন পূজকদের নিন্দা রয়েছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন আর্যরা অনার্যদের কাছ থেকে লিঙ্গ-পূজা গ্রহণ করেছে। কিন্তু লিঙ্গ-পূজা ও শিশ্ন-পূজা এক নয়। লিঙ্গ চিহ্ন বা প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলেই মনে হয়। শালগ্রাম শিলা যেমন নারায়ণের প্রতীক তেমনি পাথরের খর্বাকৃতি দণ্ডও শিবের প্রতীক। কেদারনাথে দেখেছি একখণ্ড পাথরকে শিবের প্রতীক স্বরূপ স্থাপন করা হয়েছে।

দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্মের প্রভাব খুব বেশি। 'তামিলদের মধ্যে অধিকাংশই শৈব' (এস. শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার)। দাক্ষিণাত্যের শৈবরা শাস্ত্রিক কর্মের উপর বেশি জোর না দিয়ে একান্ত শিবভক্তিকে তাদের ধর্মের ভিত্তি করেছে এবং জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছে। দাক্ষিণাত্যের নাযানার বা শৈব মহাপুরুষদের রচিত ভক্তিরসে ভরপুর স্তোত্রাবলীর কথা সাহিত্যের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

শিব উপাসকদেব মধ্যে পাঁচটি সম্প্রদায় আছে—পাশুপত, শৈব, কাপালিক, কালামুখ ও লিঙ্গায়েৎ। পাশুপত সম্প্রদায় খুব সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা লকুলিন বা লগুড়ধাবী। ইউয়ান চোয়াং সপ্তম শতাব্দীতে এমন কি বেলুচিস্থানে পর্যন্ত অনেক পাশুপত দেখেছিলেন। পাশুপতরা গায়ে ভস্ম মাখেন এবং অনেক ঘৃণিত কাজ কবেন যেন তাঁদের কোনো হিতাহিত বা ভালোমন্দ জ্ঞান নেই, কিন্তু তাঁরা বেশ উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্বকে এ সবের ভিত্তি বলে ধবেন। শৈব সম্প্রদায় বেশ বিচারবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত বলে মনে হয়। তাঁরা সান্ধ্য উপাসনা, জপ, ধ্যানধারণা, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও প্রায়শ্চিত্তাদির উপর জোর দেন। কাপালিক ও কালামুখ সম্প্রদায়ের অনেক আচরণ নিতান্ত কুৎসিত। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটকের কাপালিকের চরিত্রের বর্ণনা আগেই দিয়েছি। তা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় ধর্মের নামে কিরকম বীভৎস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হত।

সম্প্রদায় হিসেবে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি কখন তা স্থির করে বলা যায় না। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের কালাচুরী রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী বাসব এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হতে পারেন, অথবা হয়তো পূর্বেই এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, তিনি বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করে একে শক্তিশালী ও ক্ষমতাপন্ন করে তুলেছিলেন। এই সম্প্রদায় ভক্তি, সত্য, নৈতিক পবিত্রতা, ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর খুব জোর দেন। তাঁরা যজ্ঞোপবীতের বদলে রেশমের সুতা বা কাপড় দিয়ে লিঙ্গ প্রতীক গলায় ঝোলান, এবং গায়ত্রী মন্ত্রের বদলে শৈব মন্ত্র ব্যবহার করেন। এঁরা ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী। শঙ্কর ও রামানুজের প্রভাব এঁদের দার্শনিক মতবাদে সুস্পষ্ট। বর্তমান বোম্বে প্রেসিডেন্সির কর্ণাটক প্রদেশে লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায় বেশ ক্ষমতাসম্পন্ন।

শাক্ত—কোনো বৈদিক ধর্মগ্রন্থে একাধিপত্যসম্পন্ন কোনো মহিলা দেবতার নাম নেই। মুণ্ডোকোপনিষদে কালী, করালী, প্রভৃতি অগ্নির সপ্ত জিহ্বা। শতপথ ব্রাহ্মণে অম্বিকা রুদ্রের ভগিনী। কেণোপনিষদে যক্ষরূপী ব্রহ্মা দেবদর্প চূর্ণ করার পর উমা ইন্দ্রের কাছে সেই যক্ষের বা ব্রহ্মার স্বরূপ বর্ণনা করেন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গার স্তব করতে বলেন এবং অর্জন সেরূপ করেন। একথা মহাভারতের বাংলা সংস্করণে আছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্য সংস্করণে নেই। কাজেই মনে হয় এই স্তবটি প্রক্ষিপ্ত। পরবর্তীকালে বাঙালীদের কৃপায় মহাভারতে দুর্গা-স্তব স্থান পেয়েছে। দুর্গা-পূজা যে বাঙালীর সৃষ্টি এটা সুবিদিত। অতএব এরকম হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

শক্তি উপাসনা তন্ত্রের বিশেষত্ব। বাঙালাদেশেই শাক্তদের প্রধান স্থান। আজও রাওলপিণ্ডি থেকে আরম্ভ করে যেখানেই কয়েকজন প্রভাবশালী বাঙালী বাস করে, প্রায় সেখানেই কালী মন্দির দেখতে পাওয়া যায়।

গাণপত্য—গণেশ প্রাচীনকালে রুদ্রের মতো অকল্যাণের দেবতা ছিলেন। বর্তমানে মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজা প্রচলিত। ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে মহারাষ্ট্রে গণপতি পূজার প্রচলন হয়। কিন্তু কখন কিরকম ভাবে যে এই দেবতার হাতিমুখ হল তা বলা যায় না। এলোরার গুহা মন্দিরের গণপতি মূর্তির হাতিমুখ। ভবভূতির মালতীমাধব নামক নাটকেও গণপতি মূতির হাতিমুখ। গণপতি জ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু ঋগ্বেদে জ্ঞানের দেবতা বৃহস্পতিকে গণপতি বলেছে। সেই থেকেই গণপতি (গণেশ) সম্বন্ধেও ঐ ধারণা চলে আসছে। বাঙলাদেশে সমস্ত পূজার প্রথমেই গণেশের পূজা করতে হয়। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে গণেশ পূজা পুরাণের সৃষ্টি।

বৌদ্ধধর্ম—বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ভারতবর্ষে বুদ্ধের সময় থেকেই অনেকটা নিশ্চিত ভিত্তির উপরে ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। বিখ্যাত জার্মান পালিভাবাবিদ্ অধ্যাপক গাইগারের মতে বুদ্ধের পরিনির্বাণ বা মৃত্যুর সময় খৃষ্টপূর্ব ৪৮৩। বুদ্ধ ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। কাজেই তিনি খৃষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই মত অধিকাংশ পণ্ডিতের সমর্থন লাভ করেছে। বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার

নাম মহামায়া। শুদ্ধোদন তৎকালীন গণতন্ত্রমূলক শাক্য রাজ্যের নায়ক বা রাজা ছিলেন। শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুর অনতিদূরে লুম্বিনী উত্থানে বুদ্ধের জন্ম হয়। জন্মের সাত দিন পরেই মহামায়ার মৃত্যু ঘটে এবং তাঁর ভগিনী ও শুদ্ধোদনের অপর স্ত্রী মহাপ্রজাপতি বুদ্ধকে লালনপালন করেন। বুদ্ধের জীবিত কালেই কোশল সম্রাট বিরূধক কর্তৃক শাক্যরাজধানী কপিলবস্তু ধ্বংস হয়। ইউয়ান চোয়াং প্রভৃতি চীনদেশীয় পরিব্রাজকরাও কপিলবস্তুকে ধ্বংসস্তূপরূপেই দেখেন। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর গুরু উপগুপ্তের সঙ্গে বৌদ্ধতীর্থ সমূহ পর্যটন করেন এবং তিনি লুম্বিনী উত্থান দর্শন করে যে শিলালিপি রেখে যান তা থেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান নির্দেশ করা সম্ভবপর হয়েছে। কপিলবস্তু বর্তমান বস্তিজেলার উত্তরে নেপাল তরাইয়ের অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধ যশোধরা বা গোপা নাম্নী এক সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ২৯ বৎসর বয়সে জরা মৃত্যু ব্যাধির হাত থেকে জীবের মুক্তিলাভের উপায় বের করার জন্য তিনি বৃদ্ধ পিতা, নবজাত পুত্র, সুন্দরী যুবতী স্ত্রী প্রভৃতিকে ছেড়ে গৃহত্যাগী হন। এই মহাভিনিষ্ক্রমণের পর বুদ্ধ রাজগৃহের নিকটবর্তী পর্বত-গুহায় অরাত মুনি ও উদ্রক নামে দুজন হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে প্রশ্ন করে হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। তারপর তিনি পাঁচজন শিষ্যসহ বর্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটবর্তী উরুবিল্বের জঙ্গলে তপস্যার জন্য যান। সেখানে ছয় বৎসর কাল উপবাস ইত্যাদি দ্বারা নানা প্রকারে শরীরকে নির্যাতন করে একেবারে কঙ্কালসার হলেন। তিনি এত দুর্বল হয়েছিলেন যে একদিন হাঁটবার সময় দুর্বলতাবশত অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, শিষ্যরা তাঁকে মৃত বলেই সাব্যস্ত করে। পরে চৈতন্যলাভ করে, এই পথে সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নয় ভেবে রীতিমতো আহার আরম্ভ করলেন। শিষ্যরা আহার করা বুদ্ধের দুর্বলতা মনে করে, তাঁকে ছেড়ে চলে যায়।

এর অল্পকাল পরে বুদ্ধ নৈরঞ্জনা নদীর তীরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চললেন। সুজাতা নাম্নী একটি মহিলার কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এক বট গাছ তলায় বসে আহার করে, সেই গাছতলাতেই সারাদিন নানা সন্দেহ, নানা চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটালেন। অবশেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাঁর হৃদয় মন জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এবং তিনি যে জিনিস খুঁজছিলেন

তা লাভ করলেন। যে গাছের নিচে বসে তিনি এই জ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ করেন সেটি বোধিদ্রুম নামে এবং ঐ স্থানটি বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত। পরবর্তী-কালে এখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্মিত হয়।

বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি প্রথম অরাড মুনি ও উদ্রকের অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনো খোঁজ না পেয়ে কাশীর দিকে যান এবং কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের মৃগদাবে প্রথম পূর্বশিষ্য পাঁচজনের কাছেই তাঁর ধর্মমত ব্যক্ত করেন। তাঁর সারনাথের উপদেশের সারমর্ম এই: (১) জন্ম দুঃখের, রোগ বার্ধক্য মৃত্যু দুঃখের। (২) তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। (৩) তৃষ্ণার বা দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে হবে। (৪) দুঃখের নিবৃত্তির আটটি পথ:—(ক) সম্যক বিশ্বাস (সম্মা ডিথি), (খ) সম্যক সঙ্কল্প (সম্মা সঙ্কপ্প), (গ) সম্যক বাক্য (সম্মা বাচা), (ঘ) সম্যক কর্ম (সম্মা কম্মন্ত), (ঙ) সম্যক জীবন যাত্রা (সম্মা আজীব), (চ) সম্যক চেষ্টা (সম্মা বায়াম), (ছ) সম্যক স্মৃতি (সম্মা সতি), ও (জ) সম্যক সমাধি বা ধ্যান (সম্মা সমাধি)। উপরোক্ত আট পন্থা সমন্বিত চার আর্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের সার কথা।

৩৫ বৎসর বয়স থেকে আরম্ভ করে ৮০ বৎসর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ ৪৫ বৎসর বুদ্ধদেব নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। জীবিতকালেই বহু লোক তাঁর শিষ্য শ্রেণীভুক্ত হন। বলতে গেলে ঐতিহাসিক যুগে ধর্মজগতে ভারতবর্ষে বুদ্ধের মতো ব্যক্তিত্ব নিয়ে বোধহয় আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। বুদ্ধের পরেই শঙ্করের স্থান। শুধু ভারতবর্ষে কেন সমস্ত জগতেও বুদ্ধের মতো ব্যক্তিত্ব বিরল। আজও পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্মের বিশাল ছায়াতলে শান্তিলাভ করছে। ৮০ বৎসর বয়সে মল্লদের রাজধানী কুশীনগরের এক শাল বনে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। গোরক্ষপুর জেলার কাশিয়া নামক গ্রামে মথুরার শিল্পী দিয়ের তৈরি পরিনির্বাণ বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। অনেক পণ্ডিতের মতে বর্তমান কাশিয়াই বুদ্ধের মৃত্যুস্থান কুশীনগর। ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই মত সমীচীন মনে করেননি—তাঁর মতে কুশীনগর খুব সম্ভবত নেপাল রাজ্যের মধ্যে, ভবেশ্বরী ঘাটের খুব কাছে, রাপ্তি ও গণ্ডকের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল।

বুদ্ধদেব নিজে তাঁর ধর্মমত লিপিবদ্ধ করে যাননি। তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যরা সমবেত হয়ে তাঁর উপদেশাবলী সংগ্রহ করেন। শিষ্যদের চারটি সভা হয়।

বুদ্ধের মৃত্যুব কয়েক সপ্তাহ পরে রাজগৃহে প্রথম এবং মৃত্যুর একশত বৎসর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় সভা হয়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে পাটলিপুত্রে এবং কনিষ্কেব রাজত্বকালে কাশ্মীবে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সভা হয়। শিষ্যদের কর্তৃক সংগৃহীত বুদ্ধেব উপদেশাবলী ত্রিপিটক নামে খ্যাত। ত্রিপিটক সম্বন্ধে সাহিত্যের অধ্যায়ে বলেছি।

বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন, এটাই প্রচলিত ধারণা। তিনি ভগবান সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক—আছেন বা নেই এ সম্বন্ধে কোনো কথাই বলেননি। কাজেই তিনি আস্তিক্যবাদ প্রচার করেননি, শুধু এ কথাই বলা চলে। তিনি নাস্তিক ছিলেন এমন উক্তি যুক্তিযুক্ত নয়। খুব সম্ভবত নাস্তিক শব্দটি প্রথমে বেদনিন্দুক হিসাবে বুদ্ধের উপর প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরে নাস্তিক বলতে আমরা সাধারণত যে অর্থ বুঝি তাই আবোপ কবা হয়েছে। বুদ্ধ সৎকর্মের উপবেই খুব জোর দেন। তাঁর মতে মানুষ নিজ কর্মবলেই নির্বাণ লাভ করতে পারে। তাঁব নির্দেশিত অষ্ট পন্থা অবলম্বন কবে চললে জীব দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ কবে অর্থাৎ জীবের নির্বাণ প্রাপ্তি হয়। এই নির্বাণ লাভই বুদ্ধের মতে জীবের চরম কাম্য। বৈদান্তিক যাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ, বৈষ্ণব যাকে সাযুজ্য বা সালোক্য মুক্তি, যোগী যাকে কৈবল্য মুক্তি বলেন, বুদ্ধ তাকেই নির্বাণ বলেছেন। মাত্র ভাষার প্রভেদ। সমাধি বলতে যেমন মৃত্যু বোঝায় না, নির্বাণ অর্থ তেমনি মৃত্যু নয়। বুদ্ধ কর্মফল এবং পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। পুনর্জন্মবাদ বুদ্ধের জন্মের পূর্বেই হিন্দুসমাজে এতটা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে বুদ্ধ কোনো প্রকারের বিচার না করেই তা মেনে নিয়েছিলেন। ঋগ্বেদে পুনর্জন্মবাদ নেই, এটি ভিনটারনিট্‌স ও ম্যাক্‌ডোনেলের মত। তবে শতপথ ব্রাহ্মণে নিশ্চিতভাবে পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুনর্জন্মবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধের কর্মবাদের সূচনাও বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখতে পাই। জীব ভবিষ্যতে কোথায় কি ভাবে জন্মগ্রহণ করবে, তা তার নিজ কর্মের উপর নির্ভর করে তা বৃহদারণ্যক উপনিষদে রয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এই কর্মবাদ পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে।

বুদ্ধ একদিকে যেমন ভোগ বিলাসের বিরোধী ছিলেন, অপরদিকে তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করাও তেমন পছন্দ করতেন না। তিনি মধ্যপথাবলম্বী ছিলেন।

গীতায় ভগবানও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'হে অর্জুন, অতি ভোজনকারী, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল বা অতিশয় নিদ্রালু ব্যক্তি যোগী হতে পারেন না'—ভগবান যুক্ত-আহার বিহারের উপরেই জোর দিয়েছেন। গীতার এই মতের সঙ্গে বুদ্ধের মত সম্পূর্ণভাবে এক। বুদ্ধ বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধী ছিলেন। বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে যাগযজ্ঞ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যে যজমানের ভক্তি থাকুক বা না থাকুক নিয়মমতো যজ্ঞ হলেই ফল লাভ হবে, আর অনেকের পক্ষেই যজ্ঞ ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাই বুদ্ধ কর্মমূলক ব্যয়বহুল ভক্তিহীন বিধিমতো যাগযজ্ঞেব বদলে ব্যয়ানপেক্ষ সৎকর্মের কথাই বললেন। যাগযজ্ঞে ভগবদ্ ভক্তির কোনো কথা ছিল না—বুদ্ধের মতবাদেও তা নেই। একদল লোক যাগযজ্ঞকে উত্তম কর্ম মনে করতেন। বুদ্ধও উত্তম কর্ম (সম্মা কম্মন্ত) করতেই বলেছেন। তবে তফাত এই যে তিনি যাগ-যজ্ঞকে উত্তম কর্ম বিবেচনা না করে, বর্তমানে দেশে উত্তম কর্ম সম্বন্ধে যা প্রচলিত ধারণা তাকেই উত্তম বলে বিবেচনা করেছিলেন। এই দুইয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নেই, ববং ব্যয়বহুল যজ্ঞের বদলে ব্যয়ানপেক্ষ সৎকর্মবাদ প্রচার যাগযজ্ঞেরই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি।

বুদ্ধের অষ্ট পন্থাব মধ্যে সম্যক্ ধ্যান (সম্মা সমাধি) অষ্টম পন্থা। মিত্ত, করুণা, মুদিতা, অশুচি ও উপেক্ষা ভাবনা এই পাঁচ প্রকারের ধ্যান সম্যক্ ধ্যানের প্রধান রূপ। এই সমস্ত ভাবনাব অর্থ যথাক্রমে সর্বজীবে মৈত্রী বা প্রেম, জীবের দুঃখে করুণা বা দয়া, অন্যেব আনন্দে আনন্দ, দেহ অপবিত্র এরূপ চিন্তা ও লোকের ভালোবাসা বা ঘৃণা প্রভৃতি সব বিষয়ে ঔদাসীন্য। বুদ্ধেব ধর্ম যে মুখ্যত প্রেমের ধর্ম এ থেকে তা সুস্পষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনের 'মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষানাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্'—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, সুখ, দুঃখ, পুণ্যাপুণ্য প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা চিত্তপ্রসাদ লাভ করে—এই বাক্যের সঙ্গে সম্যক্ ধ্যানের ঐক্য স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ।

মিসেস্ রিজ ডেভিস্ তাঁর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকে জার্মান পণ্ডিত পিসেলের একটি মত উদ্ধৃত করেছেন—'গার্বের ও জ্যাকবির মতো আমারও নিশ্চিত মত যে বুদ্ধ তাঁর দর্শন সাংখ্য ও পতঞ্জলির কাছ থেকে ধার করেছেন।' প্রশ্ন উঠতে পারে, পতঞ্জলি সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক, বুদ্ধ তাঁর কাছ থেকে

ধার করলেন কি করে! বুদ্ধের পূর্বেও যোগ সম্বন্ধে জ্ঞান সুপ্রচলিত ছিল, পতঞ্জলি সে সমস্তকে সূত্রকারে রূপ দিয়েছেন মাত্র। এখানে পতঞ্জলি শব্দটি খুব সম্ভবত যোগশাস্ত্র অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কৌটিল্যের সময় যোগশাস্ত্র শিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল, কাজেই খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই যোগশাস্ত্রের জ্ঞান ভারতবর্ষে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করতে পেরেছিল।

সাংখ্যদর্শনের সঙ্গেও বৌদ্ধধর্মের অনেক সামঞ্জস্য আছে। বৌদ্ধধর্মের গোড়াকার কথা—জন্ম, রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু দুঃখের, এবং এই দুঃখের নিবৃত্তি সাধন করতে হবে। সাংখ্যদর্শনের আরম্ভ দুঃখ থেকে। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকার প্রথম শ্লোকে রয়েছে দুঃখ তিন প্রকারের, তার তাড়নায় দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জানতে ইচ্ছা হয়। বুদ্ধ এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় দিয়েছেন অষ্ট পন্থা অবলম্বন, আর সাংখ্যমতে প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞান সম্যক উপলব্ধি হলেই জীবের মুক্তি। এরকম আরও সৌসাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু এ সব সৌসাদৃশ্য সত্বেও বুদ্ধ যে সাংখ্যের কাছ থেকে ধার করেছেন, এ কথা বলার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। সামঞ্জস্য যেমন রয়েছে তেমনি অসামঞ্জস্যও আছে। বৌদ্ধ-ধর্ম সাংখ্যের মূল প্রকৃতি বা নিষ্ক্রিয় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বুদ্ধ এবং কপিল উভয়েই উপনিষদ থেকে অনেক জিনিস গ্রহণ করেছেন।

বুদ্ধের ধর্ম প্রেমের ধর্ম। বুদ্ধ অহিংসাকে তাঁর ধর্মের মধ্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে অনেকে তাঁর সম্মতিক্রমেই মাংস খেতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত অপরিমিত ভোজন না করে, ততক্ষণ ভিক্ষুরা যে অঞ্চলে বাস করে সেখানকার প্রচলিত খাদ্যই গ্রহণ করতে পারে, আহার সম্বন্ধে এই-ই বুদ্ধের নির্দেশ। বুদ্ধ নিজেও মাংস খেয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের এটাই প্রধান পার্থক্য।

বুদ্ধ প্রথম শুধু পুরুষদের তাঁর সন্ন্যাসী-সঙ্ঘভুক্ত করতেন। বুদ্ধ তাঁর জীবিতকালেই এক সন্ন্যাসী-সঙ্ঘ গঠন করেন। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার উপরেই তিনি বেশি জোর দিতেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ভিক্ষু বলে, এবং ভিক্ষুদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে গুণে বৃদ্ধ তাঁরা থেরা (বৃদ্ধ) নামে খ্যাত। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর বুদ্ধের বিমাতা মহাপ্রজাপতি বুদ্ধের কাছে গিয়ে মহিলাদের তাঁর সঙ্ঘভুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ তাঁকে তিনবার প্রত্যাখ্যান করেন এবং পরে বৈশালী চলে যান। প্রাণের আবেগে

মহাপ্রজাপতি মস্তক মুণ্ডন করে পীতবস্ত্র পরে শাক্যরমণীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের দরজার বাইরে তাঁদের ধূলায় ধূসর স্ফীতপদ ও ক্রন্দমান অবস্থায় দেখে আনন্দের দয়া হল। আনন্দ বুদ্ধের কাছে তাঁদের পক্ষ হয়ে অনুরোধ জানালেন, বুদ্ধ পুনরায় তিনবার অস্বীকার করেন। তখন আনন্দ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহিলারা যদি গৃহত্যাগ করে তথাগতের নির্দিষ্ট পথে সংযম ও নিয়মের সঙ্গে চলেন তবে তাঁরা শ্রেষ্ঠ পদলাভের যোগ্য হতে পারেন কি?' 'পারেন,' প্রত্যুত্তরে বুদ্ধ এই কথা বলাতে আনন্দ পুনরায় তাঁদের সঙ্ঘভুক্ত করতে অনুরোধ করলেন।

আটটি কঠোর নিয়ম পালন করার সর্তে, অত্যন্ত দ্বিধা সহকারে, বুদ্ধ মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্ত করতে রাজী হলেন। কিন্তু এ কাজ বুদ্ধের মনঃপূত হয়নি, তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের সঙ্ঘভুক্ত করা না হলে যদি এই ধর্ম হাজার বৎসর বিশুদ্ধ থাকত, মেয়েরা আসাতে পাঁচশত বৎসর বিশুদ্ধ থাকবে।' ভিক্ষুনীদের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানে গুণে বৃদ্ধা ছিলেন তাঁদের থেরী (বৃদ্ধা) বলা হত। বুদ্ধের সঙ্ঘে কোনো জাতিভেদ ছিল না। পতিতা রমণীরাও তাঁর সঙ্ঘভুক্ত হয়ে থেরী হয়েছেন। বুদ্ধের সন্ন্যাসীসঙ্ঘ গণতন্ত্রমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, সমস্ত কাজই অধিকাংশের মতানুসারে নিষ্পন্ন হত। কিন্তু ভিক্ষুনীদের স্থান ভিক্ষুদের সমান ছিল না। ভিক্ষুনীসঙ্ঘ ভিক্ষুসঙ্ঘের অধীনস্থ ছিল।

অসাধারণ হলেও বুদ্ধ মানুষই ছিলেন, সাধনার বলে তিনি উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে ভক্তদের কৃপায় তাঁকে অতিমানব হতে হয়েছে এবং তাঁর সম্বন্ধে অনেক অপ্রাকৃত গল্প চলে আসছে। কুসংস্কার ও অজ্ঞতা ধর্মের সাথী হয়ে ধর্মকে অপ্রাকৃত অদ্ভুতে পরিণত করে, এ শুধু বৌদ্ধধর্মের নয় প্রায় সকল ধর্মের ভাগ্যেই অল্পাধিক ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীতেও অন্যদিকে সুযুক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা ধর্মের নামে বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে, একেবারে অসম্ভব জিনিস বিশ্বাস করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের অনেক সামঞ্জস্য আছে, এমন কি অনেক পণ্ডিত মনে করেন খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধধর্মেরই নূতন বা সিরিয় সংস্করণ মাত্র। যদিও এ

মত নিশ্চিত ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একথা বলা চলে না, তবে উভয় ধর্মের আশ্চর্য ঐক্য, বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতা এবং খৃষ্টের জন্মের পূর্বে সিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রচার এই সমস্ত বিচার করে খৃষ্টধর্ম যে বৌদ্ধ-ধর্মের কাছে ঋণী একথা বিশ্বাস করতে স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়।

দুই ধর্মেরই মূলগত সত্য এক। বুদ্ধ তৃষ্ণাকে (তন্‌হা) সমস্ত দুঃখের এবং যীশু কুবাসনাকে পাপের মূল কারণ মনে করেন এবং উভয় লোকশিক্ষকই ঐ দুঃখ বা পাপের নিবৃত্তি সাধন তাঁদের ধর্মের সার বাণীরূপে প্রচার করেছেন। 'তুমি তোমার আত্মীয়কে ভালোবাসবে এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে'—বুদ্ধ ও যীশু দুজনই ঐ নীতি পরিবর্তন করে অক্রোধ, দয়া ও প্রেমের ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধের মতো যীশুও শিষ্যদের জগতের সমস্ত লোকের কাছে তাঁর বাণী প্রচার করতে বলেছিলেন। যীশুও বুদ্ধের মতো শিষ্যসমভিব্যাহারে প্রচার করতে যেতেন।

বুদ্ধ যেমন সারনাথের মৃগদাবে প্রারম্ভিক উপদেশ-বাণীতে তাঁর ধর্মমত সংক্ষেপে বিবৃত করেন, যীশুও তেমনি তাঁর গিরিপ্রবচনে খৃষ্টধর্মের সার মর্ম ব্যক্ত করেছেন। বুদ্ধ ও যীশু উভয়েই ধর্মজীবনে মার বা শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ যেমন শাক্যসিংহ নামে প্রসিদ্ধ, যীশুর ভক্তগণও তেমনি তাঁকে ডেভিড নামক রাজবংশের সিংহ বলে অভিহিত করেন। যীশু এক স্বস্তিকধারী সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। ইনি কে তা ঐতিহাসিকরা এখনও স্থির করতে পারেননি তবে প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্ম ভিন্ন অন্য কোনো ধর্মে স্বস্তিকধারী সন্ন্যাসী হওয়ার প্রথা ছিল বলে জানা নেই। তিনি ভারতীয়ও হতে পারেন, বা ভারতীয় ধর্মের প্রভাবে ঐ দেশীয় লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তাও হতে পারে।

বুদ্ধের প্রধান ভক্ত সংখ্যা ১২ জন—যীশুর তাই, তন্মধ্যে আনন্দ জন্‌-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বুদ্ধের শিষ্য দেবদত্ত যীশুশিষ্য জুডার মতো বিশ্বাসঘাতকের আচরণ করেছিল এবং উভয়েরই শোচনীয় পরিণাম হয়' (শ্রয়ডার)।

নটী অম্বপালি যেমন বুদ্ধের পদতলে বসে উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি যীশুর পদতলে বসেও অনেক পতিতার উপদেশ নেওয়ার কথা লিপিবদ্ধ আছে। অম্বপালি একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-ভিক্ষুনী হয়েছিলেন, তাঁকে যীশুর একান্ত অনুরক্ত শিষ্যা মেরি ম্যাগ্‌ডেলেনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

প্রাচীন বৌদ্ধ ও খৃষ্ট সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রার সব নিয়ম প্রায় হুবহু এক ছিল। 'মধ্যযুগে ইউরোপীয় খৃষ্টানদের নরকের ধারণা, বৌদ্ধদের নরকের চিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তফাত এই যে ভারতবর্ষের ধারণায় অনন্ত নরক-বর্ণনা ও ভোগ নেই' (কার্ন)।

বৌদ্ধধর্মে যে সমস্ত গল্প প্রচলিত আছে তার সঙ্গে খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলিরও বেশ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। বুদ্ধ যেমন একখানা পিষ্টক দিয়ে পাঁচশত সন্ন্যাসীকে খাইয়েছিলেন, যীশুও তেমনি পাঁচখানা রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাইয়েছিলেন! কুমারী মেরির গর্ভে ঈশ্বরের অবতারের প্রবেশ এবং বুদ্ধের নিজ ইচ্ছায় জগতের কল্যাণের জন্য মহামায়ার গর্ভে প্রবেশ। বৌদ্ধ ভিক্ষুনী শুভা যেমন প্রেমনিবেদনকারী দুশ্চরিত্র যুবকের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য নিজের সুন্দর চক্ষু দুটি উৎপাটিত করে দিয়েছিলেন, খৃষ্ট সন্ন্যাসিনী লুসি ও ব্রিগ্রিটাও তেমনি নিজেদের চোখ উৎপাটিত করে দিয়েছিলেন।

উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। দুই ধর্মের মধ্যে আশ্চর্য এবং অদ্ভুত সামঞ্জস্য রয়েছে। যীশুর জন্মের দুই শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে সম্রাট অশোকের সময়ে সিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধ প্রচারকরা তথাগতের বাণী প্রচার করেছিলেন। কাজেই যীশুর বৌদ্ধধর্মভাবের দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

বৌদ্ধধর্ম বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে হীনযান ও মহাযান এই দুটি প্রধান শাখা। হীনযান মতাবলম্বীর উদ্দেশ্য নিজের নির্বাণ লাভ, কিন্তু মহাযান মতাবলম্বী নিজের নির্বাণলাভকে খুব বড় জিনিস মনে করেন না, সকল প্রাণীর নির্বাণলাভ তাঁদের উদ্দেশ্য। এই জন্যই তাঁরা নিজেদের মতকে মহাযান বা মহা (শ্রেষ্ঠ) পন্থা বলে অভিহিত করেন এবং অন্য মতকে হীনযান বা হীন পন্থা আখ্যা দিয়েছেন। হীনযান মতে শুধু সন্ন্যাসী-জীবনেই নির্বাণ লাভ সম্ভবপর, কিন্তু মহাযান মতে একদিকে সর্বজীবে প্রেম এবং অপরদিকে পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে বুদ্ধের পূজা দ্বারা গার্হস্থ্য-জীবন-যাপনকারী রাজা, মজুর, ব্যবসাদার, ব্রাহ্মণ ও পরিয়া নিজ নিজ অবস্থায় থেকেই নির্বাণ লাভ করতে পারেন। এই পার্থক্য রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্টদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক সম্প্রদায় ব্যতীত সমস্ত হীনযান মতাবলম্বীদের পুস্তক পালি ভাষায় ও মহাযান সম্প্রদায়ের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লেখা। পালি গ্রন্থেও বুদ্ধ অতিমানুষ, তাঁর স্মারক (দাঁত প্রভৃতি) ভক্তি শ্রদ্ধার বস্তু। হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত লোকোত্তরবাদীদের মতে বুদ্ধ সাধারণ মানুষ নন, লোকোত্তর ব্যক্তি—সমস্ত লোককে সঙ্গ দেওয়ার মানসে কতকটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাযান মতে বুদ্ধ দেবাদিদেব, তাঁর দেহধারণ বা পরিনির্বাণ লীলা মাত্র। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' মহাযান সম্প্রদায়ের প্রধান গ্রন্থ।

মহাযান মত কোন সময়ে উদ্ভূত হয়েছে একথা নিশ্চিতরূপে বলা শক্ত। বৈশালীতে বুদ্ধের শিষ্যদের যে সভা হয়েছিল তাতে মতভেদ হয়ে দুই দলের সৃষ্টি হয়। একদল বৈশালীর সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে নিজেদের ভিন্ন সভা করেন। এই সভায় এক হাজার সন্ন্যাসী একত্র হয়েছিলেন। এঁদের মহাসঙ্ঘীক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মহাসঙ্ঘীকদের মধ্যেও আটপ্রকার ভিন্ন মতবাদ উৎপন্ন হয়। সেই সমস্ত মতই ক্রমে মহাযান মতবাদে পরিণত হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে মহাযান মত রূপ নিয়েছিল বলে মনে হয়। কনিষ্কের সময় (খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) কাশ্মীরে যে সভা হয় সে সময়ে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা সুস্পষ্টরূপে হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

নাগার্জুনকে অনেকে মহাযান মতের প্রতিষ্ঠাতা মনে করেন। তিনি প্রতিষ্ঠাতা কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও তিনি যে মহাযান মতকে বেশ সুনিয়ন্ত্রিত করেছিলেন সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহও নেই। এই নাগার্জুন আর রাসায়নিক নাগার্জুন একই ব্যক্তি কিনা সে কথা ঠিক বলা যায় না।

অধিকাংশ বৌদ্ধই মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রাচীনকালে বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মের আলোক সমস্ত এশিয়া খণ্ডে, এমন কি ইউরোপ আফ্রিকায়ও বিতরণ করেছিলেন। আজও কোটি কোটি লোক তথাগতের ধর্ম অনুসরণ করে। ধর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধরা যে কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার জিনিস। ভারতবর্ষের শিক্ষা, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে বৌদ্ধদের দান অতুলনীয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সমস্ত জগতে এক অতুলনীয় কীর্তি। অজন্তার চিত্রশিল্প জগতের যে কোনো দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু। বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক

জগতের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট। অশোকের মতো সম্রাট আজও পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। অশ্বঘোষ. নাগার্জুন, বসুবন্ধু (পঞ্চম শতাব্দী), দিঙ্‌নাথ (পঞ্চম শতাব্দী), ক্ষেমেন্দ্র (একাদশ শতাব্দী) প্রভৃতি গ্রন্থকার জগতের পণ্ডিত-সমাজে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

মোট কথা ভারতীয় সভ্যতায় বৌদ্ধদের দান অপরিমেয়। কিন্তু ভারতবর্ষে নবম শতাব্দী থেকেই আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা একরকম বিলুপ্ত হয়েছে বললেও চলে। বুদ্ধের সময় হিন্দুধর্মের অবনতি ঘটেছিল, তাই তিনি সংস্কার সাধন করে নিজ মতবাদ প্রচার করেন। পরবর্তী কালে হিন্দু মনীষীরা বুদ্ধধর্মের অনেক জিনিস গ্রহণ করে হিন্দুধর্মের ছায়াতলে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় দেন। বুদ্ধ প্রবর্তিত সংস্কার অনেকটা গ্রহণ করাতে বৌদ্ধদেরও পৃথকভাবে থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যেমন করে আমাদের চোখের সামনে মনীষী রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীরা হিন্দুসমাজভুক্ত হয়ে যাচ্ছেন, বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও বোধহয় ঐ রকমই ঘটেছিল।

আচার্য শঙ্কর বৌদ্ধধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন—এটাই প্রচলিত ধারণা, কিন্তু একথা বোধহয় অনেকে জানেন না যে শঙ্করকেও তৎকালীন গোঁড়া হিন্দুরা 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলতেন। আমাব মনে হয় শঙ্কর তাঁর অসামান্য প্রতিভাবলে তৎকালীন হিন্দুধর্মকে এমন রূপ দিয়েছিলেন যাতে হিন্দুধর্ম থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম পুনরায় মূল হিন্দুধর্মের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে যায়! ভারতবর্ষের বাইরে সেরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে তা হয়নি। কিন্তু প্রত্যেক দেশের বৌদ্ধধর্মেরই একটা নিজস্ব রূপ আছে।

চীনদেশের বৌদ্ধরা কন্‌ফিউসিয়াসের ভাবধারা দ্বারা প্রভাবান্বিত, একথা বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কন্‌ফিউসিয়াস ও বুদ্ধের মতবাদ মিশ্রিত করে গালাই করে ঢেলে যে আকার লাভ করেছে, চীনদেশের বৌদ্ধধর্ম তা-ই।

জৈনধর্ম—বৌদ্ধ ধর্মপুস্তকে গৌতমবুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিগণ্ঠনাতপুত্রের নাম পাওয়া যায়। ইনি বর্ধমান মহাবীর। বন্ধনশূন্য এবং নাত নামক ক্ষত্রিয়বংশের বলে তাঁর নাম নিগণ্ঠনাত পুত্ত। বৈশালীর নিকটবর্তী কণ্ডগ্রামের নাত বংশের ছেলে নায়ক সিদ্ধার্থ মহাবীরের পিতা এবং তৎকালীন বৈশালীর রাজার ভগিনী ত্রিশলা তাঁর মাতা ছিলেন। তিনি জিন বা আত্মজয়ী ছিলেন। তাই

এই ধর্ম জৈনধর্ম নামে প্রসিদ্ধ। মহাবীর জৈনধর্মের প্রবর্তক না হলেও তিনিই এই ধর্মের উন্নতি সাধন করে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেন। জৈন প্রবাদ অনুযায়ী মহাবীরের পূর্বে এই ধর্মের আরও ২৩ জন মহাপুরুষ বা তীর্থঙ্কর ছিলেন, মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কব। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এই ২৩ জনের অস্তিত্ব মেনে নেওয়ার মতো প্রমাণ নেই। তবে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ ও মহাবীরের পূর্ববর্তী পার্শ্ব ঐতিহাসিক ব্যক্তি হতেও পারেন। জৈনমতে মহাবীরের কাল খৃষ্টপূর্ব ৫৯৯-৫২৭। কিন্তু আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকের মতে মহাবীরের কাল খৃষ্টপূর্ব ৫৪০-৪৬৮। পিতামাতার মৃত্যুর পর ৩০ বৎসর বয়সে মহাবীর সন্ন্যাসী হন। দীর্ঘ বারো বৎসর সাধনার পর তিনি কৈবল্য লাভ করেন, তারপর ৩০ বৎসর ধর্ম প্রচারের পব ৭২ বৎসর বয়সে পাটনার অন্তর্গত পাভাতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। বুদ্ধ যে পাভাতে শেষ অন্ন গ্রহণ করেছিলেন সেই স্থান কুশীনগর থেকে এক দিনেব পথ, কানিংহামেব মতে ১২ মাইল দূরে। কাজেই মহাবীরের মৃত্যুস্থান পাভা আর বুদ্ধের পাভা দুইটি বিভিন্ন স্থান।

বৌদ্ধনির্বাণ আর জৈন কৈবল্য একই জিনিস। জৈন মতে যোগ কৈবল্য লাভের উপায় স্বরূপ। যোগের তিন অঙ্গ: (১) জ্ঞান—বাস্তবের স্বরূপ উপলব্ধি, (২) শ্রদ্ধা—জিনদের শিক্ষায় বা উপদেশে বিশ্বাস, (৩) চরিত্র—সমস্ত অপ আচরণ থেকে নিবৃত্তি। চরিত্র বলতে জৈনরা অহিংসা, সুনৃত, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ বোঝেন। জৈনধর্মের ভারকেন্দ্র অহিংসা। অহিংসার মাপকাঠিতে তাঁদের সমস্ত আচরণ বিচার করা হয়। মিথ্যা, চৌর্য, ব্রহ্মচর্যহীনতা ও লোভ হিংসাত্মক, কাজেই পরিত্যজ্য। এই সমস্ত নিয়ম সন্ন্যাসীদের পক্ষে যত কঠোর ভাবে পালন করার বিধি রয়েছে গৃহীদের পক্ষে তেমন নয়। সন্ন্যাসী ও গৃহীদের ব্রতকে যথাক্রমে মহাব্রত ও অনুব্রত বলে। গৃহীর পক্ষে, বা অনুব্রত অনুযায়ী জীবহত্যা না করলেই অহিংসা পালন করা হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে, বা মহাব্রত অনুসারে যে কোনো রকমে যদি কোনো প্রাণীর কোনো রকম বেদনার কারণ স্বরূপ হওয়া যায় তবে অহিংসা ধর্ম পালন করা হয় না, অর্থাৎ প্রাণীমাত্রকে কোনো রকমের বেদনা না দেওয়ার নামই অহিংসা।

বুদ্ধের মতে কৃচ্ছ্রসাধন ধর্মের অঙ্গ নয়, কিন্তু জৈনধর্মে উপবাস ধর্মের প্রধান অঙ্গ, এমন কি উপবাস করতে করতে মৃত্যু বরণ করাও ধর্মকার্য বলে

পরিগণিত। কঠোর ভাবে অহিংসা পালন এবং কৃচ্ছ্রসাধন এই দুটিই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের প্রধান পার্থক্য। কৃষিকার্যে জীবহত্যা করতে হয় বলে কোনো জৈন কৃষিকার্য করে না। বুদ্ধের ন্যায় মহাবীরও গৃহত্যাগের উপর জোর দেন এবং এক সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গড়ে তোলেন।

জৈন ধর্মপুস্তককে সিদ্ধান্ত বা আগম বলা হয়। মূল জৈন মত ১৪ পূর্বে (পূর্বে-প্রাচীন-গ্রন্থে) সন্নিবেশিত ছিল। মহাবীরেব প্রধান শিষ্যদের এই সমস্ত পূর্বের জ্ঞান ছিল বলে কথিত আছে। জৈন প্রবাদ অনুযায়ী মহাবীরের মৃত্যুর প্রায় দুই শত বৎসর পরে সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে বারো বৎসর ব্যাপী এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। সেই দুর্ভিক্ষের সময়ে জৈনসঙ্ঘের প্রধান কর্তা ভদ্রবাহু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ও আরো অনেক জৈনধর্মাবলম্বী সমভিব্যাহারে দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটকে চলে যান। জৈনমতে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন ত্যাগ করে জৈন ভিক্ষু হন এবং দাক্ষিণাত্যে উপবাস করে মারা যান। ভদ্রবাহু দাক্ষিণাত্যে চলে গেলে স্থূলভদ্র মগধের জৈন সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হলেন। ভদ্রবাহুর অনুপস্থিতিকালে জৈনশাস্ত্রের জ্ঞান লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা হওয়ায় স্থূলভদ্র পাটলিপুত্রে জৈনদের এক সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় ১৪ পূর্ব ১২ অঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়। কিন্তু ভদ্রবাহুর অনুগামী জৈনরা যখন পুনরায় মগধে ফিরে এলেন তখন স্থূলভদ্রের ভক্তদের সঙ্গে তাঁদের মতভেদ উপস্থিত হল। মতভেদের প্রধান কারণ এই যে স্থূলভদ্রের ভক্তেরা অর্থাৎ মগধের জৈনরা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করতেন আর ভদ্রবাহুর অনুগামীগণ উলঙ্গ থাকাই জৈনধর্মের প্রধান অঙ্গ মনে করে উলঙ্গ থাকতেন। শ্বেতবস্ত্র পরিধানকারী ও উলঙ্গ বলে এই দুই সম্প্রদায় যথাক্রমে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর নামে পরিচিত।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতে যে ভেদ সৃষ্টি হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে তার ফলে জৈনরা পাকাপাকি ভাবে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। দিগম্বররা পাটলিপুত্রের সভায় স্থিরীকৃত দ্বাদশ অঙ্গের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। এদিকে শ্বেতাম্বরদের এই শাস্ত্রও বিশৃঙ্খল হয়ে নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, তাই খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে দেবর্দ্ধিগণিক্ষমশ্রমণের সভাপতিত্বে গুজরাটের অন্তর্গত বলভি নামক স্থানে শ্বেতাম্বরী জৈনদের এক সভা হয়। এই সভার সময়ে দেখা গেল যে সর্বশেষ দ্বাদশ অঙ্গ একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং কোনো রকমেই উদ্ধার করা সম্ভবপর নয়। এই দ্বিতীয় জৈন সভার ফলে

এগারো অঙ্গই লিপিবদ্ধ হয়। একথা বলাই বাহুল্য যে দিগম্বর সম্প্রদায় দ্বিতীয় সভায় লিপিবদ্ধ এগারো অঙ্গের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। 'তাঁরা বলেন, শুধু ১৪ পূর্বের জ্ঞানই যে প্রাচীনকালে নষ্ট হয়েছে তা নয়, মহাবীরের নির্বাণের ৪৩৬ বৎসর পরে শেষ সম্পূর্ণ-এগারো-অঙ্গবিদ্ মারা যান এবং তাঁর পরের শিক্ষকেরা ক্রমে আরো কম অঙ্গবিদ্ ছিলেন, অবশেষে মহাবীরেব মৃত্যুর ৬৮৩ বৎসর পরে সমস্ত অঙ্গের জ্ঞান লোপ পেয়েছে' (ভিনটারনিট্স)।

পরে মুসলমান সম্রাটদেব রাজত্বকালে দিগম্বর জৈনরা সামান্য কাপড় পরতে বাধ্য হলেও আজ পর্যন্ত জৈনদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় বিদ্যমান। দিগম্বরদের মতে মেয়েরা কৈবল্য লাভের অধিকারী নন, কিন্তু শ্বেতাম্বররা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সমান অধিকারী মনে করেন।

বৌদ্ধধর্মের মতো জৈনধর্মও প্রেমের ধর্ম। জৈনরাও বৌদ্ধদের মতো বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বিরোধী। মহাবীবও বুদ্ধের মতো ভগবান সম্বন্ধে কিছু বলেননি। উভয় মতেই জাতিভেদের স্থান নেই। মহাবীবও প্রাকৃত বা কথ্যভাষায় তাঁর মত প্রচার কবেন এবং জৈন ধর্মপুস্তকসমূহ 'অর্ধমাগধী' নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত। জৈনরা কর্ম ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করেন এবং আত্মার অস্তিত্বও স্বীকার কবেন। দুই ধর্মই হিন্দুব সকল সম্প্রদায়ের মতো নৈতিক পবিত্রতার উপর খুব জোর দিয়েছে।

পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের মতবাদের সঙ্গে বৌদ্ধমতেব সামঞ্জস্য দেখিয়েছি, জৈন মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যও সুস্পষ্ট। পাতঞ্জল দর্শনের সাধন পাদে রয়েছে, 'অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাযমাঃ।' জৈনচারিত্র আর এ সর্বাংশে এক। জৈনদের মনস্থির করবার জন্য যে ধ্যানের বিধি আছে তাতেও মৈত্রী, করুণা, মাধ্যস্থ (অন্যের অপকর্মের প্রতি ঔদাসীন্য), ও প্রমোদের (অন্যের সদগুণের উপর জোর দেওয়ার অভ্যাস) ব্যবস্থা রয়েছে। জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মতো ভারতবর্ষের বাইরে প্রচারিত হয়নি, কিন্তু আনুষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম যেরকম ভারতবর্ষ থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে জৈনধর্ম তা হয়নি। এখনও একদল প্রতিপত্তিশালী ভারতবাসী জৈন সম্প্রদায়-ভুক্ত। বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের পার্থক্য কঠোরভাবে অহিংসাব্রত পালন ও কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যেই বিশেষভাবে বর্তমান একথা আগেই উল্লেখ করেছি।

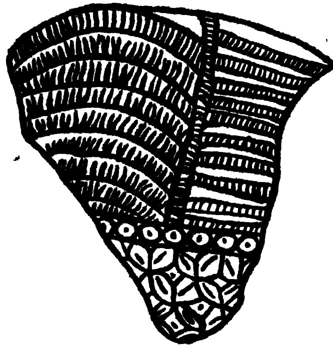
ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে জৈনদের দানও কম নয়। প্রত্যেক জৈনমঠই

এক-একটি শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে বিউহ্লার কাম্বেতে দুটি জৈন মন্দিরে ত্রিশ হাজার পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখেন। ম্যাকডোনেলের মতে, 'তাঁরা সংস্কৃতে ব্যাকরণ, জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় পুস্তক, এমন কি খাঁটি সাহিত্যও রচনা করেছিলেন। তাঁরা দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে, ক্যানারি, তামিল ও তেলেগু সাহিত্য-চর্চায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। কাজেই জৈনরা ভারতীয় সভ্যতা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক মূল্যবান স্থান অধিকার করে আছেন।' চিতোরের জয়স্তম্ভ (৯০০ খৃষ্টাব্দে), আবু পর্বতের, গুজরাটের অন্তর্গত পালিতানার ও গিরনারের জৈন মন্দিরগুলি জৈন-স্থপতি-শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়। কুমারস্বামীর মতে ভারতবর্ষে কাগজের উপর অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মধ্যে জৈন চিত্রশিল্পই প্রাচীনতম। জৈন সাধু হেমচন্দ্রের (১০৮৯-১১৭২ খৃষ্টাব্দ) সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল। তাঁকে জৈনরা কলিকালসর্বজ্ঞ আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি জৈন ধর্মপুস্তকের ভাষ্য ব্যতীত ব্যাকরণ, ছন্দ, তর্কশাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক ও অভিধান রচনা করে গেছেন। উমাস্বাতি বা উমাস্বামিন্ (পঞ্চম বা সপ্তম শতাব্দী), অমিতগতি (একাদশ শতাব্দী), সিদ্ধর্ষি (দশম শতাব্দী), হরিভদ্র (নবম শতাব্দী) প্রভৃতি জৈন পণ্ডিত ভারতবর্ষের গৌরবের পাত্র। হরিভদ্রের ষড়্দর্শন-সমুচ্চয়ের পরিশিষ্টে চার্বাকদর্শন সম্বন্ধেও সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের অহিংসাবাদ পরবর্তীকালে হিন্দুসমাজের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে জৈন ও বৌদ্ধধর্ম থেকেই ভারতবর্ষে অহিংসাবাদের সৃষ্টি। তবে জৈনরা যেরকম অহিংসায় বিশ্বাসী তা মোটেই কার্যকরী নয়। জগতে সবাই যদি তাদের অনুকরণ করে কৃষিকার্য বন্ধ করে দিত তাহলে জগতে ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনই থাকত না। জৈন ও বৌদ্ধধর্মে সত্যের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মলাভের উপায় স্বরূপ বলেছেন, 'সত্যেন হি লভ্য স্তপসা সম্যক জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্'— সত্যকে অবলম্বন করেই ব্রহ্মলাভ করা যায়, তপস্যা, সম্যকজ্ঞান ও নিত্য ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারাও যায়। সত্যের স্থান এর চেয়ে উপরে আর কি হতে পারে? উপনিষদের মতে ব্রহ্মলাভই জীবের চরম লক্ষ্য। উপনিষদ প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের। পরিশেষে আমার নিশ্চিত মত, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম হিন্দুধর্মেরই দুটি শাখা মাত্র—বুদ্ধ ও মহাবীর এই দুই মহাপুরুষ সময়োপযোগী পরিবর্তন করে তৎকালীন হিন্দুসমাজের কল্যাণসাধনই করেছিলেন।

সনাতন হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করেছি। স্বাধীন চিন্তার এমন সর্বতোমুখী বিকাশের সুযোগ ধর্মজগতের ইতিহাসে আর কোথাও আছে বলে জানি না। কিন্তু যত বড় পণ্ডিতই হন না কেন তাঁর চিন্তাশক্তির প্রখরতা ভারতবর্ষের কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মমতকেই নিয়ন্ত্রিত করেনি। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ভিত্তি উপলব্ধিভূত সত্য। স্বাধীন চিন্তা যতক্ষণ পর্যন্ত সত্যে না গিয়ে পৌঁছয় ততক্ষণ তার মূল্য নেই। 'ভূমৈব সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি'— উপনিষদের ঋষির এই মহাবাক্য সব ধর্মসম্প্রদায়েরই অন্তরের কথা। সমস্ত সম্প্রদায়ই ত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উপর জোর দিয়েছে। সমস্ত সম্প্রদায়েরই একমাত্র লক্ষ্য পরমপদ লাভ। যে যে-পথের সন্ধান পেয়েছে সে সেই পথ দিয়েই সমুদ্রে ছুটে গিয়েছে, অন্য কোনো দিকে লক্ষ্য করেনি। বহু নির্মলসলিলা স্রোতস্বতী যেমন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষেব সব প্রদেশকে সরস ও উর্বর করছে, হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ও তেমনি বিভিন্ন মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের নিজ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী ধর্মভাবের বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ দিয়েছে। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যেমন বহির্জগতের মাধুর্য ও সজীবতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, ধর্ম-জীবনের এই বৈচিত্র্যও তেমনি প্রকৃতির দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মে ভারতবর্ষের ধর্মকে মধুর ও জীবন্ত করে রেখেছে। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুযায়ী ধর্মপালন করবে, হিন্দুরা এই শাশ্বত সত্য চিরকাল মেনে চলেছে বলেই ভারতবর্ষে ধর্মের নামে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয়নি, পুণ্যসলিলা প্রেমজাহ্নবীই প্রবাহিত হয়েছে। নানা বিপর্যয়ের মধ্যেও হিন্দুধর্মের এই অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্য তাকে জগতে মহীয়ান করে রাখবে এই আমার বিশ্বাস।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞান

ভারতবাসীরা স্বভাবত ভাবপ্রবণ, বাস্তববিমুখ ভাবাতিশয্যই তাঁদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ—একথা কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিকের কৃপায় বিরাম-বিহীনভাবে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়েছে। সেই কুশিক্ষার ফলে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বলতে আরম্ভ করেছেন, ভারতবর্ষ চায় সৌন্দর্য, সুষমা, আলো, মলয়-বাতাস, বকুল-জুঁইয়ের প্রাণ-মাতানো গন্ধ, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। ভারতবর্ষের বহিঃপ্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতে অল্প আয়াসেই অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়ে যেত বলে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা মোটেই ছিল না, সুতরাং জগৎমায়া, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, তাল পড়ে টিপ শব্দ হয় না টিপ করে তাল পড়ে এই সমস্ত আলোচনা করার যথেষ্ট সুযোগ মিলেছিল, তাই ভারতবর্ষে কাব্য ও দর্শনের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো চর্চা হয়নি—এ ধরনের প্রচার খুব সুনিয়ন্ত্রিতভাবেই হয়েছে।

ভারতবাসীরা বাস্তব ব্যাপারে অপটু, একথা বলার মধ্যে একদল লোকের স্বার্থ আছে, কিন্তু সবাই স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এরকম প্রচার করেছেন আমি একথা বলছি না। বিজয়ী জাতির স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও পরাজিতের প্রতি তাচ্ছিল্য বশত তাদের অতীত কীর্তি সম্বন্ধে জানবার অনিচ্ছা হেতু অজ্ঞতাও

এর জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। 'ইউরোপীয় সুযুক্তিপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র, সত্যিকারের ইতিহাস, উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতবাদ থাকতে তার স্থানে আমরা কি এমন একটা জিনিস শিক্ষা দেব যা শিক্ষা করা কোনো ইংরেজ চাকরানীও গৌরবের মনে করবে না! আমরা কি এমন জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেব যা শুনলে ইংলণ্ডের যে কোনো স্কুল-বোর্ডিঙের মেয়েও না হেসে থাকতে পারবে না! আমরা কি এমন ইতিহাস পড়াব যাতে বহু ত্রিশ ফুট লম্বা রাজার কথা আছে যারা ত্রিশ হাজার বৎসর রাজত্ব করে গেছে; অথবা চিনি ও মাখন সমুদ্রের বর্ণনাযুক্ত ভূগোল পড়াব!'—১৮৩৫ সালে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্তে ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে লর্ড মেকলের উপরোক্ত যুক্তি ঔদ্ধত্যের নগ্নমূর্তি।

আসল কথা এই যে কাব্য ও দর্শনের মতো বিজ্ঞানেও প্রাচীন ভারতবর্ষ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। সে যুগে বিজ্ঞানেও তার সমকক্ষ কোনো দেশ ছিল না। ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট প্রতিভা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে সে ভোলেনি। যে আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—তিনিই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন অন্ন-ব্রহ্ম। পাটীগণিত, বীজগণিত, (ব্যক্ত ও অব্যক্ত গণিত), জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ, রসায়ন, ফলিত রসায়ন, ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের সব বিভাগেই ভারতীয়রা আশ্চর্যজনক উন্নতি লাভ করেছিলেন।

পাটীগণিত সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের বিজ্ঞান। অন্য কোনো জাতির দ্বারা কোনো রকমে প্রভাবান্বিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হিন্দুরা অন্য সব জাতির চেয়ে পাটীগণিতে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পাটীগণিতে হিন্দুদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও '০' শূন্যের আবিষ্কার। মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে অক্ষর আবিষ্কারের পরেই এই আবিষ্কারের স্থান। আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড হিন্দুদের '০' আবিষ্কার সম্বন্ধে লিখেছেন, 'অঙ্কশাস্ত্রের অন্য কোনো আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার বিকাশের পথে এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি। ১ থেকে ৯ এবং '০' ধরে অর্থাৎ দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হিন্দুরা গণিতে গ্রীকদের চেয়ে বেশি উন্নতি লাভ করেছিলেন।' ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন তাঁর

ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন—'হিন্দুরা পাটীগণিতে সর্ববাদী সম্মত দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত এবং মনে হয় এটাই গ্রীকদের তুলনায় পাটীগণিতে তাঁদের এত বেশি উন্নতির কারণ।'

এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে শিক্ষা করে, তাই ইউরোপীয়েরা একে আরবীয় সংখ্যা বলে ধরে। কিন্তু আরবেরা নিজেরাই একে হিন্দুসংখ্যা বলে স্বীকার করে। 'তারা (আরববা) স্পষ্টতই বিজ্ঞানে অধমর্ণ, এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারেই এটা নিশ্চিত যে তারা এই সংখ্যা গণনা* পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল' (কোলব্রুক)। ম্যাকডোনেল তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যেব ইতিহাসে লিখেছেন, 'বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষের কাছে ইউরোপের ঋণ যথেষ্ট, প্রথমত, জগতে প্রচলিত সংখ্যা হিন্দুদের আবিষ্কার। শুধু অঙ্কশাস্ত্রে নয় সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের উপর এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রভাব অপরিসীম। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয়েরা পাটীগণিত ও বীজগণিতে আরবদের এবং তাদের মারফতে পাশ্চাত্য-জাতি সমূহের শিক্ষাদাতা হয়েছিল।'

এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতিকে ইংরেজীতে 'decimal notation' বলে। হিন্দুরা decimal notation আবিষ্কার করেছিল বলে সাধারণের মনে একটা ধারণা আছে যে হিন্দুরা দশমিক বিন্দুরও আবিষ্কারক। এটা সম্পূর্ণ ভুল। যদিও সুপণ্ডিত ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্য থেকে একটি সূত্র উদ্ধৃত করে এই সাধারণ ধারণাকে সমর্থন করেছেন, তবুও আমরা সে মত সমর্থন করতে অক্ষম। পতঞ্জলির ব্যাসভাষ্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিত, তার প্রায় এক শত বৎসর পরে বিখ্যাত হিন্দু গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব। ব্রহ্মগুপ্তের গ্রন্থে দশমিক বিন্দুর ব্যবহার নেই। কোনো হিন্দু গণিতজ্ঞই দশমিক বিন্দুর ব্যবহার করেননি। হিন্দু প্রতিভার মধ্যাহ্ন-ভাস্করসম ভাস্করাচার্যের গ্রন্থেও এর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লীলাবতীর ইংরেজী সংস্করণে বলেছেন যে ভাস্করাচার্যের সময়ে (দ্বাদশ শতাব্দী) হিন্দু গণিতজ্ঞরা দশমিক ভগ্নাংশের ব্যবহার জানতেন না। অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ডাক্তার বিভূতিভূষণ

দত্ত অঙ্কশাস্ত্রে হিন্দুদের দান সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন। তিনিও মনে করেন হিন্দুরা দশমিক বিন্দুর ব্যবহার জানত না।

হিন্দুরা পূর্ণ সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, ঘন, বর্গমূল, ঘনমূল, এই আট রকমের প্রণালী জানত। মধ্যযুগে ইউরোপে ভাগকে একটা শক্ত জিনিস বলে মনে করত, কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা বেশ সহজ ছিল। বর্তমান ভাগের প্রণালী হিন্দুদের আবিষ্কার। বর্গমূল ও ঘনমূল বের করবার বর্তমান নিয়মও হিন্দুদের দান। হিন্দুরা গ্রীকদের অনেক আগে, যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণ সংখ্যা হয় না, তাদের নিকটতম বর্গমূল বের করার প্রণালী জানত। কোনো দুই বা ততোধিক সংখ্যার পূরণ ফল ঠিক হয়েছে কিনা স্থির করার জন্য '৯' বাদ দিয়ে দিয়ে যে নিয়ম রয়েছে তাও হিন্দুদের।

ত্রৈরাশিকও প্রথম হিন্দুরাই আবিষ্কার করে। ঠিক কোন সময়ে এই আবিষ্কার হয়েছে তা নির্ণীত হয়নি। কিন্তু আর্যভট্ট প্রণীত গ্রন্থে ত্রৈরাশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। আরবরা ত্রৈরাশিকের নিয়মও হিন্দুদের কাছ থেকেই শেখে। ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করতে হলে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বের করতে হয়। হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীর (নবম শতাব্দী) তাঁর গণিতসারসংগ্রহে এই নিয়মের ব্যবহার করেছেন। তিনি লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ককে 'নিরুদ্ধ' নাম দিয়েছিলেন।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দ গণিত (permutation and combination) জানত। বিভিন্ন রকমের বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই তাদের দৃষ্টি প্রথম এদিকে আকৃষ্ট হয়। পিঙ্গলের (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) ছন্দশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। শ্রেঢী ব্যবহারও (arithmetical and geometrical progression) হিন্দুরা জানিত। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মও রয়েছে। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে অনন্ত রাশি হয় ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে তা পাওয়া যায়।

মোটকথা হিন্দুরা পাটীগণিতে প্রাচীনকালে অবিসম্বাদিতরূপে সমস্ত জাতির চেয়ে উন্নত ছিল। আগেই বলেছি ধর্ম হিন্দুদের জ্ঞানলাভের প্রেরণা যুগিয়েছে। ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের ভালো রকম চর্চা আরম্ভ করে। গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায় না।

তাই তারা গণিতের চর্চা আরম্ভ করে। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে একথা স্পষ্ট বলেছেন যে দুই প্রকারের গণিতশাস্ত্রে (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করবার অধিকারী হওয়া যায়, 'সোঽন্যথা নামধারী'—নইলে কেবল জ্যোতিষী নামধারণই সার হয়, সত্যিকারের জ্যোতিষী হওয়া যায় না। একথা বোঝবার জন্য অতি সুন্দর উপমা দিয়েছেন :

'ভোজ্যং যথা সর্বরসং বিনাজ্যং
রাজ্যং যথা রাজবিবর্জিতং চ।
সভা ন ভাতীব সুবক্তৃহীনা
গোলানভিজ্ঞো গণকস্তথাত্র ॥'

ঘৃত ভিন্ন খাদ্য যেমন (অখাদ্য), রাজা শূন্য রাজ্য যেমন, সুবক্তাহীন সভা যেমন শোভা পায় না—গণিতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ গণকও তেমনি। তাই আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে গণিতের বিশদ আলোচনা পাই। আর্যভট্টতন্ত্রই এবিষয়ে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে প্রাচীনতম। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ২৩ বৎসর বয়সে আর্যভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায় যে তিনি এ বিষয়ে প্রথম লেখক নন, কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো লেখকের বই এখনও পাওয়া যায়নি।

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একথা উল্লেখ না করে পারছি না যে আজকাল আমাদের দেশে কোনো মেধাবী লোকের পক্ষেও মৌলিক গবেষণা করে ২৩ বৎসর বয়সে ঐ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করা সম্ভবপর নয়, তার প্রধান কারণ, একটি বিদেশী ভাষার মারফতে আমাদের জ্ঞান লাভ করতে হয়। ঐ ভাষা আয়ত্ত করতেই আমাদের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে যে আমাদের অনেক সময় বেঁচে যায় তা প্রথম বুঝি ছাত্রজীবনে উইলিয়ম হেন্‌রী পার্কিন নামক রাসায়নিকের জীবনী পাঠ করে। পার্কিন আঠারো বৎসর বয়সে ম্যাজেণ্টা নামক কৃত্রিম রঙ আবিষ্কার করেন। ইংরেজী ভাষার মারফতে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে হয় বলে বাঙালী ছেলের পক্ষে ঐ বয়সে মৌলিক গবেষণা আরম্ভ করার সুযোগও হয় না।

আর্যভট্ট কুসুমপুর বা বর্তমান পাটনায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। আর্যভট্টের

সময়ে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলের মাতৃভাষা বা প্রাকৃতের তফাত বড় একটা ছিল না। আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজীর যতটা তফাত উত্তর ভারতের কোনো এক ভাষার সঙ্গে অন্য কোনো ভাষার তার অর্ধেকটা তফাতও নেই। আর সে সময়ে বলতে না পারলেও প্রায় সকলেই সংস্কৃত বুঝত। এরই কাছাকাছি সময়ে কালিদাসের শকুন্তলা প্রভৃতি ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক নাটক লিখিত। ঐ সব নাটকে সাধারণত সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের পুরুষেরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছেন, মেয়েরা ও সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত বুঝে প্রাকৃত ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। কাজেই সংস্কৃত সে সময়ে সমাজের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে প্রায় চলতি ভাষাই ছিল এবং প্রায় সকলেই সংস্কৃত বুঝত।

হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে ভাস্করাচার্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' রচনা করেন। তিনি সহ্য পর্বতের সমীপে বিজ্জবিড় বা বিজাপুর নামক স্থানের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কৃতী দৈবজ্ঞ চূড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন। লীলাবতী নামক পাটীগণিত ও বীজগণিত সিদ্ধান্তশিরোমণির দুটি অংশ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে ভাস্করাচার্য তাঁর বিধবা কন্যা লীলাবতীকে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্তশিরোমণির পাটীগণিত অংশ লিখেছিলেন বলে তার নাম লীলাবতী। এ প্রবাদ সত্য নয়। লীলাবতীতে যেমন 'অয়ি বালে লীলাবতী'—হে বালিকে লীলাবতী—বলে সম্বোধন রয়েছে তেমনি 'ব্রূহি সখে' ও 'ব্রূহি কান্তে'—সখা বল ও কান্তা বল ইত্যাদি সম্বোধন রয়েছে। নিজের মেয়েকে কেউ সখা ও কান্তা বলে সম্বোধন করতে পারে না। আমার মনে হয় লীলাবতী বলতে এখানে কোনো বিশেষ মহিলাকে বোঝায় না। লীলাবতী শব্দের অর্থ গুণসম্পন্না। এই অর্থে সিদ্ধান্তশিরোমণির গোড়ায় লীলাবতী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে—'লালিত্য লীলাবতী'—মাধুর্য গুণসম্পন্না। নিজের পুস্তককে নিজেই গুণসম্পন্ন বলা যুক্তিবিরুদ্ধ—এই আপত্তি টিকতে পারে না, কারণ ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায়ের শেষেও লিখেছেন 'কবি ভাস্কর পণ্ডিতগণের সন্তোষপ্রদ, সুব্যক্ত, সুযৌক্তিক বাক্যবহুল, সহজবোধ্য, কুবুদ্ধি বিনাশক এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'

বীজগণিতেও হিন্দুদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। 'যদিও শেষোক্ত বিজ্ঞান (বীজগণিত) একটি আরবী নামে অভিহিত, তথাপি এ দান আমরা হিন্দুদের কাছ থেকেই পেয়েছি' (ম্যাক্‌ডোনেল)। 'যে সময় আরবরা বীজগণিতের কিছুই জানত না সেই সময়ে (অর্থাৎ আরবদের বহুপূর্বে) হিন্দুরা বীজগণিত আবিষ্কার করে' (কোলব্রুক্)। বীজগণিতের ইংরেজী নাম অ্যাল্‌জেবরা (algebra)। আরবদের মধ্যে বীজগণিতের প্রথম লেখক মহম্মদ মুশা আল খোয়ারেজমী (৮২৫ খৃষ্টাব্দ) কৃত 'আলজেব-ওয়াল-মোকাবেলা' নামক বীজগণিতের গ্রন্থের নাম থেকে ঐ শব্দ নেওয়া হয়েছে। ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে বীজগণিত শিক্ষা করে, কিন্তু আলখোয়ারেজমী তাঁর বীজগণিতের জ্ঞান হিন্দুদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। 'আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে কেবল যে বীজগণিতের মূল সূত্রটিই পেয়েছিল তা নয় তারা গণনাঙ্ক ও দশ ধরে গণনা পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকেই পায়' (মনিয়ার উইলিয়ামস্)। যদিও গ্রীক ও চীনেরাও প্রাচীনকালে বীজগণিতের চর্চা করেছিল, তবু এই বিজ্ঞানে হিন্দুরাই অনেক বেশি ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

ডাক্তার বিভূতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণিতের আকার ও ভাব মূলত হিন্দুদেরই কীর্তি। হিন্দুরা বীজগণিত ও অব্যক্তগণিত এই দুই নামেই এই শাস্ত্রকে অভিহিত করত। অব্যক্তগণিতের অর্থ অজ্ঞাত রাশির গণনা বিজ্ঞান, আর বীজ শব্দের অর্থ মূল বা কারণ। ঋণাত্মক সংখ্যা (negative number) প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে ঋণী। প্রথম ধন (positive) ও ঋণ সংখ্যাকে যথাক্রমে ঋক্ ও অনৃক বলা হত; পরবর্তী যুগে ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি গণিতজ্ঞরা এদের ধন ও ঋণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বীজগণিতে সমীকরণ (equation) শব্দও প্রথম হিন্দু গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃষ্টাব্দ) আবিষ্কার করেন। হিন্দু গণিতে চার রকমের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায়: (১) এক বর্ণ সমীকরণ, (২) অনেক বর্ণ সমীকরণ, (৩) মধ্যমাহরণ ও (৪) ভাবিত (simple, simultaneous, quadratic equation, and equation involving products of two unknown quantities)। বর্গসমীকরণের (quadratic equation) নাম মধ্যমাহরণ হওয়ার কারণ মধ্যম সংখ্যা অপনয়নের দ্বারা ঐ সমীকরণের সমাধান। এই প্রণালী প্রথম শ্রীধরাচার্য আবিষ্কার করেন।

বর্গ সমীকরণে অজ্ঞাত সংখ্যার ধন ও ঋণ এই দুটি মূল্য বের হতে পারে, এটা হিন্দু গণিতজ্ঞ পদ্মনাভ আবিষ্কার করেন। শ্রীধরাচার্য ও পদ্মনাভের লেখা গণিতের পুস্তক এখনও পাওয়া যায়নি। ভাস্করাচার্যের গ্রন্থে এঁদের নাম ও উপরোক্ত আবিষ্কারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্গসমীকরণে ভাস্করাচার্যের প্রণালী শ্রীধরাচার্যের প্রণালী থেকে ভিন্ন এবং তা বর্তমানে প্রচলিত প্রণালীরই অনেকটা অনুরূপ। হিন্দুরা বর্গসমীকরণের পূর্ণ সমাধান করতে পারত। অনিশ্চিত একবর্ণ সমীকরণ (indeterminate equation of the first degree) বা কুট্টকের সমাধান আর্যভট্টের গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তার পরে অন্যান্য হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের চেষ্টায় ইউরোপের বহু পূর্বেই এ দেশে সাধারণ সমাধান আবিষ্কৃত হয়।

আধুনিক কালে ১৬২৪ সালে বাকেট ডি মেজিরিয়াক ঐ নিয়ম পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং অয়লার ও লাগ্রাঞ্জে তার উন্নতি সাধন করেন। উপরোক্ত ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের প্রণালী ও আর্যভট্ট আবিষ্কৃত নিয়ম ফলত একই। ভাস্করাচার্য অনিশ্চিত বর্গ সমীকরণেরও (indeterminate equation of the second degree) সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন। এ বিষয়ে অঙ্কশাস্ত্রের ইতিহাস-প্রণেতা ক্যাজোরি লিখেছেন—'অনিশ্চিত সমীকরণ বিদ্যায় হিন্দুরা বেশ একটা সহজ নিজস্ব ভাব দেখিয়েছেন। আমরা আগেই বলেছি যে এ বিষয়টি ডায়োফ্যান্টাসের (গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ) খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সমাধান করতে অশেষ বুদ্ধিমত্তারও পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম বিভাগে সাধারণ আবিষ্কারের গৌরব হিন্দুদেরই।'

আগেই বলেছি হিন্দুরা জ্যোতিষ গণনার সাহায্যের জন্য দুই প্রকারের অঙ্কশাস্ত্রের চর্চা করে। তারা বীজগণিতের এই সব সূক্ষ্ম গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রে ও জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেছে। 'যদি একথা স্বীকার করা যায় যে হিন্দু ও আলেকজেণ্ড্রিয়ার দুজন গণিতবিদ্ (আর্যভট্ট ও ডায়োফ্যান্টাস্) প্রায় সমসাময়িক তবুও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞের পক্ষে একথা বলতেই হবে যে এ বিজ্ঞানে তিনি অধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন' (কোলব্রুক)। আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, শ্রীধর, পদ্মনাভ ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা অনেক পরে ইউরোপে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত

হয়েছে। হিন্দুগণিতবিদ্‌রা অঙ্ক-শাস্ত্রের মধ্যেও যে কবি-প্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাস্করাচার্য থেকে একটি ছন্দো-গণিতের ও একটি বর্গ সমীকরণের উদাহরণ দিলেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে: ছন্দোগণিতের উদাহরণ—পাশাঙ্কুশাহি ডমরুক কপাল শুলৈঃ খট্টাঙ্গ শক্তি শরচাপযুর্তৈভবন্তি। অন্যোন্যহস্ত কলিতৈকতিমূর্তিভেদাঃ শম্ভোর্হরেরিব গদাবি সরোজ শঙ্খৈঃ॥ মহাদেবের দশহাতে যথাক্রমে রজ্জু, অঙ্কুশ, সাপ, ডমরু, কপাল, ত্রিশূল, খাট, তরোয়াল, তীর ও ধনুক এবং হরির চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। মহাদেব ও হরিব নিজ নিজ এক হাতের জিনিস অপর হাতে দিয়ে অদল বদল করলে কত প্রকারের মূর্তি হয়? উত্তর—মহাদেব মূর্তি ৩৬২৮৮০০ ও হরি মূর্তি ২৪।

বর্গসমীকরণের উদাহরণ—মেঘ দেখা দিলে এক দল হাঁসের মধ্যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূলের দশগুণ মানস সরোবরে চলে যায়, ৮ ভাগের ১ ভাগ স্থলপদ্মের বনে যায় এবং তিন জোড়া পদ্মের মৃণাল সুশোভিত জলে খেলা করতে থাকে। প্রিয় বালিকে, বল দেখি এই দলের মোট সংখ্যা কত? উত্তর—১৪৪।

ছন্দোগণিতের উদাহরণে ভাস্করাচার্য মহাদেবের দশভুজ মূর্তি ও হরির চতুর্ভুজ মূর্তির উল্লেখ করেছেন। হরি বা নারায়ণ মূর্তি চতুর্ভুজ একথা সব হিন্দুই জানেন, কিন্তু দশভুজ মহাদেব মূর্তির কথা আমরা কখনো শুনিনি বা অন্য কোনো পুস্তকেও পাইনি। ভাস্করাচার্যের মতো জ্যোতিষীর পক্ষে এসব ধর্মবিষয়ক ব্যাপারে অঙ্কের উদাহরণ স্বরূপেও ভুল জিনিসের উল্লেখ সম্ভবপর বলে মনে হয় না। হয়তো বা কোনো সময়ে দাক্ষিণাত্যে (দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে) দশভুজ শিবমূর্তির উপাসনা হত। মহাদেবকে পঞ্চানন বলা হয়, কিন্তু তাঁর দশ হাতের কল্পনা কোনো কালে হয়েছিল বলে জানি না।

খুব প্রাচীন কাল থেকেই ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা আরম্ভ হয়। বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞের বেদীর গঠনপ্রণালী স্থির করতে গিয়ে হয় জ্যামিতির উৎপত্তি। সমসাময়িক মিশর বা চীনদেশের চেয়ে ভারতবর্ষে জ্যামিতির উন্নতি অনেক বেশি হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী যুগে গ্রীকরা এ বিষয়ে হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু 'এটা ভুলতে পারা যায় না যে জগৎ জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য ভারতের কাছেই ঋণী, গ্রীসের কাছে নয়' (রমেশচন্দ্র দত্ত)।

হিন্দু জ্যামিতির পুস্তক হিসাবে বৌধায়ন ও আপস্তম্বের শুল্বসূত্রের নাম করা

যেতে পারে। শুল্বসূত্র খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে লেখা। সমকোণী ত্রিভুজের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। এই উপপাদ্য গ্রীসদেশীয় জ্যামিতিবিদ্ পিথাগোরসের নামের সঙ্গে যুক্ত এবং একে সাধারণত পিথাগোরসের উপপাদ্য বলে। কিন্তু বৌধায়নে আছে: 'সমচতুরশ্রস্যাক্ষয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি'—সমচতুষ্কোণের কর্ণের উপরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের আয়তন ঐ চতুষ্কোণের দ্বিগুণ; ও 'দীর্ঘ চতুরশ্রস্যাক্ষয়ারজ্জুপার্শ্বোমানো তির্যঙ্‌মানোচ যৎ পৃথগ্‌ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং-করোতি'—দীর্ঘচতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রে চতুষ্কোণের পাশের ও নিচের দুই বাহুর অঙ্কিত দুইটি বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। বৌধায়ন পিথাগোরসের বহু পূর্বে জন্মেছিলেন অতএব এই উপপাদ্য প্রথম আবিষ্কারের সম্মান বৌধায়নেরই প্রাপ্য।

কোনো কোনো পণ্ডিত (শ্রয়ডার বিউরক্) বলেন যে পিথাগোরস্ এই উপপাদ্য হিন্দুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। আবার অপর দিকে একদল লোক আছেন যাঁরা হিন্দু জ্যামিতি গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করা, একথা বলতেও দ্বিধা করেননি। বৌধায়ন ও আপস্তম্বের শুল্বসূত্র হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের ধর্মানুষ্ঠানের অংশবিশেষ। যাঁরা হিন্দুপ্রকৃতি জানেন তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে হিন্দুরা তাদের ধর্মপুস্তককে ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ক ব্যাপারে অত প্রাচীনকালে অন্য দেশের পণ্ডিতদের মত এনে চালু করেছে। বিশেষ অকাট্য প্রমাণ না পেলে, হিন্দুধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এমন সব জিনিস যে তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে একথা নিঃসঙ্কোচে ধরে নেওয়া যায়। অপরদিকে, পুনর্জন্মবাদ ও হিন্দুদর্শনের অন্যান্য বিষয়ে পিথাগোরসের জ্ঞান থেকে যদিও স্পষ্ট বোঝা যায় যে হিন্দুপণ্ডিতদের পুস্তকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল, তবুও অকাট্য প্রমাণ না পেলে একজন অন্যজনের কাছ থেকে ধার করেছেন একথা বলা সঙ্গত নয়।

কালিদাস ও শেক্স্‌পিয়রের নাটকের মধ্যে সাদৃশ্য দেখে ম্যাকডোনেল বলেছেন, 'বিভিন্ন দেশের মানব মনের চিন্তাধারার কেমন সামঞ্জস্য'; কারণ এঁদের মধ্যে একে অন্যের কাছ থেকে ধার করেছেন একথা বলার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দিবারাত্রি ভেদ হয় এই তত্ত্ব আর্যভট্ট প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর মত খণ্ডনের জন্য লল্ল, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত যে সমস্ত যুক্তি

দিয়েছিলেন ইউরোপে কোপানিক ভূভ্রমণবাদ আবিষ্কার করার পর সেই মত খণ্ডনের জন্য তায়কোব্রাহি নামক জ্যোতির্বিদ হিন্দু জ্যোতিষীদের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে ঠিক সেই সব যুক্তিই প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে তায়কোব্রাহি ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির কাছ থেকে ঐ যুক্তি নিয়ে নিজের নামে চলিয়াছেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে মানব মন একই ভাবে চিন্তা করে—এ সমস্ত শুধু সে কথাই প্রমাণ করে।

ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান বর্গক্ষেত্র, একটি বর্গক্ষেত্রেব দ্বিগুণ, তিনগুণ বা অর্ধেক ও একতৃতীয়াংশের সমান বর্গক্ষেত্র অঙ্কন, বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কন প্রভৃতি বিষয় শূল্বসূত্রে আছে। বৌধায়ন ও আপস্তম্বের মতে সমচতুর্ভুজের বাহুব পরিমাণ ১ হলে কর্ণের পরিমাণ $১+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩\cdot৪}+\frac{১}{৩\cdot৪\cdot৩৪}$ দশমিকে ব্যক্ত করলে ১'৪১৪২১৫৬ হয়; আধুনিক মতে $\sqrt{২}$ অথবা ১'৪১৪২১৩...। পঞ্চম দশমিক স্থান পর্যন্ত মিল রয়েছে। আর্যভট্ট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়েছেন $\frac{২২}{৭}$। ভাস্করাচার্যের মতে $\frac{২২}{৭}$ দিয়ে ব্যাসকে গুণ করলে স্থূল এবং $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ দিয়ে গুণ করলে নিকট পরিধি পাওয়া যায়। $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ বা $৩\frac{১৭৭}{১২৫০}$ প্রায় আধুনিক গণনা সম্মত, দশমিকে ব্যক্ত করলে ৩'১৪১৬ ·· হয়, আর আধুনিক গণনা অনুযায়ী ৩'১৪১৫৯। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তিন বাহু দ্বারা বের কবার প্রণালী ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে ক্লৌভিয়াস আবিষ্কার কবেন। কিন্তু এই প্রণালী আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত সূর্যসিদ্ধান্তে রয়েছে। ব্রহ্মগুপ্তে ও ভাস্করাচার্যে চার বাহু থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রণালী আছে।

ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুদের দান যথেষ্ট। এলফিনস্টোন তাঁর ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন, 'সূর্যসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির এমন সব পদ্ধতি রয়েছে যা গ্রীকরা জানত না, শুধু তাই নয়, এমন অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে যা ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর আগে আবিষ্কৃত হয়নি।' হিন্দু ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়ালেস এই মন্তব্য করেছেন, 'একটি পুস্তক যত প্রাচীনই হোক তাতে যদি ত্রিকোণমিতি পাওয়া যায় তবে আমরা নিশ্চিন্ত হতে পারি যে ঐ পুস্তক বিজ্ঞানের শৈশবে লিখিত হয়নি। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে সূর্যসিদ্ধান্তের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা হয়েছিল।' 'হিন্দুরা ত্রিকোণমিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান জিনিস দান

করেছে। বাস্তবিক পক্ষে তাদের দান এতটা মৌলিক ধরনের যে তাদের স্থান আধুনিক ত্রিকোণমিতির বিজ্ঞানের গোড়ায় বলা যেতে পারে' (বিভূতিভূষণ দত্ত)।

হিন্দুদের পরে ত্রিকোণমিতিতে আরবরা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। হিন্দুরা বর্তমান ত্রিকোণমিতিব sine, co-sine ও versed sine আবিষ্কার করে, তাদের যথাক্রমে জ্যা, কোটি-জ্যা, ও উৎক্রম-জ্যা বলা হত। তারা ত্রিকোণ-মিতির অনেক সূত্র (formula) জানত। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রত্যেক পুস্তকে জ্যা, কোটি-জ্যা ও উৎক্রম-জ্যার সারণী (table) রয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তের সারণীতে ত্রিকোণমিতির এমন পদ্ধতি রয়েছে যা ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রিগ্‌স্ পুনরায় আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস লেখক ডিলাম্বে সূর্যসিদ্ধান্তের একটি ত্রিকোণমিতির গণনা প্রণালীর উল্লেখ করে বলেছেন, 'এখানে একটি প্রণালী রয়েছে যা হিন্দুরা জানত কিন্তু গ্রীক বা আরবরা জানত না।' ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে একটি বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত সমকোণী সমবাহু ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, সপ্তভুজ, অষ্টভুজ ও নবভুজের বাহুর পরিমাণবৃত্তের ব্যাসের হিসাব বের করার প্রণালী রয়েছে। সেই প্রণালী অনুযায়ী যে ফল পাওয়া যায় তা আধুনিক ত্রিকোণমিতি অনুযায়ী ফলের সঙ্গে তুলনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তুলনার জন্য ফল দশমিকে ব্যক্ত করা গেল, অবশ্য ভাস্করাচার্য ভগ্নাংশে ব্যক্ত করেছেন :

আধুনিক ত্রিকোণমিতি অনুসারে				ভাস্করাচার্যের প্রণালী অনুযায়ী		
ত্রিভুজের বাহু—	ব্যাস	×	·৮৬৬০২৫৪	ব্যাস	×	·৮৬৬০২৫
চতুর্ভুজের „ —	„	×	·৭০৭১০৬৭	„	×	·৭০৭১০৮৩
পঞ্চভুজের „ —	„	×	·৫৮৭৭৮৫৩	„	×	·৫৮৭৭৮৩
ষড়ভুজের „ —	„	×	·৫	„	×	·৫
সপ্তভুজের „ —	„	×	·৪৩৩৮৮১৯	„	×	·৪৩৩৭৯১৬
অষ্টভুজের „ —	„	×	·৩৮২৬৮৩৪	„	×	·৩৮২৬৮৩
নবভুজের „ —	„	×	·৩৭২০২০১	„	×	·৩৪১৯২৫

অর্থাৎ ত্রিকোণমিতিতেও হিন্দুরা প্রাচীনকালে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বাপুদেব শাস্ত্রী সভ্য জগতের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেন যে ভাস্করাচার্য নিউটন, লাইবনিট্‌সের পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক পূর্বে ব্যাসকলণ (differential calculus) আবিষ্কার করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদরা সাধারণত পর পর দুদিন ঠিক একই সময়ে কোনো গ্রহের দেশান্তর (longitude) বের করে তার দৈনিক গতি নির্ধারণ করত। ভাস্করাচার্য এই প্রণালীকে স্থূল আখ্যা দিলেন (ইয়ং কিল স্থূলাগতিঃ) এবং সূক্ষ্মগতি বের করার জন্য এক নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করলেন এবং তার নাম দিলেন তাৎকালিক প্রণালী। গ্রহেব গতি নিধারণ করতে ভাস্করাচার্য যে ভাবে এই তাৎকালিক প্রণালী প্রয়োগ করেছেন তা ব্যাসকলণের প্রণালী ভিন্ন অন্য কিছু নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় 'এ থেকে অতি স্পষ্ট যে ভাস্কর ব্যাসকলণের মূলনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত ছিলেন।' ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজ-জ্যোতিষী স্পটিশ উড শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল প্রবন্ধ পাঠ করে যদিও সাধারণভাবে তাঁর অভিমত মেনে নেন, তবু তিনি বলেন যে ভাস্করাচার্যের দাবী একটু অতিরঞ্জিত করা হয়েছে এবং তিনি দুইটি আপত্তি উত্থাপন করেন: (১) এই প্রণালীতে যে ফল বের হয় তা নিকটমাত্র ভাস্করাচার্য একথা বলেননি এবং (২) অতি ক্ষুদ্র সময় ও স্থানের (infinitesimal time and space) উল্লেখ করেননি। ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দেখিয়েছেন যে ব্যাসকলণের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় গণিতবিদ্‌রাও আবিষ্কার করেননি যে এরকম গণনাফল নিকটমাত্র, তা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব প্রথম আপত্তি টিকতে পারে না। দ্বিতীয় আপত্তি স্পটিশ উড না-জানা বশত করেছেন। ভাস্করাচার্য স্পষ্টই বলেছেন যে তাৎকালিক গতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের (প্রতিক্ষণ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাস্কর তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে এক সেকেণ্ডের প্রায় চৌত্রিশ হাজার ভাগের এক ভাগকে কালপরিমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'ক্রটি'—'প্রতিক্ষণ'-এর চেয়ে ক্ষুদ্রতর সময়। কাজেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে তিনি তাঁর তাৎকালিক প্রণালীতে খুব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের ব্যবহার করেছেন। স্থানের পরিমাণ হিসাবেও খুব ক্ষুদ্র সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন। এইভাবে সব দিকের যুক্তি বিবেচনা করে ডাক্তার শীল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন: 'ব্যাসকলনের আবিষ্কারক হিসাবে নিউটনের পূর্ববর্তী বলে ভাস্করের দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।' ডাক্তার বিভূতি

ভূষণ দত্ত ভাস্করাচার্যের বই থেকে আরও উদাহরণ সংগ্রহ করে ডাক্তার শীলের মত সমর্থন করেছেন, শুধু তাই নয় তিনি এই কথাও বলেছেন যে দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খৃষ্টাব্দ), মুঞ্জল (৯৩২ খৃষ্টাব্দ) প্রভৃতি হিন্দু গণিতজ্ঞদের লেখায় ব্যাসকলনের সূত্রপাত দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যসিদ্ধান্তের একটি জ্যোতিষ-সারণীর গণনা পদ্ধতি বিচার করে ডিলাম্বে মত প্রকাশ করেছেন যে ঐ পুস্তকের গ্রন্থকার ব্যাসকলণের সূত্র জানতেন, ডাক্তার দত্ত সে কথাও উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে আর বেশি আলোচনা বর্তমান পুস্তকে সম্ভব নয়, যাঁরা ভালো করে জানতে চান, তাঁদের আমি ডাক্তার বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয়ের 'অঙ্ক শাস্ত্রে হিন্দুদের দান' (Hindu Contribution to Mathematics) নামে ইংরেজী বইটি পড়তে অনুরোধ করি।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। বৈদিকযুগ থেকেই হিন্দুরা জ্যোতিষের চর্চা আরম্ভ করে। আজ চন্দ্র আকাশে যে জায়গায় আছে ২৭৷২৮ দিন পরে আবার সে জায়গায় ফিরে আসবে, এবং চন্দ্র যে সূর্যের আলোতেই তেজোময় একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা থেকে অপর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পযন্ত ত্রিশবার সূর্যোদয় হয় লক্ষ্য করে তাঁরা ত্রিশ দিনে মাস স্থির করেন। পরে অবশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন যে চান্দ্র মাস ঠিক ত্রিশ দিনে নয়, কিছু কম। আর একথা তাঁরা আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে কোনো একটি নক্ষত্র থেকে যাত্রা শুরু করলে সূর্য ৩৬৫ দিনে আবার তার সঙ্গে একত্র হয় অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে বৎসর। কিন্তু বারো চান্দ্র মাসে ৩৬৫ দিন হয় না, প্রতি তিন বৎসরে প্রায় এক মাস কম পড়ে। অতএব চান্দ্র ও সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য করার জন্য তাঁরা প্রতি তিন বৎসরে একটি 'মল' মাস কল্পনা করে নেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সৌর মাস প্রচলিত, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মকার্য প্রায় সবই তিথি ধরে। অতএব ঠিক ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য চন্দ্রের গতি বিষয়ে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার, তাই এ বিষয়ে এদের জ্ঞান ছিল খুবই প্রখর—গ্রীকদের ততটা হয়নি। চন্দ্রের ভগন-ভোগকাল দশমিকে ব্যক্ত করলে সূর্যসিদ্ধান্ত মতে ২৭·৩২১৬৭ দিন এবং আধুনিক মতে ২৭·৩২১৬৬ দিন সূক্ষ্ম গণনার পরিচয় এর চেয়ে আর বেশি কি হতে পারে! এই ভাবে আকাশ পরীক্ষার ফলে তাঁরা গ্রহদের সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করেন।

বৈদিক ঋষিরা খুব সম্ভবত শুক্র ও বৃহস্পতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তিলকের মতে তাঁরা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই পাঁচটি গ্রহের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

হিন্দু জ্যোতিষীদের মধ্যে আর্যভট্টের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্তনের জন্য যে দিবারাত্রি ভেদ হয় আর্যভট্টই প্রথম সে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন :

'অনুলোমগতির্নৌস্থ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্॥'

পুবে 'চলতি নৌকায় উপবিষ্ট লোক যেমন নদীর দুই পারের অচল গাছ ও পাহাড় পশ্চিম দিকে চলছে এরূপ দেখেন, তেমনি লঙ্কায়' (নিরক্ষদেশে) অচল নক্ষত্রগুলিকে পশ্চিমদিকে যেতে দেখায়। আর্যভট্টের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে কোপার্নিক নামে জ্যোতির্বিদ ইউরোপে এই তত্ত্ব প্রকাশ করেন। আর্যভট্ট সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ ঠিক জানতেন। চন্দ্র ও গ্রহগুলির কারোই নিজের আলো নেই—সূর্যের আলোতেই তারা আলোকিত তিনি এই মত ব্যক্ত করেন। গ্রহগুলি পৃথিবীর মতো সূর্যের চারদিকে ঘোরে এবং তাদের ভ্রমণ পথ বা গ্রহকক্ষ যে সম্পূর্ণ বৃত্তাকার নয় নীচোচ্চ বৃত্ত (epicycle) অর্থাৎ অনেকটা দীর্ঘবৃত্তের (ellipse) মতো তিনি একথাও বলেছিলেন।

যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে পৃথিবী যে গোলাকার, বৈদিক ঋষিরাই একথা স্বীকার করতেন। 'বোধ হয় ঋষিগণ পৃথিবী গোলাকার বলিয়া স্বীকার করিতেন। পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার না করিলে সূর্যের অগ্রে উষার উদয় বলার তাৎপর্য থাকে না।' ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে একথা খুব স্পষ্টভাবেই লিখেছেন :

'যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা
ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্
কিমু নরৈ রমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥'

অর্থাৎ পৃথিবী যদি আয়নার মতো সমতল হত তবে যে সূর্য বহু উপরে ও দূরে থেকে ভ্রমণ করছে তাকে দেবতারা যেমন সব সময় দেখতে পায় মানুষেও তেমন পায় না কেন! গোলাকার হওয়া সত্বেও পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল দেখা যায় কেন, তা বোঝাবার জন্য ভাস্করাচার্য অতি সুন্দর উপমা দিয়েছেন :

'সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশ
পৃথ্বীচ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎপৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না
সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা।।'

অর্থাৎ একটি বৃত্তেব পবিধির শতভাগের এক ভাগকে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে) যেমন সমান বোধ হয়, তেমনি মানুষ পৃথিবীব পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীব খুব সামান্য অংশকে দেখতে পায় বলে তাকে সমতল দেখায়।

পৃথিবীর ব্যাস ও পবিধি কত তা অতি প্রাচীন কালেই হিন্দুরা স্থির করতে চেষ্টা করেছে। ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্কবাচার্যের মতে পৃথিবীর ব্যাস যথাক্রমে ১৫৮১ ও ১৫৮১$\frac{১}{২৪}$ যোজন; সূর্যসিদ্ধান্ত মতে ১৬০০ যোজন। এটা আধুনিক গণনা সম্মত কিনা স্থির করতে হলে যোজনেব পরিমাণ জানা দরকার। লীলাবতীতে আছে ৮০ যবে ১ আঙুল, ২৪ আঙুলে এক হস্ত, ৪ হস্তে ১ দণ্ড, ২০০০ দণ্ডে এক ক্রোশ, ৪ ক্রোশে ১ যোজন, অর্থাৎ ৩২০০০ হাত বা ৯$\frac{১}{১১}$ মাইলে এক যোজন। জ্যাব অর্থ বোঝাতে যেমন ভাস্করাচার্য জ্যা শব্দ ব্যবহার করেছেন, ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্য প্রভৃতি তেমনি যোজনার্ধ বোঝাতে যোজন শব্দ ব্যবহার কবেন। এ ভাবে গণনা করলে পৃথিবীর ব্যাস ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের মতে ৭১৮২ মাইল হয়। কেউ কেউ ৫ মাইল যোজন ধরে ব্যাসের পরিমাণ ৭৯০৫ মাইল করেছেন; আধুনিক মতে ৭৯১৮ মাইল।

আগেই বলেছি পৃথিবী গোলাকার একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। পরবর্তী যুগে হিন্দুরা ভূগোলক কল্পনা করেছিল। ব্রহ্মগুপ্তের সময় এমন কি তার আগেও লঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে তারা কল্পনা করত। ভাস্করাচার্যে রয়েছে— 'লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনং চ।' আজকাল আমরা যে ভূগোল পড়ি তাতে গ্রীনিচ-কে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে ভূগোলক

কল্পনা করা হয়। কিন্তু লঙ্কাকে কেন্দ্র ধরে ভূগোল লিখলেও ভূগোলের কোনো ত্রুটি হয় না।

জ্যোতিষ্ক বিষয়ক পরীক্ষার জন্য হিন্দুরা শঙ্কু, ঘটি প্রভৃতি কিছু কিছু যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। ঐ সব সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে তারা খুব সূক্ষ্ম গণনা করত। একটি গ্রহ যতদিনে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে ততদিনকে তার ভগন-ভোগকাল বলে। আধুনিক ও সূর্যসিদ্ধান্ত মতে কয়েকটি গ্রহের ভগন-ভোগকাল তুলনার জন্য দিচ্ছি :

গ্রহের নাম	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে	আধুনিক মতে
বুধ	৮৭.৯৫৮৫	৮৭.৯৬৯৩ মধ্যম সাবন দিন
শুক্র	২২৪.৬৯৮৫	২২৪.৭০০৮
মঙ্গল	৬৮৬.৯৯৭৫	৬৮৬.৯৫০৫
বৃহস্পতি	৪৩৩২.৩২০৬	৪৩৩২.৫৮৪৮
শনি	১০৭৬৫.৭৭৩০	১০৭৫৯.২১৯৭

(যোগেশচন্দ্র রায়)

পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডল কত দূর ব্যাপী এ বিষয়েও হিন্দু জ্যোতিষীরা গবেষণা করেছেন, ভাস্করাচার্যের মতে 'ভূমের্বহির্দ্বাদশ যোজনানি'—অর্থাৎ বায়ু মণ্ডল দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত। পূর্বে ৪২/৩ মাইলে ভাস্করাচার্যের যোজন ধরা হয়েছে, তাহলে প্রায় ৫৫ মাইল হয়, আধুনিক মতে সাধারণ ভাবে ৫০ মাইল। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে নক্ষত্রাদি পরীক্ষার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং তার পর থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। এর আগে জ্যোতির্বিদ্যায় হিন্দুরা কোনো জাতির চেয়ে কম উন্নত ছিল না।

গণিতশাস্ত্রের মতো জ্যোতির্বিদ্যায়ও হিন্দুরা আরবের শিক্ষক। অধ্যাপক জাচাউ তাঁর আলবিরুনী কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকালে দুই সময়ে আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে : (১) মনসুরের রাজত্বকালে (খৃষ্টাব্দ ৭৫৩-৭৭৪) প্রধানত জ্যোতির্বিদ্যা, (২) হারুনের রাজত্বকালে বারমাক নামক মন্ত্রী পরিবারের প্রভাবে (যাঁরা ৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসলমান জগতের উপর প্রভুত্ব করেছিলেন), বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গ্রহফল গণনাবিদ্যা।' তিনি

আরও লিখেছেন, 'তারা টলেমির আগে ব্রহ্মগুপ্তের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল।' কোলব্রুকের মতেও 'গ্রীকদেশীয় কোনো জ্যোতির্বিদ বা গণিতজ্ঞদের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে আববরা হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র ও সংখ্যা গণনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল।'

পরিশেষে হিন্দু প্রতিভার একটি উদাহরণ দিয়ে হিন্দু জ্যোতিষীদের কাছ থেকে বিদায় নেব। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটন জগৎ বিখ্যাত। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অঙ্কশাস্ত্রের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে ভারি বস্তু সকল উপর থেকে পৃথিবীতে পড়ে তা ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে স্পষ্টই রয়েছে—

'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ
খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি'

আকর্ষণ শক্তিসম্পন্না পৃথিবী যখন আকাশস্থ (উপরিস্থিত) গুরু বস্তুকে নিজ শক্তি দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তখন মনে হয় যেন ঐ সকল বস্তু পড়ছে—অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তারা পড়ছে না, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির জোরেই পৃথিবীতে আসছে। উপরে শ্লোকের তিন লাইন দেওয়া হয়েছে, চতুর্থ লাইন এই: 'সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে'—সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এমন অবস্থায় পৃথিবী আকাশে কোথায় পড়বে। এর অর্থ এই যে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই কেউ নিজ কক্ষচ্যুত হয় না।

হিন্দু প্রতিভা অঙ্কশাস্ত্রে যেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রে ততখানি না হলেও, খুব কম কৃতিত্বও দেখায়নি। চিকিৎসাবিজ্ঞান ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল, ঋগ্বেদেই ব্যবসায়ী চিকিৎসকদের উল্লেখ আছে। বর্তমানে চরক ও সুশ্রুত এই দুটিই কবিরাজদের প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থ। কিন্তু চরকের সময় আরো কবিরাজদের পুস্তক চলতি ছিল—চরকই বিশেষ করে অগ্নিবেশ অবলম্বনে লিখিত। চরক পড়লে মনে হয় যে

সেকালে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত চিকিৎসকদের সম্মিলনী হত এবং সেই সম্মিলনীর সিদ্ধান্ত সমূহ চরকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাকট্রিয়া থেকেও চিকিৎসকরা এসে সে সম্মিলনীতে যোগ দিতেন। সম্মিলনী গান্ধার দেশে বসত। তক্ষশীলা খুব প্রাচীনকাল থেকেই চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সম্মিলনী তক্ষশিলায় হওয়াও অসম্ভব নয়। যেখানেই হোক হিমালয়ের কাছেই সম্মিলনী বসত। চরক ও সুশ্রুত কোন সময়ে লেখা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সিলভাঁ লেভী পঞ্চম শতাব্দীর চৈনিক ত্রিপিটক থেকে চরক নামে একজন চিকিৎসক কনিষ্কের সভায় ছিলেন এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। ফলে অনেকে সিদ্ধান্তও করেছেন যে চরক কনিষ্কের সমসাময়িক এবং প্রথম শতাব্দীর লোক। চারশত বৎসর পরের একখানা চীনদেশীয় বইয়ে ভূল থাকা অসম্ভব নয়, যদি তা না হয়েও থাকে তবু চরক নামে একজন চিকিৎসক কনিষ্কের সভায় ছিলেন, তা থেকেই সিদ্ধান্ত করা চলে না যে তিনিই চরকসংহিতা প্রণেতা বিখ্যাত চরক। উপরোক্ত ত্রিপিটকে বর্ণিত চরকই যে বিখ্যাত চরক তার কোনো প্রমাণ নেই। চরকের নাম পাণিনির সূত্রে উল্লেখ আছে, এমন কি বৈদেশিক সাহিত্যেও চরকের নাম পাওয়া যায়। এই সমস্ত বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করে প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিন্দু রসায়নের ভূমিকায় এই মত ব্যক্ত করেছেন যে চরক প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের। আমি এই মতই যুক্তিযুক্ত মনে করি।

সুশ্রুতের বর্তমান সংস্করণ নাগার্জুন কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। হয়ার্নলে ও বিউহ্লার সুশ্রুতকে পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলে মনে করেন। কাত্যায়নের বার্তিকে সুশ্রুতের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সুশ্রুতই যে প্রসিদ্ধ সুশ্রুত একথা নিশ্চিত বলা চলে না। যদি তা হয় তবে সুশ্রুত খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর লোক। সুশ্রুতের কাল সম্বন্ধে এখনও নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে এ যে চরকের পরে রচিত হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

চরকে অস্ত্র-চিকিৎসার কথা নেই, সুশ্রুতে বিশেষ করে সেই কথাই আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের কবিরাজদের মধ্যে অস্ত্র-চিকিৎসা বহুদিন পূর্বে লোপ পেয়েছে। প্রাচীনকালে শব-ব্যবচ্ছেদ প্রত্যেক কবিরাজী শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে ছিল, কিন্তু সেই কাজ হাতে

কলমে করলে পর জাতি-ধর্ম নষ্ট হবে এই বিশ্বাস কিছুদিন আগে অনেক লোকের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাই প্রথম যখন কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয় তখন শব-ব্যবচ্ছেদ করার জন্য ছাত্রের অভাব হয়েছিল। শুধু যে অস্ত্র-চিকিৎসা চলিত ছিল তা নয়, এ বিদ্যায় তাঁরা বেশ পারদর্শীও ছিলেন। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে আধুনিক ইউরোপ তাঁদের কাছ থেকে অস্ত্রোপচার করে নাকের গড়ন ভালো করার প্রণালী (Rhinoplasty) শিক্ষা করেছে। অর্শ, পাথুরী ও ভগন্দর রোগে অস্ত্র করার কথা সুশ্রুতে আছে। সাধারণ ভাবে সন্তান প্রসব না হলে প্রসব করানো এবং অস্ত্রোপচার দ্বারা জরায়ু থেকে সন্তান বের করার প্রণালী হিন্দু কবিরাজরা জানতেন। এ সবের ফলে ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছিল। চরকে আছে গর্ভসঞ্চারের পর তিন মাসে মাথা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সূচনা আরম্ভ হয়, ছয় মাসে হাড়, গ্রন্থি, নখ, ও চুল স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অস্ত্রোপচারে ১২৭ রকমের যন্ত্র ব্যবহৃত হত। এ সমস্ত তাঁরা বেশ দক্ষতার সঙ্গে তৈরি করতেন। একটি চুলকে লম্বালম্বি ভাবে কাটতে পারে এমনি ধাতু নির্মিত চকচকে ও ঝকঝকে খুব ধারাল অস্ত্র ভালো অস্ত্র বলে বিবেচিত হত। এ তাঁদের রাসায়নিক জ্ঞানের উৎকর্ষের পরিচয় দেয়।

অস্ত্র-চিকিৎসকদের লক্ষণ এরকম দেওয়া আছে: যে অস্ত্র-চিকিৎসকের বল, ক্ষিপ্রকারিতা, তীক্ষ্ণ অস্ত্র, পরিশ্রমে ঘর্মহীনতা, অস্ত্রের কম্পনরাহিত্য, এবং ব্রণের পকাপক্কাদি অবস্থা নিরূপণে জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তি অস্ত্রচিকিৎসা কার্যে প্রশস্ত বলে জানবে।' অস্ত্রোপচার সেকালে বড়ই বিপজ্জনক ছিল। অনেক সময়ে অস্ত্রোপচারের আগে লোক আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিত।

প্রাচীনকালে কায়-চিকিৎসায় হিন্দু কবিরাজদের খুবই কৃতিত্ব ছিল। যে সব ব্যাধি গ্রীক চিকিৎসকরা আরোগ্য করতে পারতেন না সে সব আরোগ্য করার জন্য সম্রাট আলেকজাণ্ডার তাঁর শিবিরে ভারতীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে বাগদাদের খলিফা হারুন-অল-রশীদের রাজত্বের সময় তাঁর চিকিৎসার জন্য ভারতবর্ষ থেকে মানকা নামক একজন চিকিৎসক গিয়েছিলেন। হিন্দু চিকিৎসকরা শুধু আরবে নয় মিশর দেশ পর্যন্ত চিকিৎসা করতে যেতেন।

অধ্যাপক জাচাউ আলবিরুনীর পুস্তকের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন

'আরবে হিন্দুজ্ঞানের আর এক প্রবাহ হয়েছিল হারুনের (৭৮৬-৮০৮ খৃষ্টাব্দ) অধীনে। বারমাক নামক মন্ত্রীপরিবার তখন প্রভূত ক্ষমতাশালী ছিল। তাঁরা পারিবারিক সংস্কারের বশবর্তী হয়ে ভৈষজ্য ও নিদান শিক্ষার জন্য ছাত্রদের ভারতবর্ষে পাঠাতেন। এ ছাড়া হিন্দুপণ্ডিতদের (চিকিৎসকদের) বাগদাদে এনে হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁদের ভৈষজ্য, নিদান, বিষতত্ত্ব, দর্শন, গ্রহফল গণনাবিদ্যা বিষয়ক সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে অনুবাদ করতে আদেশ কবেছিলেন। এই সময়ের হিন্দু কবিরাজদের মধ্যে বাগদাদের বারমাকদের হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে ইবনধনের (ধনের পুত্র) নাম পাওয়া যায়।' শুধু আরববাই যে হিন্দুদের কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেছে তা নয়। ইউবোপে হিপোক্রেটিস্‌কে চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্মদাতা বলা হয় কিন্তু তাঁর ঔষধের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্বন্ধীয় পুস্তক হিন্দুদের কাছ থেকে ধার করা। হিন্দুরাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্মদাতা। ডাক্তার ওয়াইজ তাঁর চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিহাসের আলোচনায় লিখেছেন 'প্রথম চিকিৎসা প্রণালী আমরা হিন্দুদেব কাছ থেকেই পেয়েছি।'

হিন্দুদের চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত পুস্তকে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, শারীর সংখ্যান বিদ্যা প্রভৃতি সব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে—যদিও তা আধুনিক যুগের তুলনায় স্থূল রকমের। বিভিন্ন প্রকারের গাছ, লতা, গুল্ম প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত না হলে এবং তাদের গুণাগুণ না জানলে কারুর পক্ষে কবিরাজ হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

সুশ্রুতের মতে উদ্ভিদ চতুর্বিধ: 'বনস্পতি, বৃক্ষ, গুল্ম ও ওষধি। তাদের মধ্যে ফুলহীন ফলবানগুলিকে বনস্পতি, যাদের ফুল ফলবান হয় সেগুলিকে বৃক্ষ, যেগুলি লতা সংযুক্ত শাখা পল্লবিত ঝোপের মতো সেগুলিকে বীরুধ বা গুল্ম এবং যেগুলি ফল জন্মে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকে সেগুলিকে ওষধি বলে।'

প্রাণীদের চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে: জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। যদিও এ রকম ভাগ বাহ্যিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই হয়েছে তবু এ থেকে তাঁদের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞানের এবং বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। চার ভাগে ভাগ করেই যে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন তা নয়, বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদের পাতা, শিকড়, ফুল ও ফলের গুণাগুণ, কোনটি বিষাক্ত,

কোনটি কোন রোগ আরোগ্যকারক, কোনটিকে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় এ সব বিষয়ে তাঁরা বেশ জ্ঞান লাভ করেছিলেন। চরকে আছে 'এরণ্ডস্ত বিরেচনে'—এরণ্ড তেল বিরেচনে শ্রেষ্ঠ। কুচিলা প্রভৃতি তেরো রকম কন্দ বিষের নাম সুশ্রুতে আছে। এবং বিষ খেলে পিপুল, যষ্টিমধু, মধু, চিনি, আখের রস প্রভৃতি খাইয়ে বমি করানোর ব্যবস্থাও-রয়েছে।

প্রাণীদের সম্বন্ধেও পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের নিদর্শন সুশ্রুতে পাওয়া যায়। নানা রকমের সাপ, তাদের কোনটির বিষ কি রকম ক্ষতিকর, কোন বয়সের সাপের বিষ কি রকম এবং স্ত্রীপুরুষ ভেদেই বা বিষাক্ততাব কতটা পার্থক্য ইত্যাদি সব জিনিসের বর্ণনা রয়েছে। আঠারো রকমের ইঁদুর, এবং তাদের প্রত্যেক রকমের বিষেব লক্ষণ ও সেই বিষের চিকিৎসাব উল্লেখ আছে। পাঁচ রকমের গোধা, আট রকমের ব্যাঙ, ছয় রকমের পিপীলিকা, ছয় বকমের মক্ষিকা, পাঁচ রকমের মশা, আঠাবো রকমের জলৌকার (জোঁক) বর্ণনাও আছে। ঐ আঠারো বকমেব জলৌকা সব ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না, অন্য দেশ থেকে সংগ্রহ করা হত। মশকদংশন যে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ তাও সুশ্রুতে আছে। এসব হিন্দু কবিরাজদের প্রাণীবিদ্যার গভীরতার পরিচয় দেয়। সর্পাঘাতের চিকিৎসাও হিন্দু কবিরাজেরা খুব দক্ষতার সঙ্গেই করতেন। সুশ্রুতেব মতে 'আচুষণচ্ছেদদাহাঃ সর্ব্বত্রৈব তু পূজিতাঃ'—অর্থাৎ চোষণ, ছেদন করে রক্ত বের করা এবং আগুন দিয়ে (ক্ষতস্থান) পুড়িয়ে দেওয়া —এই তিন রকমের কাজ সব রকম সর্পাঘাতে প্রশস্ত। মোট কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানে পুরাকালে হিন্দুরা শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং তাঁরাই এ বিষয়ে জগতের প্রথম শিক্ষাদাতা।

রসায়নশাস্ত্রেও হিন্দুরা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। প্রায় সব দেশেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের জন্য রসায়নের উন্নতি হয়। এখানেও তা হয়েছে। এ ছাড়া ফলিত রসায়নেও হিন্দুদের কৃতিত্ব মহিমাময়। প্রাকৃতিক রঙ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আর্থার জর্জ পার্কিন তাঁর ঐ বিষয়ক পুস্তকে (The Natural Organic Colour Matters) লিখেছেন যে নীল ও মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা সূতা পাকা-নীল ও লাল রঙ করার প্রণালী ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল থেকে চলতি ছিল। রাগ-বন্ধনীর সাহায্যে মঞ্জিষ্ঠা দিয়ে পাকা লাল রঙ করার প্রণালী ভারতবর্ষেই প্রথম আবিষ্কৃত হয়। নীলের পাতা থেকে নীল রঙ করার প্রণালী

এবং রাগ-বন্ধনীর আবিষ্কারও হিন্দুদেরই। এ ভাবেই সূতা পাকা রঙ করে তারা দেশ-বিদেশ থেকে বহু অর্থ উপার্জন করত।

বৈদিকযুগে হিন্দুরা সোনার অলঙ্কার ধারণ করত, এবং সে সময়ে মুদ্রারও ব্যবহার ছিল। লোহা বৈদিকযুগে ছিল কিনা সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। হিন্দুরা প্রথম সোনা আবিষ্কার করে এবং লোহার যৌগিক পদার্থ থেকে লোহা তৈরীর প্রণালীও অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে সোনা, রূপা, লোহা, টিন ও সীসা এই পাঁচ ধাতুর উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সোনা, রূপা, তামা, লোহা, টিন, সীসা ও পারদের নাম রয়েছে। শুধু তাই নয় ধাতু প্রস্তুত বিষয়ে তখন সরকারের একচেটিয়া অধিকার ছিল। আকরাধ্যক্ষ তামা ও অন্যান্য খনিজপদার্থসম্বন্ধীয় শাস্ত্রে, পারদ পাতনে ও মণিরত্ন পরীক্ষায় পারদর্শী ('শুল্বধাতু শাস্ত্র রসপাক মণিরাগজ্ঞ') ছিলেন। অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগেই হিন্দুরা খনিজ-পদার্থের এবং ঐ সমস্ত পদার্থ থেকে ধাতু প্রস্তুতের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছিল। লোহা প্রস্তুত বিষয়ে হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। আজও দিল্লীর কুতবমিনারের সন্নিকটবর্তী লৌহস্তম্ভ হিন্দুদের অতীত জ্ঞানের সাক্ষ্য দিচ্ছে। লোহা গালাই করে অত বড় স্তম্ভ তৈরি করা ইউরোপ আধুনিক কালেই শিখেছে। ভারতবর্ষে দেড় হাজার বছর আগে তা সম্ভব হয়েছিল। এত কাল রৌদ্রবৃষ্টি পেয়েও ঐ স্তম্ভে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি।

গত একশো বছরের মধ্যে রসায়নবিজ্ঞানে অতি দ্রুত উন্নতি সত্ত্বেও ইউরোপ বা আমেরিকার কোনো বৈজ্ঞানিক এরকম লোহার সামান্য পরিমাণও তৈরি করতে পারেননি। শুধু লোহা নয়, রসার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থে অন্য ধাতু প্রস্তুত করবার যে প্রণালীর উল্লেখ আছে, তা পড়লে বাস্তবিকই মন শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর হিন্দু রসায়নের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ধাতু প্রস্তুতের প্রণালীসমূহ যা শেষোক্ত পুস্তকে (রসার্ণবে) বর্ণিত হয়েছে তার উপরে খুব কমই উন্নতি সাধন করা যায় এবং সেই প্রণালী-সমূহকে আধুনিক রসায়নবিজ্ঞানের যে কোনো পুস্তকে হুবহু উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

সুশ্রুত থেকে ভালো অস্ত্রের যে বর্ণনা দিয়েছি তাতে হিন্দুরা যে খুব ভালো ইস্পাত তৈরি করতে জানত তার প্রমাণ মেলে। সুশ্রুতে গাছপালার ছাই

থেকে উগ্রক্ষারের (caustic alkali) প্রস্তুত প্রণালী এবং উগ্রক্ষারকে যে লোহার পাত্রে রাখতে হয় সে নির্দেশও আছে। রাসায়নিক জ্ঞান যে সে সময়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল এ তারই পরিচয়। ফরাসী রাসায়নিক বার্থেলো সুশ্রুতের প্রণালী পড়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেছিলেন নিশ্চয়ই সুশ্রুতের সময়ে হিন্দুরা এটা জানত না—ইউরোপীয় রাসায়নিকদের সংস্পর্শে আসার পর তারা ঐ জ্ঞান লাভ করে সুশ্রুতে তার স্থান দিয়েছে। কিন্তু বার্থেলোর এই উক্তির পিছনে একমাত্র যুক্তি—হিন্দুদের পক্ষে ঐ সময়ে রসায়নশাস্ত্রের ঐরকম জ্ঞান থাকা সম্ভবপর নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপ তখনও যা পারেনি ভারতবর্ষে যে তা সম্ভবপর হতে পারে, এ তাঁর পক্ষে কল্পনাতীত। এটিও একটি ইউরোপীয় গর্বান্ধতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুশ্রুতের পরে লেখা বাগভট্ট ও চক্রপাণিদত্তের পুস্তকে উগ্রক্ষার প্রস্তুতের প্রণালী আছে, অবশ্য তাঁরা এ বিষয়ে সুশ্রুতের কাছে ঋণী।

হিন্দু রাসায়নিকদের মধ্যে নাগার্জুনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি পাতন ও জারণ (distillation and calcination) প্রক্রিয়া আবিষ্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। কিন্তু তিনি কৌটিল্যের পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাজেই তিনি পাতন প্রক্রিয়া আবিষ্কারেব জন্য প্রসিদ্ধ হলেও আসলে তাঁর আগেই পাতন প্রক্রিয়া জ্ঞাত ছিল। কজ্জলী নামক পারদ ও গন্ধকের যৌগিক পদার্থকে আভ্যন্তরিক ঔষধরূপে ব্যবহার নাগার্জুনের কীর্তি। এখানে একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যায় রাসায়নিক জ্ঞানের প্রয়োগ এবং আভ্যন্তরীণ ঔষধ হিসাবে পারদের যৌগিক পদার্থের ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দীতে প্যারাসেল্‌সাস্ নামক রাসায়নিকের দ্বারা হয়েছিল। রসরত্নাকর নামক গ্রন্থ নাগার্জুনের রচনা বলে অনেকের ধারণা। পাতন প্রক্রিয়া দ্বারা হিঙ্গুল থেকে পারদ এবং মাক্ষিক (Copper Pyrites) থেকে তামা ও রসক (Calamine) থেকে দস্তা প্রস্তুত করবার প্রণালী রসরত্নাকরে আছে। নাগার্জুন কোন সময়ের লোক তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। কেউ কেউ মনে করেন তিনি সম্রাট কনিষ্কের সমসাময়িক লোক, অতএব তিনি প্রথম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। রাসায়নিক নাগার্জুন আর মহাযান সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নাগার্জুন একই ব্যক্তি কিনা একথাও নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না।

ঐতিহাসিক প্লিনি প্রথম শতাব্দীতে লিখে গেছেন যে জগতে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাচ তখন ভারতবর্ষে তৈরি হত। 'তক্ষশিলার নিকটবর্তী স্থানসমূহের মৃত্তিকাগর্ভ থেকে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয় যে মৌর্য-রাজত্বের পূর্বেই কাচ-প্রস্তুতের প্রণালী খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল' (কুমারস্বামী)। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাচের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন রকমের ধাতু দিয়ে যে অগ্নিশিখায় বিভিন্ন রঙ হয় রসার্ণবে তার উল্লেখ আছে—তামা, টিন ও সীসা যথাক্রমে অগ্নিশিখাকে নীল, কপোত ও মলিনবর্ণ করে। রসার্ণব দ্বাদশ শতাব্দীতে লেখা। রসার্ণবে শুধু যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে তা নয়, সে সময়ে যে সব যন্ত্র ব্যবহৃত হত সেগুলিরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। রসার্ণবের কিছু পরে লেখা রসরত্ন-সমুচ্চয়ে কি রকম জায়গায় রসায়নাগার প্রস্তুত করতে হবে এবং কোথায় কোন যন্ত্র রাখতে হবে তার নির্দেশ রয়েছে। এ সমস্তই হিন্দুদের রাসায়নিক জ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেয়।

পদার্থ বিজ্ঞানে কোনো জাতিই প্রাচীনকালে খুব বেশি উন্নতিলাভ করতে পারেনি। যদিও অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা বা রসায়ন বিজ্ঞানের মতো এ শাস্ত্রে হিন্দু প্রতিভাব বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না তবুও তাপ, কিরণ, শব্দ ও চৌম্বিক শক্তি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান তাদের ছিল। তারা কাচ থেকে বৃত্ত ও বর্তুল তাল (spherical and oval lenses) তৈরি করতে জানত। তালেব সাহায্যে সূর্য-কিরণ কেন্দ্রীভূত করে তারা কাগজ বা খড়ের মতো সহজ দাহ্য পদার্থে আগুন লাগাত। আলোকরশ্মির বক্রণ ও প্রতিফলন সম্বন্ধে তাদেব বেশ জ্ঞান ছিল।

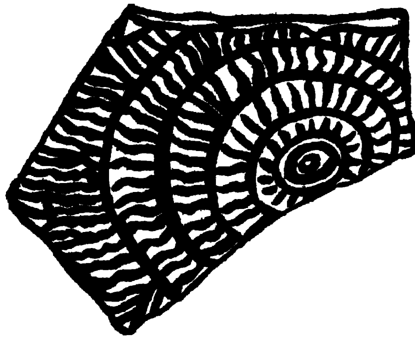
শব্দবিজ্ঞান সম্বন্ধে ন্যায়-বৈশেষিক ও মীমাংসাদর্শনে অনেক তত্ত্ব রয়েছে। তার ব্যবহারিক প্রয়োগ সরঙ্গধর প্রণীত সঙ্গীত-রত্নাকর (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) ও পরবর্তীকালে লেখা সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকে রয়েছে। জাভা-যাত্রী জাহাজে দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য মচ্ছ-যন্ত্রের ব্যবহারের কথা রাধাকুমুদ মুখার্জী উল্লেখ করেছেন।

হিন্দুরা বৎসরের বৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য বৃষ্টিপরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করত। বিভিন্নপ্রকারের মেঘ এবং বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য বিষয়ও তারা পর্যবেক্ষণ করত এবং আবহাওয়াবিজ্ঞান সম্বন্ধেও যে তাদের মোটামুটি জ্ঞান ছিল তার

স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায়, সীতাধ্যক্ষ্য (কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ) ভারতবর্ষের কোন জায়গায় কত বৃষ্টিপাত হয় তার পরিমাপ করতেন, কারণ বৃষ্টির পরিমাণ বুঝে কোন শস্য বপন করতে হবে তা ঠিক করা হত।

কৌটিল্য পড়লে একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও তখন খুব উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল এবং এই উন্নতি দীর্ঘকালব্যাপি ক্রমোন্নতির ফল। অর্থাৎ হিন্দুরা অতি প্রাচীনকালেই বিজ্ঞানে প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। বিজ্ঞানের সব দিক বিচাব করতে গেলে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দুরা সমসাময়িক জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। তাদের মনোবৃত্তিও ছিল সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক।





চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দর্শন

ষড়্‌দর্শন—সংস্কৃত 'দর্শন' শব্দের অর্থ মোক্ষশাস্ত্র। অতএব এ শব্দ ইংরেজী ফিলজফি শব্দের সঙ্গে একার্থবাচক নয়। ন্যায়, বৈশেষিক, সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা এই ছয় প্রসিদ্ধ হিন্দুদর্শন। এদের প্রণেতা যথাক্রমে গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বাদরায়ণ বা ব্যাস। এই সমস্ত দর্শনেরই মূল উদ্দেশ্য জীবের মোক্ষলাভ—অবশ্য সেই অবস্থাকে বিভিন্ন দর্শনে নিঃশ্রেয়স, মোক্ষ, মুক্তি, কৈবল্য, অপবর্গ প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কিন্তু পথ ভিন্ন। উপরোক্ত মনীষীরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে পথ নির্দেশ করেছেন, কাজেই পথ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই সমস্ত দর্শনই আত্মার অস্তিত্বে ও পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস করে এবং বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে। মীমাংসাদ্বয় একান্তভাবে শ্রুতিনির্ভরশীল।

জৈমিনির মতে উপনিষদ শ্রুতি পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু উপনিষদই ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তি। তাঁর মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্মদ্বারাই জীবের কাম্য বা স্বর্গসুখ লাভ হয় এবং তাই পরম পুরুষার্থ, মুক্তি ও অমৃত, এবং তার অতিরিক্ত অন্য কোনো অমরত্ব বা মোক্ষ নেই। জৈমিনি ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না, কারণ বেদোক্ত কর্মসমূহ আপনি ফলপ্রসূ, ঈশ্বর সাপেক্ষ নয়।

ব্রহ্মসূত্র বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির ফল স্বীকার করে, এবং তা নিম্নস্তরের হলেও ঈশ্বর বা ব্রহ্মই সেই কর্মফল প্রদান করেন। ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই জীবের মুক্তি বা মোক্ষ। ন্যায়, বৈশেষিকাদি একান্ত শ্রুতিনির্ভরশীল নয়, এবং নির্দোষ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে তত্ত্বনির্ণয়ে যত্নবান, যদিও বেদকে প্রামাণ্য বলে সকলেই স্বীকার করে। ন্যায়, বৈশেষিক ও পাতঞ্জল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী। তবুও উপরোক্ত ছয় দর্শনই আস্তিক দর্শন বলে খ্যাত।

মনুর মতে বেদনিন্দুকরাই নাস্তিক, এবং যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করেন অর্থাৎ বেদোক্ত পরলোকেব অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা আস্তিক। বাঙলা-দেশে সাধারণত ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীকেই নাস্তিক বলা হয়। এটাই যুক্তিযুক্ত। সাংখ্য বেদকে মানে বটে, কিন্তু বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির দ্বারা যে স্বর্গসুখ লাভ হয় তাও পার্থিব সুখের মতো দুঃখযুক্ত ও অনিত্য এই মত পোষণ করে। কারণ যাগ মাত্রই হিংসাসাধ্য। হিংসাযুক্ত কার্যকলাপ কি করে আত্যন্তিক সুখ উৎপন্ন করবে! পাতঞ্জলও দৃষ্ট (পার্থিব) এবং অণুশ্রবিক (বেদোক্ত স্বর্গাদি) সুখভোগের কামনা ত্যাগকে উচ্চস্তরের বৈবাগ্য আখ্যা দিয়েছে।

পতঞ্জলির মতে যোগসিদ্ধির বিশিষ্ট উপায় আট প্রকার। যম প্রথম। যমের প্রথম অঙ্গ অহিংসা। অথচ বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সমস্তই হিংসামূলক। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শঙ্কর ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর অন্যান্য গুণের মধ্যে ঐহিক এবং পারলৌকিক সকল প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা ত্যাগের নির্দেশ করেছেন। ন্যায় দর্শনেও অপবর্গলাভের নিমিত্ত 'যম' ও 'নিয়মে'র দ্বারা আত্মসংস্কার করার কথা আছে। ন্যায়, বৈশেষিক, পাতঞ্জল, পূর্ব ও উত্তরমীমাংসা এই কয় দর্শনে সংযমের স্থান খুবই উঁচুতে। গৌতমের মতে রাগ দ্বেষ ও মোহ এই তিন দোষ সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সচেষ্ট হওয়া সকলের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। বৈশেষিক মতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য নিষ্কাম কর্মের অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। যোগশাস্ত্র তো সংযমের ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করের মতে শমদমাদি সাধনসম্পদ ব্রহ্মজ্ঞান অধিকারীর গুণের মধ্যে। বেদোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম করা এবং নিষেধাত্মক কর্ম না করা জৈমিনির মত। এও একপ্রকার সংযম। কিন্তু সাংখ্য মতে সংযমের কোনো উল্লেখ নেই, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলেই মুক্তি বা মোক্ষ।

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মা বহু। জীবাত্মা যদি এক হয় তবে একের কর্মফল অন্যকে ভোগ করতে হয়। কিন্তু তা যুক্তিবিরুদ্ধ। সাঙ্খ্য পাতঞ্জলও জীবাত্মা বহু বলেই মনে করে। পূর্বমীমাংসার মতেও জীবাত্মা বহু, কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, অতএব জীবাত্মার পৃথক সত্তাও নেই, বহুত্বও নেই। ন্যায় মতে আত্মা অনুমানসিদ্ধ। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা-দ্বয় শ্রুতিকেই প্রমাণ বলে গ্রহণ করে, সেজন্য তারা অন্য কোনো যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেনি।

ন্যায়মতে কার্য ভিন্ন কারণ হয় না। সাঙ্খ্যমতেও তাই। কিন্তু কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে উভয়ের ধারণা পৃথক। সাঙ্খ্যমতে কার্য ও কারণ বস্তুত অভিন্ন। কারণে যা আছে তাই কার্যরূপে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। সূতায় কাপড়ত্ব আছে বলেই সূতা থেকে কাপড় হয়, লোহা থেকে হয় না। এটা সাঙ্খ্যের সৎকার্যবাদ—যার মর্ম যা ছিল তাই হয়েছে। ন্যায়মতে কার্য ও কারণ ভিন্ন, অভিন্ন নয়। সূতা কাপড় নয়, সূতাই। সূতা দিয়ে কাপড়ের কাজ হয় না। তাঁতি যখন যন্ত্রাদির সাহায্যে সূতাকে কাপড়ে পরিবর্তিত করে তখন আর সে সূতা থাকে না—সূতা থেকে পৃথক বস্তু কাপড়ে পরিণত হয়। ন্যায় অসৎ-কার্যবাদী অর্থাৎ যা ছিল না তা উৎপন্ন হয়েছে, কিন্তু কোনো এক জিনিস থেকে উৎপন্ন হয়েছে—শূন্য থেকে নয়, এই মতের পরিপোষক।

ন্যায় মতে ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা। কিন্তু তিনি নিমিত্তকারণমাত্র, পরমাণুপুঞ্জ থেকে জগৎ সৃষ্টি করেন। পরমাণুবাদ বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব। গৌতম ন্যায়দর্শনে কণাদের পরমাণুবাদ মেনে নিয়েছেন। সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর অসিদ্ধ। প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগেই জগৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়। সাঙ্খ্যও ন্যায়ের মতোই আপ্তবাক্য প্রমাণ বলে স্বীকার করে। আপ্তবাক্য প্রমাণ এ কথা মেনে নিলে ঈশ্বর অসিদ্ধ একথা বলা বাস্তবিকই অযৌক্তিক। বাদরায়ণের মতে ব্রহ্ম থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়, কিন্তু ব্রহ্ম শুধু নিমিত্ত কারণ নয়, নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই কারণ।

ন্যায়মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলো পদার্থের জ্ঞান হলেই নিঃশ্রেয়স লাভ হয়, বৈশেষিক মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি ষট্পদার্থের জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স লাভ। সাঙ্খ্য মতে প্রকৃতিপুরুষ প্রভৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞানই মোক্ষ। পাতঞ্জল মতে চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধই কৈবল্য লাভের উপায়। পূর্বমীমাংসা

মতে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গসুখ লাভ হয় এবং তাই মোক্ষ। ব্রহ্মসূত্র মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই জীবের মুক্তি।

ন্যায়মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম বা শব্দ (আপ্তবাক্য) এই চার রকমের প্রমাণ। বৈশেষিক মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ। উপমান ও শব্দ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রমাণ তিন রকমের: প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, উপমান অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। গৌতম উপমান বা শব্দকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন।

এই সমস্ত দর্শন কখন রচিত হয়েছে তা নির্ণয় করা একরকম অসম্ভব। এগুলি সব-ই সূত্রাকারে লেখা। সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হওয়ার অনেক আগে থেকেই দর্শনে উল্লিখিত এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা পণ্ডিতসমাজে দীর্ঘকাল প্রচলিত থাকা খুবই সম্ভবপর ও স্বাভাবিক।

ধর্মের অধ্যায়ে বলেছি, গীতায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ আছে এবং গীতা ও ব্রহ্মসূত্র একজনের রচিত হওয়া সম্ভবপর, অতএব গীতার মতো ব্রহ্মসূত্রও প্রাগ্‌বৌদ্ধ-যুগে রচিত। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধমত খণ্ডনও রয়েছে। তা যে প্রক্ষিপ্ত একথা বলার পক্ষেও উপযুক্ত প্রমাণ নেই। কাজেই কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছানো অসম্ভব। এই ছয় দর্শনের মধ্যে কোনটি আগে এবং কোনটি পরে রচিত তা নির্ণয় করাও দুরূহ। ব্রহ্মসূত্রে বহুবার জৈমিনির উল্লেখ আছে, সাংখ্য পাতঞ্জল ও বৈশেষিক মতের খণ্ডন রয়েছে। আবার সাংখ্যেও ব্রহ্মসূত্র প্রতিপাদ্য মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি রয়েছে এবং বৈশেষিকদের প্রতি কটাক্ষ আছে। জৈমিনিও বাদরায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন। পাতঞ্জল সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ তত্ত্ব মেনে নিয়েছে। ন্যায়দর্শনে যোগের উল্লেখ আছে, সাংখ্য মতবাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এসবই সম্ভবপর হয় যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় যে এই সমস্ত দার্শনিক সমসাময়িক ছিলেন এবং একে অন্যের মতবাদ জানতেন। কিন্তু সেরকম সিদ্ধান্ত করাও অসম্ভব। তাই মনে হয় এই সমস্ত দর্শনের মধ্যে পরবর্তীকালে কোনো কোনো জিনিস স্থান পেয়েছে, ফলে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে।

গীতায় 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং' অর্থাৎ সাংখ্যদের জ্ঞানযোগের দ্বারা শ্রেষ্ঠ পদলাভের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখানে 'সাংখ্যানাং' বলতে সাংখ্যমতাবলম্বীদের

কথা বলেছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গীতা সাঙ্খ্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবাদ যে বেশ নিজস্ব করে নিয়েছে তা সুস্পষ্ট। সাঙ্খ্যমত গীতা রচিত হওয়ার পূর্বে সুপ্রচলিত থাকা সম্ভবপর। আমার মনে হয় এই সমস্ত দর্শনেরই মূল ভিত্তি প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের।

এখন আমি প্রত্যেক দর্শন সম্বন্ধেই সংক্ষেপে কিছু বলব।

ন্যায়—বলতেই বাঙলা দেশে অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁদর মতে ন্যায় অর্থ তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল, এই নিয়ে নিবর্থক বাদানুবাদ। যদিও নব্যন্যায় শেষের দিকে অনেকটা সেই অবস্থায়ই এসে পৌছেছে তবুও একথা ভুললে চলবে না যে ন্যায়দর্শনে যুক্তি-তর্কেব সাহায্যে মানুষের পবম-পদ লাভেব কথাই রয়েছে। ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা মেধাতিথি গোতম বা গৌতম। তাঁর অপব নাম অক্ষপাদ। সতীশ বিদ্যাভূষণেব মতে গৌতম ও অক্ষপাদ এক ব্যক্তি নন, উভয়ের জন্মস্থানও ভিন্ন এবং অক্ষপাদ গৌতমের কয়েক শত বৎসর পবে জন্মেছেন। দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ, ফনিভূষণ তর্কবাগীশ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উভয়কে এক ব্যক্তি মনে করেন এবং এটাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বাকোবাক্য' বা তর্কশাস্ত্রের এবং মহাভারতে ন্যায়দর্শনের প্রতিপাদ্য পঞ্চাবয়ববিদ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্রেব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ভাসের প্রতিমা নাটকে। অতএব গৌতমেব ন্যায়শাস্ত্র যে ভাসেব পূর্ববর্তী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি ন্যায়মতে প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোলো পদার্থের জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়। এটাই প্রাচীন বা গৌতম প্রণীত ন্যায়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও আগম বা শব্দ এই চার রকমের প্রমাণ। নব্যন্যায় শুধু এই চার রকমের প্রমাণ নিয়েই আলোচনা। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মিথিলা নিবাসী গঙ্গেশ উপাধ্যায় নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। তাঁর পুস্তকের নাম তত্ত্বচিন্তামণি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাসুদেব সার্বভৌম বাঙলায় এই পুস্তকের অধ্যয়ন প্রবর্তন করেন, এবং বিশেষভাবে তাঁর শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণির প্রচেষ্টায় বাঙলায় নব্যন্যায় সুপ্রচলিত হয়। সেই সময় বাঙলায় নবদ্বীপ ছিল নব্যন্যায় শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র। তত্ত্বচিন্তামণি খুবই পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক। শুধু বাঙলা নয় মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র এবং কাশ্মীরে তা সুপ্রচলিত হয় এবং ক্রমে

সমস্ত ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করে। বৌদ্ধ ও জৈন পণ্ডিতদের বিশেষ করে সুপণ্ডিত বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগের বিচার ও আলোচনা নব্যন্যায় প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। (ন্যায়শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে গঙ্গেশের পূর্ববর্তী, বাৎস্যায়ন, বাচস্পতি মিশ্র, উদয়ন, জয়ন্ত ও ভাসর্বজ্ঞ প্রভৃতি হিন্দু নৈয়ায়িকদের দান যথেষ্ট।)

চার রকমের প্রমাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সব চেয়ে বলবান। কোনো বিশ্বাসী লোকও যদি কোনো জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো কথা বলেন, তবু যতক্ষণ পর্যন্ত তা প্রত্যক্ষ না হয়, ততক্ষণ মনের গোপন কোণে যেন একটা অসন্তোষের ভাব রয়ে যায়, এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে আর কোনো রকমের দ্বিধা বা সংকোচ থাকে না, মন পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়। গৌতমের মতে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বাহ্য বিষয়েব সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে তাব নাম প্রত্যক্ষ জ্ঞান—কিন্তু সে জ্ঞান অব্যভিচারী ও ব্যবসায়াত্মক হওয়া চাই, অর্থাৎ প্রথম জ্ঞানকালে যেরকম অনুভূত হয় পরেও সেরকম হওয়া চাই এবং তা—এই কি এই নয়—এমন সংশয়যুক্ত হতে পারবে না। গৌতম আরো বলেছেন যে আত্মা ও মনেব সন্নিকর্ষেব অভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। গঙ্গেশের মতেও চক্ষু প্রভৃতি পাঁচ ইন্দ্রিয়ের কোনো না কোনোটি, বস্তু, মন এবং আত্মাব সংযোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মানুষ যদি অন্যমনস্ক বা গভীব চিন্তায় মগ্ন থাকে তাহলে চোখের সামনে যে সব ঘটনা ঘটে যায় বা বিভিন্ন লোকে যে সমস্ত কথা বলে, তা তার অনুভূতির বিষয় হয় না, এ প্রায় সকলেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। আমার মন যখন চোখের পিছনে পুরোপুরি থাকে তখনই চোখ একটি লাল জবা ফুল ঠিকঠিকভাবে দেখতে পারে এবং তখনই আমি উপলব্ধি করি 'আমি একটি লাল জবা ফুল দেখছি।' এই যে আমার উপলব্ধি তা আত্মার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। গঙ্গেশের মতে মনও একটি ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহের ত্রুটি, বস্তুর অতি-দূরত্ব বা নিকটত্ব, অনন্ত প্রসারিত্ব বা অতিশয় ক্ষুদ্রত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের অন্তরায়।

প্রত্যক্ষের পরেই অনুমানের স্থান। প্রত্যক্ষ জ্ঞানই অনুমানের ভিত্তি। ন্যায়-দর্শনের সুপ্রচলিত উদাহরণ দিয়েই তা সুস্পষ্ট করব। 'পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' —পর্বতে আগুন আছে, কারণ ধূম দেখা যাচ্ছে। যেখানে ধূম সেখানেই আগুন আছে, এবং যেখানে আগুন নেই সেখানে কখনো ধূম দেখা যায় না, এরূপ

অতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকার ফলেই পর্বতে ধূম দেখেই পর্বতে আগুন আছে এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভবপর। ন্যায়ের ভাষায় এখানে ধূম হচ্ছে 'হেতু', বহ্নিমান্ 'সাধ্য' এবং পর্বত 'পক্ষ'। সাধারণ হেতু অপেক্ষা সাধ্য পদার্থটি হয় ব্যাপক অর্থাৎ অধিক স্থানবর্তী। হেতু এবং সাধ্য সম স্থানবর্তী হতে পারে কিন্তু হেতু কখনোই সাধ্য অপেক্ষা অধিক স্থানবর্তী হতে পারে না। এই জন্য হেতুকে বলে ব্যাপ্য এবং সাধ্য ব্যাপক। যেখানে ধূম সেখানে আগুন আছে এটা ঠিক, কিন্তু যেখানে আগুন আছে সেখানেই ধূম বর্তমান এটা ঠিক নয়, ভ্রম। আগুন কখনো ধূমের হেতু হতে পারে না। অতএব কেউ যদি বলে 'পর্বতে ধূম আছে কারণ আগুন দেখছি' তাহলে সে উক্তি ভ্রান্ত বলেই গণ্য হবে।

কোনো এক ব্যক্তি যদি পর্বতে ধূম দেখে তাহলে সে তৎক্ষণাৎ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে পর্বতে আগুন আছে, কিন্তু অপরকে বোঝাতে হলে নিম্ন প্রণালী অবলম্বন করতে হয়:

১) পর্বতে আগুন আছে .. প্রতিজ্ঞা
কারণ
২) ধূম দেখা যাচ্ছে .. হেতু
৩) যেখানে ধূম সেখানেই আগুন, যথা রান্নাঘর—উদাহরণ
৪) এই পর্বতে ধূম দেখা যাচ্ছে ... উপনয়
৫) অতএব এই পর্বতে আগুন আছে ... নিগমন

গৌতমের মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, ও নিগমন 'ন্যায়ের' পাঁচটি অবয়ব বা অঙ্গ। এখানে 'ন্যায়' শব্দ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার প্রণালী, ইংরেজীতে যাকে syllogism বলে সেই অর্থে ব্যবহৃত। কিন্তু কোনো কোনো দার্শনিক বিশেষ করে মীমাংসকরা পাঁচ অবয়বের স্থলে মাত্র প্রথম তিন অবয়বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, কারণ, ঐ তিনটি দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে।

গৌতমকৃত দর্শনে উপরোক্ত পাঁচ অবয়ব বা 'ন্যায়' বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে আলোচিত হয়েছে বলে এই দর্শন 'ন্যায়দর্শন' নামে খ্যাত হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু এই দর্শনের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন 'প্রমাণৈরর্থ পরীক্ষণং ন্যায়ঃ'—অর্থাৎ প্রমাণের সাহায্যে বস্তুতত্ত্ব পরীক্ষার নাম 'ন্যায়'। সেই

প্রণালী এই পুস্তকে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে বলেই এর নাম 'ন্যায়দর্শন।' অনুমান ঠিক ঠিক হেতু নির্ণয়ের উপর নির্ভরশীল। যা ঠিক ঠিক হেতু নয় অথচ হেতুব মতো মনে হয় তা দুষ্ট হেতু, বা 'হেত্বাভাস।' একটি জানোয়ারকে দূব থেকে আসতে দেখে কেউ যদি বলে 'ঐ যে জানোয়ারটি দূরে দেখা যাচ্ছে সেটি গরু, কারণ শিঙ আছে,' তবে ঐ উক্তি ঠিক হবে না। যেহেতু গরু ভিন্ন অন্য জানোযারেরও শিঙ আছে, যথা, মহিষ। এইরূপ হেত্বাভাসকে সব্যভিচার বা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। শিঙ থাকা একান্তভাবে গরুরই লক্ষণ নয়। এ জন্যই এটা অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। ইংরেজীতে এই দুষ্ট হেতুকে fallacy of undistributed middle বলে। গৌতম আরো চার রকমের অর্থাৎ মোট পাঁচ রকমের হেত্বাভাসের উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন। পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব ভয়ে সে সব আলোচনা থেকে বিরত হলাম। অনুমান কত রকমের হতে পারে সে আলোচনাও রয়েছে কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তার স্থান কবা অসম্ভব।

অনুমান সম্বন্ধে গঙ্গেশ তাঁর পুস্তকে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সে বিষয়ে জ্ঞানালাভেচ্ছু ব্যক্তিকেও তত্ত্বচিন্তামণি পড়তে বলা ভিন্ন উপায় নেই।

উপরোক্ত পাঁচ অবয়বযুক্ত 'ন্যায়' কতকটা গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটলের প্রণালীর অনুরূপ। এই কাবণে সতীশ বিদ্যাভূষণ মনে করেন আলেকজেণ্ড্রিয়া ও সিরিয়ার মারফতে গ্রীক প্রণালী তক্ষশিলায় আসা সম্ভবপর—অর্থাৎ ভারতীয় 'ন্যায়' গ্রীকদের কাছ থেকে নেওয়া। আবার কেউ কেউ মনে করেন আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় গ্রীকরা হিন্দু নৈয়ায়িকদের সংস্পর্শে আসে এবং সেই সূত্রে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞান গ্রীস দেশে যায়। রাধাকৃষ্ণণ সতীশ বিদ্যাভূষণের মত সমর্থন করেন না। ম্যাক্সমুলারের মতে উভয়দেশে স্বাধীনভাবে এই প্রণালী গড়ে উঠেছে। রাধাকৃষ্ণণ একেই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। বিজ্ঞানের অধ্যায়ে আগেই বলেছি যে অকাট্য প্রমাণ না পেলে, এক জাতি অপর জাতির কাছ থেকে ধার করেছে এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্ন দেশের মানব মনের চিন্তাধারার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা খুবই স্বাভাবিক।

পূর্বে জানা আছে এমন কোনো বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য বশত একটি অজানা

বস্তুর জ্ঞানকে উপমান বলে। ধরুন একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিত লোক এক ব্যক্তিকে বললেন যে জঙ্গলে গরুর মতোই দেখতে 'গবয়' নামে একরকম জন্তু আছে। সেই ব্যক্তি জঙ্গলে গিয়ে যদি গরুর মতো একটি জন্তু দেখে তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে সেটি 'গবয়'।

চতুর্থ বা শেষ প্রমাণ আগম বা শব্দ। শব্দ অর্থ ধ্বনি নয়, বর্ণময় পদমাত্র। শঙ্কর শব্দ প্রমাণের খুব উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কোন কোন শব্দ প্রমাণরূপে গৃহীত হতে পারে তা গৌতম স্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করেছেন—'আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ'—আপ্ত বাক্যই শব্দ প্রমাণ। আপ্তি অর্থ শব্দার্থের সাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষ করা। সেই আপ্তি (প্রত্যক্ষ) অনুসারে যিনি বাক্য ব্যবহার করেন তিনিই আপ্ত। এর মধ্যে কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই। সকল ধর্মের মহাপুরুষরাই আপ্ত বলে অভিহিত হতে পারেন। যিনি বক্তব্য বিষয়ের যথার্থস্বরূপ প্রত্যক্ষ করে সে বিষয়ে উপদেশ দেন তিনিই আপ্ত। বিশেষজ্ঞদের মত মেনে নেওয়ার প্রথা বিজ্ঞানসম্মত। শব্দ প্রমাণ দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকারের বিষয় সম্বন্ধেই হতে পারে। বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র অদৃষ্ট বিষয় সম্বন্ধেই প্রমাণ।

চার প্রমাণ সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি, কারণ শুধু ন্যায়দর্শন নয়, একটু-আধটু অদল-বদল করে বৈশেষিক, সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল প্রমাণ সমূহ মেনে নিয়েছে। মীমাংসাদ্বয় বিশেষ ভাবে শব্দ প্রমাণের উপরেই নির্ভরশীল।

প্রমাণ না থাকলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না, আবার বিষয় না থাকলেও জ্ঞান ও বিচার হয় না। প্রমাণের বিষয়ভূত বস্তুকে প্রমেয় এবং প্রমেয়র জ্ঞানকে প্রমা বলে। ন্যায় মতে প্রমেয়র সংখ্যা বারো: আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়), বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি,, দোষ, প্রেত্যভাব (পুনরুৎপত্তি), ফল, দুঃখ ও অপবর্গ। এই বারো প্রমেয়র তত্ত্বনির্ণয় উদ্দেশ্যেই চার প্রমাণের অবতারণা।

ন্যায়মতে 'আত্মা দেহেন্দ্রিয়াদি হতে পৃথক ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং নিত্য ও চৈতন্য সম্পন্ন' (দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ)। বিশদভাবে বারো প্রমেয় সম্বন্ধে আলোচনা করে পুস্তক অযথা ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু একথা সত্য যে মানুষের যখন আত্মা, দেহ, রাগ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি দোষ, প্রবৃত্তি, জন্মমৃত্যু, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান হয় তখনই তার আত্যন্তিক

দুঃখের অবসান সম্ভবপর। সেই অবস্থার নামই অপবর্গ বা অত্যন্ত বিমোক্ষ। অপবর্গ অবস্থায় জীব সুখ দুঃখ উভয়ের অতীত, সমস্ত অহঙ্কারশূন্য। এই অপবর্গ লাভের জন্য সাধনার প্রয়োজন।

ন্যায়দর্শনের প্রধান বিশেষত্ব মানুষের চিন্তাধারার খুব সূক্ষ্ম ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এটি মানুষের চিন্তাজগতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে, চিরদিন থাকবেও। দুইজন কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে কেউ যদি কোনো অপযুক্তির অবতারণা করে তা তৎক্ষণাৎ নির্ণয়ের জন্য নৈয়ায়িকরা যে সমস্ত শব্দ আবিষ্কার করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার। যথা, সাধ্যসম, অনবস্থা, চক্রক প্রভৃতি। কোনো একটা বিষয়ের প্রমাণের জন্য যদি এমন যুক্তি ব্যবহার করা হয় যার প্রমাণ দরকার এবং যা প্রমাণের বিষয়ভূত বস্তু থেকে পৃথক নয় তাহলে সেরূপ অপযুক্তিকে বলে সাধ্যসম (Petitio Principii)। যে আপত্তির আর শেষ হয় না, তাকে বলে অনবস্থা (Infinite regress)। আগে বলেছি সাংখ্যমতে কার্য ভিন্ন কারণ হয় না। সেই কারণের কারণ কি এরূপ প্রশ্ন করতে করতে আদি কারণে বা কারণ-বিহীন কারণে পৌঁছতে হয়। যদি সেই আদি কারণেরও কারণ জিজ্ঞাসা করা হয় তবে তা অনবস্থা দোষ দুষ্ট। যেহেতু সেই প্রশ্নের আর শেষ হয় না, প্রশ্ন ও উত্তর অনন্তকাল চলতে থাকবে। চট করে অপযুক্তি দেখিয়ে দেওয়ার এটা উৎকৃষ্ট পন্থা। মোট কথা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পথে ন্যায় শাস্ত্রের দান অপরিমেয়।

বৈশেষিক—প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোলো পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান ন্যায়মতে নিঃশ্রেয় সলাভের উপায়। বৈশেষিক প্রণেতা কণাদের মতে নিষ্কাম কর্মের অনুশীলনে চিত্ত নির্মল হলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়—এই ছয় পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বিচার দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তির উপায়। এখানে 'বিশেষ' নামে একটি পদার্থের উল্লেখ আছে। এই 'বিশেষ' শব্দ থেকেই এই দর্শনের নাম বৈশেষিক। আগে বলেছি পরমাণুবাদ বৈশেষিকদর্শনের বিশেষত্ব। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারের পরমাণুপুঞ্জ থেকে সমস্ত চরাচর জগৎ সৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ পরমাণুপুঞ্জ থেকে বিভিন্ন জিনিস সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর হয় 'বিশেষ' নামক পদার্থের প্রভাবে। কিন্তু এই 'বিশেষ' নামক জিনিসটির কোনো সুস্পষ্ট ধারণা কণাদ দিতে পারেননি।

"এই বিশেষ পদার্থই পরমাণুপুঞ্জের পার্থক্য রক্ষা করিয়া থাকে; এক জাতীয় বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন প্রকার কার্যোৎপাদনে সহায়তা করে; নচেৎ সমস্ত পার্থিব পরমাণু হইতে একই প্রকার কার্য হইতে পারিত—আম্রবৃক্ষ ও বিল্ববৃক্ষ উভয়ই পার্থিব পরমাণু হইতে উৎপন্ন; সুতরাং উভয় বৃক্ষই একাকার ও একপ্রকার পুষ্প-ফলপ্রসূ হইতে পারিত; কেবল উক্ত 'বিশেষ' পদার্থই তদুভয়ের স্বরূপগত ও ফলগত পার্থক্য সাধন করিয়া থাকে" (দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ)। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে দুইভাগে বিভক্ত। স্থূলভাগ উৎপত্তি বিনাশশীল—অনিত্য, আর সূক্ষ্মভাগ উৎপত্তি বিনাশহীন—নিত্য এবং এটাই পবমাণু। পবমাণু সূক্ষ্ম এবং অদৃশ্য হলেও সৎপদার্থ। কণাদের পরমাণুবাদ বিজ্ঞানসম্মত পরমাণুবাদ নয়। তা উনবিংশ শতাব্দীব প্রথম ভাগে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ড্যালটন কর্তৃক প্রবর্তিত হয়।

ন্যায়দর্শনে ষোলো পদার্থের জ্ঞান আর বৈশেষিকদর্শনে ছয় পদার্থের জ্ঞান নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষলাভের উপায়। বৈশেষিক মতেও জীবাত্মা বহু। ন্যায়দর্শনেব সঙ্গে বৈশেষিকের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শন ন্যায়দর্শনের মতো সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার পরিচয় দিতে পারেনি। তাই যুক্তি দেখিয়ে দুঃখ করে দুর্গাচবণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ বলেছেন: 'এই সমুদয় কারণে বৈশেষিকদর্শনের সূত্রানুসারে সিদ্ধান্ত সংকলন কবা বড়ই বিঘ্নসংকুল হইয়া পড়ে।' অতএব আমরাও এখানেই বৈশেষিকদর্শনের আলোচনা সমাপ্ত করি।

সাঙ্খ্য—সাঙ্খ্যদর্শন প্রণেতা কপিল। কিন্তু এই কপিল কে ছিলেন এবং কপিল প্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন যে কোনটি তা এখনও নির্ণীত হয়নি। তত্ত্বসমাস ও সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্র, সাঙ্খ্যদর্শনের এই দুখানা সূত্র গ্রন্থ। সাঙ্খ্যদর্শনের অপর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাঙ্খ্যকারিকা। তত্ত্বসমাস মাত্র ২২টি সূত্রের সমষ্টি। খুবই সংক্ষেপে সাঙ্খ্যদর্শনের মূল কথার আভাস তাতে পাওয়া যায়। কিন্তু তত্ত্বসমাস একটি দর্শন বলে অভিহিত হতে পারে না। সাঙ্খ্যপ্রবচনসূত্রের প্রথম পরিচয় আমরা পাই বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত সাঙ্খ্য-প্রবচন ভাষ্য থেকে। বিজ্ঞানভিক্ষু ষোড়শ শতাব্দীর লোক। মধ্বাচার্য (চতুর্দশ শতাব্দী) কৃত সর্বদর্শনসংগ্রহে এই প্রবচনসূত্রের উল্লেখ নেই। শঙ্করাচার্যও সাঙ্খ্যমত খণ্ডনের সময় ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকারই নির্দেশ করেছেন।

তা ছাড়া বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্যের ভূমিকায় এই শ্লোকটি আছে—'কালার্কভক্ষিতং সাঙ্খ্য শাস্ত্রং জ্ঞান সুধাকরম্। কলাবশিষ্টং ভূযোঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ ॥' —জ্ঞান অমৃতস্বরূপ সাঙ্খ্যশাস্ত্র কালের প্রভাবে অনেকটা নষ্ট হয়েছে, যা অবশিষ্ট আছে আমি তা পুনরায় অমৃতময়ী বাক্য দ্বারা পূরণ করব। এ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে এই প্রবচনসূত্রে বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত সূত্র থাকা খুবই সম্ভবপর। এই সমস্ত কারণে মনে হয় প্রবচনসূত্র কপিল প্রণীত হলেও অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত। কপিল থেকে সাঙ্খ্যাচার্যদের যে এক ধারা সৃষ্টি হয় ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাঙ্খ্যকারিকা প্রামাণ্য সাঙ্খ্যগ্রন্থ বলে খ্যাত।

প্রকৃতি, পুরুষ প্রভৃতি পঁচিশ তত্ত্বের জ্ঞানই সাঙ্খ্যদর্শনের মূল কথা। পঁচিশ সংখ্যা থেকে এই দর্শনের নাম 'সাঙ্খ্য' হওয়া সম্ভবপর মনে হতে পারে, কিন্তু তা নয়। 'সঙ্খ্যা শব্দের অর্থ সম্যক জ্ঞান, সম্যক জ্ঞানের উপদেশ আছে বলিয়াই কপিল কৃত দর্শন সাঙ্খ্য' (কালীবর বেদান্তবাগীশ)।

ভারতীয় চিন্তাধারার উপর এক সময়ে সাঙ্খ্যদর্শনেব খুবই প্রভাব ছিল। গীতায় তার সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। 'সিদ্ধানাং কপিলোমুনিঃ'—সিদ্ধদের মধ্যে আমি কপিল মুনি—গীতায় ভগবানের মুখ দিয়ে একথা ব্যক্ত করাতে সাঙ্খ্য-কারের উচ্চ প্রশংসারই অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়। কিন্তু বর্তমানে সাঙ্খ্য-শাস্ত্রের সে প্রভাব হিন্দুর জীবনে নেই।

সাঙ্খ্যদর্শন নিরীশ্বরবাদী একথা আগে বলেছি। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—ঈশ্বর অসিদ্ধ একথা প্রবচনসূত্রে আছে, কিন্তু সাঙ্খ্যকারিকায় ঈশ্বরের কোনো উল্লেখ নেই। সাঙ্খ্যকারিকা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব, যেমন বুদ্ধদেব। যাগযজ্ঞের দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি হতে পারে না এ মত সাঙ্খ্যকারিকা ও প্রবচনসূত্র উভয়েই আছে; কিন্তু হিংসাসাধ্য বলে যাগযজ্ঞাদি হতে পারে না, একথাও সাঙ্খ্য-কারিকায় আছে, প্রবচনসূত্রে কোনো কারণ নির্দেশ নেই।

প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচ তন্মাত্র এবং পুরুষ এই পঁচিশ তত্ত্বের জ্ঞানই সাঙ্খ্যমতে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির বা মোক্ষলাভের উপায়। কিন্তু এই পঁচিশ তত্ত্বের জ্ঞান সারভাবে দেখতে গেলে এসে দাঁড়ায় প্রকৃতি ও পুরুষের সঠিক জ্ঞানে।

আগে বলেছি কার্য ভিন্ন কারণ হয় না এ সাঙ্খ্যমত। শুধু তাই নয় কার্য কারণেই নিহিত থাকে, কার্য কারণের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি। বস্তুত কার্য ও কারণ অভিন্ন। একেই বলে সাঙ্খ্যের সৎকার্যবাদ—অর্থাৎ কারণে যা আছে, কার্যে তা-ই অভিব্যক্ত হয়। সুতা থেকে কাপড় প্রস্তুত হতে পারে, কিন্তু পাথর থেকে নয়। শত সহস্র শিল্পী একত্র হয়েও পীতকে নীল করতে পারে না।। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা উপাদান আছে যা থেকে তা উদ্ভূত হয়। এই কার্যকারণ সম্বন্ধ যদি মেনে নেওয়া যায় তবে জগতের কারণ কি এ প্রশ্নের উত্তরে এমন এক কারণে গিয়ে পৌঁছতে হয় যার কোনো কারণ নেই, অর্থাৎ যা আদি কারণ, তারই নাম সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি বা প্রধান। অন্য সিদ্ধান্ত করতে গেলে তা অনবস্থা দোষ দুষ্ট হবে। প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ এবং তা জড়। এই জগতে যেমন বিছানা প্রভৃতি জড়পদার্থের অস্তিত্বই কোনো এক-জনের ভোগের জন্য, তেমনি এই জড়প্রকৃতিরও এক ভোক্তা থাকা দরকার। তাকেই সাঙ্খ্য কল্পনা করেছে পুরুষরূপে। কিন্তু জড়পদার্থের ভোক্তা প্রয়োজন বলে পুরুষ কল্পনা করে নিয়ে, এই পুরুষ সম্বন্ধে সাঙ্খ্য বলছে 'অসঙ্গোঽয়ং পুরুষঃ'—অর্থাৎ এই পুরুষ নির্লিপ্ত। নির্লিপ্ত পুরুষের পক্ষে ভোক্তা হওয়া যদিও অসম্ভব।

সাঙ্খ্যমতে এই অসঙ্গ বা নির্লিপ্ত পুরুষ আর জড়প্রকৃতির সংযোগ বা সান্নিধ্যের ফলে সমস্ত জগৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়। কি ভাবে হয়, সাঙ্খ্যকারিকা পঙ্গু ও অন্ধের উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছে। পঙ্গু চলতে পারে না, অন্ধও দেখতে পায় না বলে চলতে অক্ষম। কিন্তু পঙ্গু যদি অন্ধের কাঁধে চেপে তাকে নির্দেশ করে তবে অন্ধ চলতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে পঙ্গুরও যাওয়া হয়। কিন্তু এ উপমা থেকে জিনিসটা স্পষ্ট হওয়া দূরে থাক বরং বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে। এখানে পঙ্গু ও অন্ধ উভয়েই চেতন, একের অক্ষমতা অন্যের নেই, তাই উভয়ে মিলে কাজ হাসিল করতে পারে। পঙ্গু ও অন্ধের মিলিত প্রচেষ্টায় যা হওয়া সম্ভব, জড়প্রকৃতি আর নির্লিপ্ত পুরুষের সংযোগে সেরূপ হওয়া অসম্ভবই মনে হয়। সাঙ্খ্যের এই প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব অনেকটাই কষ্ট কল্পনা এবং সমস্ত জিনিসটাই অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে।

সাঙ্খ্যমতে প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। প্রকৃতিতে এই তিন গুণ সাম্য অবস্থায় থাকে। পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির একপ্রকার বিকার

ঘটে, ফলে সাম্যাবস্থা দূর হয়। এব প্রথম পরিণতি মহৎ বা বুদ্ধি। দ্বিতীয় পবিণতি অহঙ্কার। অহঙ্কার থেকে পাঁচ তন্মাত্র, মন, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পাঁচ তন্মাত্র থেকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের উৎপত্তি। এই যে সৃষ্টিক্রম এর কোনো যুক্তি বা প্রমাণ নেই, একমাত্র প্রমাণ সাঙ্খ্যকাবের উক্তি। তন্মাত্র যে কি তার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা সাঙ্খ্য দেয়নি। এটি সূক্ষ্ম, পরমাণুও সূক্ষ্ম। তাই পণ্ডিত কালীবব বেদান্তবাগীশেব মতে 'বৈশেষিকদর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, অনুমান হয়, তাহাই সাঙ্খ্য-দর্শনের তন্মাত্র।' এই সিদ্ধান্তেব পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নেই।

সাঙ্খ্যমতে পুরুষ বহু—প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন। সাঙ্খ্যকারিকার মতে 'একের জন্মে, মরণে বা ইন্দ্রিয় বৈকল্যে যখন অপরের জন্ম, মরণ বা ইন্দ্রিয় বৈকল্য ঘটে না তখন বোঝা যায় যে পুরুষ বহু—প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন।' এই শ্লোক থেকে মনে হয় সাঙ্খ্যেব পুরুষ আব জীবাত্মা একার্থবাচক। ঋগ্বেদের বা উপনিষদের পুরুষ সাঙ্খ্যের পুরুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

উপরে বলেছি প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ সম্পন্না। কিন্তু এই তিনটি গুণ প্রকৃতির ধর্ম নয়, প্রকৃতির স্বরূপ। এই তিন গুণেব সমষ্টিই প্রকৃতি। গুণাতিরিক্ত প্রকৃতি বলে কোনো পদার্থ নেই। সত্ত্ব লঘু, প্রকাশ ও সুখ শক্তিবিশিষ্ট; রজঃ চলনশীল ও দুঃখাত্মক, এবং তমঃ গুরু বা ভারি, প্রকাশেব প্রতিবন্ধক এবং আলস্য প্রভৃতি মোহরূপী। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সম্বন্ধে এই ধারণা বর্তমানকাল পর্যন্তও সুপ্রচলিত।

প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি তেইশ তত্ত্বও প্রকৃতির মতোই জড় বা অচেতন। পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতির বিভিন্ন পরিণাম হয়। কিন্তু অজ্ঞানতা বা অবিবেকবশত পুরুষে সে সব আরোপিত হয়, এবং পুরুষ সত্যই ভোগ করছে বলে মনে হয়। এই অজ্ঞানতা যখন দূর হয় তখনই জীবের আত্যন্তিক দুঃখের নিবৃত্তি বা মোক্ষ।

পাতঞ্জল বা যোগদর্শন—পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রের প্রণেতা। কিন্তু যোগবিদ্যার প্রথম উপদেষ্টা নন। হিরণ্যগর্ভ প্রথমে লোকসমাজে যোগবিদ্যা প্রচার করেছিলেন বলে খ্যাত। পাতঞ্জলদর্শনের প্রথম সূত্র 'অথ যোগানুশাসনম্।' অনুশাসন শব্দের অর্থ পূর্বে উপদিষ্ট বিষয়ের শাসন বা উপদেশ। এ থেকে সুস্পষ্ট যে যোগবিদ্যা পতঞ্জলির পূর্বে প্রচলিত ছিল।

পাতঞ্জলদর্শন সাধারণত সেশ্বর সাঙ্খ্য বলে পরিচিত। কিন্তু এ মত যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। পতঞ্জলি সাঙ্খ্যসম্মত পদার্থগুলি আবশ্যকমতো স্থানে স্থানে গ্রহণ করেছেন মাত্র, যোগদর্শনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বা যোগতত্ত্বের সঙ্গে সাঙ্খ্যদর্শনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এমন কি সাঙ্খ্যসম্মত জিনিস যোগদর্শন থেকে বাদ দিলেও তার কোনো অঙ্গহানি হয় না। যোগশাস্ত্র শারীরিক ও মানসিক সংযমের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যোগশাস্ত্রে ধ্যানের কথা আছে। উপনিষদ বা বেদান্তের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ধ্যানের সঙ্গে প্রায় একার্থবাচক। পতঞ্জলি ওঁকার জপের ও তার অর্থ চিন্তা করার কথা বলেছেন। ওঁকারের উচ্চপ্রশংসা কঠ, মাণ্ডুক্য প্রভৃতি উপনিষদে আছে। ব্রহ্মসূত্র মতে ব্রহ্ম অনাদি, অনন্ত, সর্বজ্ঞ। পতঞ্জলির মতে ঈশ্বর অবিদ্যা প্রভৃতি পাঁচ ক্লেশের অতীত, 'নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞ বীজং' এবং তিনি অনাদি অনন্ত। এই সব সাদৃশ্য দেখে কেউ যদি যোগদর্শনকে বেদান্তের অংশ বা সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করে তাও অযৌক্তিক হবে। যোগদর্শন তার নিজের বিশেষত্বে অন্যান্য সমস্ত দর্শন থেকে পৃথক। পতঞ্জলি কোথাও নিজের পুস্তককে 'সাঙ্খ্য' নামে নির্দেশ করেননি।

যোগ শব্দের অর্থ সমাধি বা চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরোধ। এই নিরোধ দুই প্রকারের হতে পারে, আংশিক বা পরিপূর্ণ। আংশিক নিরোধ পতঞ্জলির ভাষায় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং পরিপূর্ণ নিরোধ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 'সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে ধ্যেয়রূপে অবলম্বিত বিষয়ে তখনও চিত্তের চিন্তাবৃত্তি বর্তমান থাকে, আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে তাহাও থাকে না, সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া যায়' (দুর্গাচরণ সাঙ্খ্যবেদান্ততীর্থ)। চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপায় পতঞ্জলির মতে অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ই। পার্থিব এবং স্বর্গ সুখ প্রভৃতি সকল প্রকার ভোগাকাঙ্ক্ষা আমূল ত্যাগের নাম বৈরাগ্য। চিত্তের বৃত্তি সমূহের নিরুদ্ধ অবস্থায় স্থিত থাকার জন্য বারবার চেষ্টার নাম অভ্যাস। সমাধি সিদ্ধির জন্য সাধারণ ভাবে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের কথা বলে পতঞ্জলি বিশেষ বিশেষ উপায়ের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে ঈশ্বর প্রণিধান—বা ভক্তি সহকারে ঈশ্বরের আরাধনা বা উপাসনা। সাঙ্খ্যসম্মত সিদ্ধান্তের সঙ্গে পতঞ্জলি কোনো প্রকারে ঈশ্বরকে জুড়ে দেননি। ঈশ্বরের প্রণিধানের কথা পতঞ্জলি কয়েক বার উল্লেখ করেছেন। এ হিসাবেও পাতঞ্জলকে সেশ্বর সাঙ্খ্য বলা যুক্তিবিরুদ্ধ।

প্রণব ঈশ্বরবাচক। সেই প্রণব বা ওঁকারের জপ ও তার অর্থভাবনা একপ্রকারের ঈশ্বর প্রণিধানই। কিন্তু ঈশ্বরের ধ্যান পতঞ্জলির মতে একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়। তাঁর মত অতি উদার। অন্যান্য পন্থার মধ্যে এ একটি। আরো তিনটি পথের পর্যায়ক্রমে উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি যথাক্রমে এই: (১) যে সমস্ত মহাপুরুষদের চিত্ত বীতরাগ হয়েছে তাঁদের ধ্যান, (২) স্বপ্নাবস্থায় যদি কোনো প্রিয়দর্শন মূর্তি দেখা যায় তার ধ্যান, (৩) অভিরুচি অনুযায়ী ধ্যান। এই পন্থাগুলির মধ্যে পতঞ্জলি কোনো তারতম্য করেননি। সকলেরই গোড়াকার কথা 'তীব্রসংবেগানাম্ আসন্ন'—অর্থাৎ যার সিদ্ধিলাভে আগ্রহ বেশি তারই শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়।

পতঞ্জলির মতে যোগাঙ্গ বা যোগসিদ্ধির উপায় আট রকম: যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—যম। কায়মনোবাক্যে কোনো প্রাণীকে পীড়া না দেওয়ার নাম অহিংসা। অহিংসার অন্য অর্থ সকল জীবের প্রতি অসীম প্রেম। পতঞ্জলির মতে অহিংসাবৃত্তি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ কেউ অহিংসাসিদ্ধ হলে তার নিকটস্থ প্রাণীদের হৃদয় থেকেও বৈরভাব দূর হয়ে যায়। সত্য ও ব্রহ্মচর্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। অস্তেয় শব্দের সাধারণ অর্থ চুরি না করা। কিন্তু এখানে অর্থ পরের জিনিস লাভের ইচ্ছা পর্যন্ত না হওয়া। শরীর রক্ষার জন্য উপযুক্ত দ্রব্য ভিন্ন কোনো জিনিসের জন্য লোভ বা ইচ্ছা না করার নাম অপরিগ্রহ।

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—নিয়ম। শৌচ অর্থ বিশুদ্ধি—শারীরিক এবং চিত্তগত। অর্থাৎ শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং চিত্তের সকল প্রকার কুবাসনা দূর করে শুদ্ধভাব পোষণ করা। সন্তোষ অর্থ পরিতৃপ্তি—বিনা আয়াসে যা লাভ হবে তাতেই পরিতৃপ্ত থাকা। শ্রদ্ধাপূর্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা। মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ স্বাধ্যায়।

আসনও একটি যোগাঙ্গ। শরীরকে স্থির করার জন্য আসনের প্রয়োজন। শরীর স্থির হলে মনও সংযত হয়। কিন্তু যে ভাবে বসে শরীরকে স্থির করলে সুখপ্রদ হয় তা-ই আসন। যতক্ষণ আসনের দ্বারা শরীরে কোনো উদ্বেগ বোধ হয় ততক্ষণ তা মন সংযমের কাজে আসে না। পতঞ্জলি সংযমের কথা বলেছেন কিন্তু

শরীরকে কষ্ট দেওয়াব কথা বলেননি। গীতাব মতও এই। বুদ্ধদেবও এরূপ মতই ব্যক্ত কবেছেন।

শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণেব নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম প্রাণ ও মনেব চঞ্চলতা দূর কবে। শব্দাদি বহির্বিষয় থেকে শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সমূহকে ফিবিয়ে অন্তর্মুখী কবাব নাম প্রত্যাহার।

চিত্তকে কোনো একটি বিষয়ে স্থাপন কবে বাখা ধাবণা। ধাবণারই পবিপক্ক অবস্থা ধ্যান। যে বিষয়ে ধাবণা অভ্যাস কবা যায় সে বিষয়ে একাকাব চিন্তাধারার নাম ধ্যান। ধারণা—অল্প সময়েব জন্য কোনো বিষয়ে চিত্তকে স্থির কবে রাখা। সেই চিন্তাধাবা যখন নিববচ্ছিন্ন তৈলধাবাব মতো পতিত হয় তখন তাকে ধ্যান বলা যায়। সেই ধ্যানই যখন অভ্যাসবশে আপনাব অস্তিত্ব শূন্য হয়ে কেবল ধ্যেয় বিষয়াকাবে প্রকাশ পায় তখন তা সমাধি। একথা বলা বাহুল্য যে ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি একই বিষযকে অবলম্বন কবে হওয়া আবশ্যক। একই বিষয়ে নিযুক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধিকে পতঞ্জলি সংযম নামে অভিহিত কবেছেন।

যোগ সাধনার দ্বাবা যখন চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থায় আত্মা আপনাব স্বরূপে অবস্থান করে এবং যোগী কৈবল্য প্রাপ্ত হয়।

পতঞ্জলিব মতে ঈশ্বব অবিদ্যা, অহঙ্কাব প্রভৃতি পাঁচ ক্লেশ, কর্ম, কর্মফল ও পূর্বতন সংস্কাবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য। যোগী যখন কৈবল্য লাভ করে তখন সেও অবিদ্যাদি পাঁচ ক্লেশ ও কর্মের সঙ্গে সম্বন্ধশূন্য হয়ে যায়। এক কথায় বলতে গেলে যোগী তখন ঈশ্ববত্ব লাভ কবে একথাও বলা যেতে পারে।

পূর্বমীমাংসা—পূর্ব বা কর্মমীমাংসা জৈমিনি প্রণীত। এটি পূর্বে রচিত হয়েছে বলে পূর্বমীমাংসা নয়। বেদের পূর্বভাগ বা কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে এই দর্শনে আলোচিত হয়েছে বলে এটি পূর্বমীমাংসা।

যেখানে সংশয় সেখানেই মীমাংসার প্রয়োজন। বেদেব কর্মকাণ্ডে যে সমস্ত বিধান আছে সে সব বিষয়ে কোনো সংশয় উপস্থিত হলে তার নিরাকরণ কবাই পূর্বমীমাংসার উদ্দেশ্য। কোন শব্দের কিরূপ অর্থ করতে হবে, কোন বাক্যের কিরূপ তাৎপর্য কল্পনা করতে হবে এসব বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

জৈমিনি 'অথাতো ধর্ম জিজ্ঞাসা' বলে তাঁর পূর্বমীমাংসা আরম্ভ করেছেন। আর 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' বলে বাদরায়ণ আরম্ভ করেছেন ব্রহ্মসূত্র। জ্ঞানের পূর্বে কর্মের স্থান অতএব জৈমিনি বাদবায়ণ প্রণীত গ্রন্থদ্বয়কে যথাক্রমে পূর্ব ও উত্তব মীমাংসা বলা যুক্তিযুক্তই হয়েছে।

ধর্ম কি, এখন এটাই প্রশ্ন। জৈমিনিব মতে বেদ 'কর' 'কর্তব্য' প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা যে কর্মের নির্দেশ দিয়েছে তা-ই ধর্ম আব যা অকর্তব্য বলে নির্দেশ দিয়েছে, তা অধর্ম। জৈমিনির মতে এই আদেশাত্মক বাক্য ভিন্ন অন্য সমস্তই নিবর্থক।

আগে বলেছি জৈমিনিব মতে বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি কার্যের ফল স্বর্গলাভ—তা-ই জীবেব চবম কাম্য—তার অতিবিক্ত মোক্ষ প্রভৃতি অপর কোনো জিনিস নেই। কোনো যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হবে কিনা সে বিষযে প্রত্যক্ষ বা অনুমান আমাদেব সত্য নির্ণয়ে সাহায্য করতে পারে না। এ বিষয়ে শ্রুতি বা বেদই একমাত্র প্রমাণ, তাব উপবেই আমাদের নির্ভর কবতে হবে। জৈমিনির মতে ঈশ্বরের কোনো প্রযোজনীয়তা নেই। বেদোক্ত কমসমূহ আপনি ফলপ্রসূ। নিয়ম মতো যজ্ঞ করলেই ফল লাভ। বিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মই ধর্ম। ধর্মকর্মানুরূপ ফলোৎপাদনের জন্য অদৃষ্ট বা অপূর্ব রেখে বিনষ্ট হয়। এই অপূর্বই কর্মকর্তাকে ভোগ সমর্পণ করে। ব্রহ্মসূত্রে বাদরায়ণ—ধর্ম আপনি ফল-প্রসূ—জৈমিনির এ মত উল্লেখ করেছেন এবং ঈশ্বর কর্মফল প্রদান কবেন এরূপ নিজ মত ব্যক্ত করেছেন।

পরবর্তী পূর্বমীমাংসকরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকাব করেছেন। প্রসিদ্ধ পূর্ব-মীমাংসক কুমারিলভট্ট শিবের বন্দনা করে তাঁব পুস্তক আরম্ভ করেছেন।

ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা—বিভিন্ন উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ আছে সেগুলিকে একত্র সন্নিবেশিত করা, এবং সংশয়স্থলে উপনিষদের কোন বাক্যকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে তা নির্ণয়, এবং বিভিন্ন উপনিষদের বাক্যসমূহের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ব্রহ্মসূত্র রচিত। এর প্রণেতা বাদরায়ণ বা ব্যাস। এটি পরে লিখিত বলে উত্তরমীমাংসা নয়। বেদের উত্তর ভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে মীমাংসা বলেই এটি উত্তরমীমাংসা নামে খ্যাত।

ব্রহ্মসূত্রের সূত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত। ভাষ্য ভিন্ন সেগুলির অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। শঙ্কর ও তারপরে রামানুজভাষ্যই সর্বাধিক খ্যাত। এই দুই ভাষ্যের মধ্যে

কোনটি মূল সূত্রগুলিকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত বা ঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করেছে তা স্থির করাও দুঃসাধ্য। অন্যান্য দর্শনের সূত্রগুলি সংক্ষিপ্ত হলেও ভাষ্যের সাহায্য ব্যতীত দুর্বোধ্য নয়।

ব্রহ্মসূত্রে বহুস্থানে জৈমিনির উল্লেখ আছে এবং পূর্বমীমাংসায় জৈমিনি যে সমস্ত মত প্রচার করেছেন তার কোনো কোনো জিনিসের খণ্ডন আছে। ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য ও বৈশেষিক যোগমতেরও খণ্ডন আছে। শুধু তাই নয়—বৌদ্ধ ও জৈনমত, পাশুপত ও ভাগবত মতও খণ্ডিত হয়েছে। ব্রহ্মসূত্র মুখ্যত ব্রহ্ম, জগৎ ও জীব এই তিনের বিস্তৃত আলোচনা ও মীমাংসা।

ব্রহ্মসূত্রও পূর্বমীমাংসার মতো সম্পূর্ণ শ্রুতিনির্ভরশীল। ব্রহ্মের কোনো রূপ নেই যা প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে, কোনো লক্ষণও নেই যা দ্বারা ব্রহ্মের অনুমান করা যেতে পারে। প্রত্যক্ষ ও অনুমান এখানে পরাস্ত। শ্রুতিই এ বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ।

ব্রহ্মসূত্রের মতে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। মাটি থেকে যন্ত্রাদির সাহায্যে কুমোর ঘট প্রস্তুত করে। মাটি ঘটের উপাদান কারণ, আর কুমোর নিমিত্ত কারণ। আমরা সাধারণত জগতে যে সমস্ত সৃষ্টি বা উপাদানকার্য দেখি, তাতে এই দুইয়ের অর্থাৎ উপাদান ও নিমিত্ত কারণ উভয়েরই অবস্থিতি দেখি। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, পরমাণুপুঞ্জ হচ্ছে উপাদান। সর্বশক্তিমান ব্রহ্মের কার্যের সঙ্গে সাধারণত সংঘটিত কার্য-সমূহের তুলনা চলে না। ব্রহ্ম থেকেই এই বিশাল জগতের উৎপত্তি, এই জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং প্রলয়ের সময় এই জগৎ ব্রহ্মেই বিলীন হয়। ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান, নির্বিকার, আনন্দময়, প্রজ্ঞানঘন, অসীম ও অনন্ত। যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ইচ্ছা করলেন, তাই এ জগৎ সৃষ্টি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ব্রহ্মের কোনো প্রয়োজন নেই, কোনো বাসনাও অপূর্ণ নেই তবে এই জগৎ সৃষ্টি কেন। ব্রহ্মসূত্রের মতে এ 'লীলাকৈবল্য' বা লীলামাত্র। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠতে পারে সম্পূর্ণ ব্রহ্মই না ব্রহ্মের কতক অংশ জগৎরূপে পরিণত হয়েছে। ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা যায় না। তাহলে ব্রহ্ম নিরবয়ব বলে যে শ্রুতিবাক্য আছে তার সঙ্গে বিরোধ হয়। যদি সম্পূর্ণ ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতেই হবে যে ব্রহ্ম আর এখন নেই কেবল জগৎই আছে। কিন্তু তাও নয়, সম্পূর্ণ

ব্রহ্মও জগৎরূপে পরিণত হয়নি, ব্রহ্মের কতক অংশও জগতে পরিণত হয়নি। তাহলে ব্যাপারটা কি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে বাস্তবিক পক্ষে জগৎ ব্রহ্মের বিকার নয়, বিবর্ত মাত্র। অর্থাৎ যা কিছু আছে সমস্তই ব্রহ্ম, অজ্ঞানতা বশত জগৎ বলে ভ্রম হয়। দুধ থেকে যখন দই হয় তখন তাকে বলে বিকার, কিন্তু দড়িকে যখন সাপ বলে ভুল হয় তখন তা বিবর্ত। শঙ্করের মতে জগৎ ব্রহ্মের বিকার নয়, বিবর্ত। কিন্তু দড়িকে যখন সাপ বলে ভুল হয় তখনও মনের আতঙ্ক সাপের উপস্থিতির সমানই হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভুল দূর না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আতঙ্ক থাকে, ভুল দূর হলে আশ্চর্য বোধ হয়, মনে হয় কি নির্বুদ্ধিতাবশত ভালো করে না দেখেই দড়িকে সাপ ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হযেছি। যতক্ষণ জগৎ যে ব্রহ্মই এ জ্ঞান না হয় মানুষ ততক্ষণ জগৎকে সত্য ভেবে অমুকে আপন, অমুকে পর ইত্যাদি চিন্তা করে কত চিন্তাজালই না তৈরি করে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে সে সমস্ত দূর হয়ে যায়। এই বেদান্তের বিবর্তবাদ।

ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ উভয় অবস্থারই উল্লেখ আছে। শঙ্করের মতে উভয়ই সত্য। নিম্ন অধিকারীর জন্য সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রয়োজন। উপাসনা সগুণ ব্রহ্মেরই সম্ভব, নির্গুণের নয়। উপাসনা ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা সাধন হয় না এবং প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পথ উন্মুক্ত হয় না। অতএব অসত্য হলেও গুণ আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম নির্গুণই। শঙ্করের মতে এই নির্গুণ ব্রহ্মই ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য।

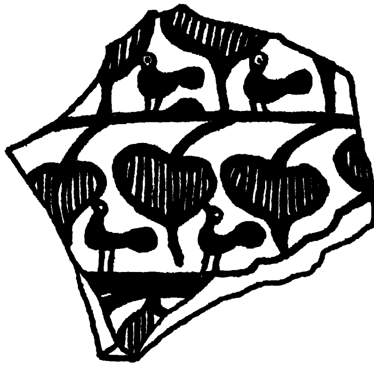
উপাসনার কথা বলেছি। শঙ্করের মতে শাস্ত্রবিধান অনুযায়ী উপাস্যের অর্থকে বিষয়ীভূত করে যেন তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মতো চিত্তকে তাঁতে দীর্ঘকাল যুক্ত করে রাখার নামই উপাসনা। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্ট নির্দেশ আছে ব্রহ্মের শ্রবণ, মনন বা নিদিধ্যাসন একবার নয় বারবার করতে হবে।

ব্রহ্ম ও জগৎ সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্রের মত বলেছি, এখন ব্রহ্ম ও জীব অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা সম্বন্ধে বলব।

এ বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি ও কাশকৃৎস্ন—এই তিন আচার্যের মত উল্লেখ করেছে। সর্বশেষে কাশকৃৎস্নের মত উল্লেখ করাতে মনে হয় বাদরায়ণ তা-ই সমীচীন বলে গ্রহণ করেছেন। কাশকৃৎস্নের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা

উভয়ে সম্পূর্ণ এক। 'এই প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন যে, আচার্য আশ্মরথ্যের মত এইরূপ যে, জীব পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পরমাত্মাতেই বিলীন হয়। ঔড়ুলোমির মত এইরূপ যে, জীব ও পরমাত্মা একই বস্তুর বিভিন্ন অবস্থা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদও আছে অভেদও আছে; কাশকৃৎস্নের মত যে উভয়ে সম্পূর্ণ এক। কাশকৃৎস্নের মত অদ্বৈতবাদের অনুকূল। শঙ্কর বলিয়াছেন যে, শ্রুতির ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য' (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)।
জগৎ ও জীব বাস্তবিক ব্রহ্মই—অবিদ্যা বশত আমরা ভেদ দেখি। সে অবিদ্যা দূর হয়ে যখন প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হয় তখনই জীবের মুক্তি বা মোক্ষ।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শিল্পকলা

ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে অট্টালিকার উল্লেখ আছে। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত জিনিসগুলি ভারতের প্রাচীনতম স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। এ বিষয়ে 'মোঅন্‌জো-দড়ো ও হরপ্পা' এই অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। জন মার্শালের মতে মোঅন্‌জো-দড়োর স্থিতিকাল ৩২৫০-২৭৫০ খৃষ্ট পূর্বাব্দ। ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বেশ একটা উন্নত অবস্থার পরিচায়ক। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে এর পূর্বেই, অর্থাৎ বর্তমান সময়ের পাঁচ হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে ভারতবর্ষে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের পত্তন হয়েছিল। এর পরে প্রায় দীর্ঘ তিন হাজার বৎসরের ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। সিন্ধু উপত্যকার শিল্পের পর আমরা একেবারে এসে পড়ি গঙ্গা উপত্যকার মৌর্যযুগের শিল্পে। ক্রাম্‌রিশের মতে দীর্ঘকালের সঞ্চিত প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারই সিন্ধু উপত্যকার ভাস্কর্যের ভিত্তি। মৌর্যশিল্পও সেই ধারাই বয়ে এনেছে। 'হরপ্পার ভাস্কর্য বিচার করে একথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে মৌর্য ও সিন্ধু উপত্যকার ভাস্কর্য একই বংশোদ্ভূত' (ক্রাম্‌রিশ)

মৌর্যযুগের স্থপতিবিদ্যার নিদর্শনও খুব বেশি একটা নেই। চন্দ্রগুপ্তের অতি মনোরম রাজপ্রাসাদ কাঠের তৈরি ছিল, তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গ্রীক লেখকদের বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ তৎকালীন জগতে

শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রাসাদের স্তম্ভগুলি যথাক্রমে সোনা ও রূপার তৈরি দ্রাক্ষালতা ও পাখি দিয়ে সুসজ্জিত ছিল। এরকম সুন্দর প্রাসাদ-ভাস্কর্যও চিত্রশিল্পের উৎকর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের সঙ্গে পারস্যের রাজপ্রাসাদের সৌসাদৃশ্য দেখে কেউ কেউ ভারতীয় শিল্পকলার উপর পারসিক প্রভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু হ্যাভেল পারস্যের প্রাসাদ নির্মাণে ভারতীয় ভাস্করদের হাত থাকাই সম্ভবপর বলে মনে করেন। ভিন্সেণ্ট স্মিথ পারসিক প্রভাব স্বীকার করেও লিখেছেন যে তা মুখ্যত ভারতীয়।

অশোকের প্রস্তর নির্মিত প্রাসাদ দেখে পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন অবাক হয়ে মন্তব্য করেছেন: 'শহরের (পাটলিপুত্র) মধ্যস্থ রাজপ্রাসাদও, যা আগের মতোই বর্তমান আছে, সে সমস্ত তাঁর (অশোকের) নিযুক্ত ভূতপ্রেতেরা নির্মাণ করেছে। তারা পাথর স্তূপাকৃতি করেছে, দেওয়াল ও তোরণদ্বার গেঁথে তুলেছে এবং সুন্দর খোদাই ও খচিত ভাস্কর্যশিল্প এমন সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করেছে যা এ জগতের কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়।' অশোকের এই প্রাসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, এবং এর ধ্বংসাবশেষ গঙ্গা ও শোননদীর পলিমাটির এত নিচে পড়েছে যে তার উদ্ধারের কোনো আশাই নেই। কিন্তু খোদাইয়ের ফলে সামান্য যা কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে মনে হয় ফা-হিয়েন কোনো অতিরঞ্জিত বর্ণনা করেননি।

অশোক বহু সুন্দর সুন্দর বৌদ্ধবিহার তৈরি করেছিলেন, সে সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। হ্যাভেল ও ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে মৌর্যযুগের স্থাপত্যগুলির মধ্যে সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপ মৌর্যযুগের পরে তৈরি বলেই মনে হয়। স্থাপত্যের চেয়ে মৌর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব ভাস্কর্যে—এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অশোকের সময়কার ভাস্কর্য শিল্পকলার খুব উন্নত অবস্থার পরিচায়ক, সারনাথের সিংহচূড় সকল শিল্পীরই শ্রদ্ধার বস্তু। ঐ সিংহচূড়ে দুটি সিংহ, ধর্মচক্র ও একেবারে নিচে উল্টোভাবে বসানো পদ্ম। ঐরকম আরো দুটি সিংহ ছিল, কিন্তু লণ্ডন যাদুঘরে সে দুটি স্থানান্তরিত হয়েছে। সিংহ ও উল্টো পদ্ম সম্বন্ধে জন মার্শাল লিখেছেন—'কলা নির্মাণ-নীতির দিক দিয়ে এটি অত্যুৎকৃষ্ট এবং এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ যে সমস্ত ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে সর্বোত্তম, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস প্রাচীন জগতে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো জিনিস তৈরি হয়নি।'

ভিনসেণ্ট স্মিথের মতেও, এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এমন কি এর সমকক্ষ জন্তু-ভাস্কর্যের নিদর্শনও অন্য কোনো দেশে বিরল। এটিতে বাস্তব ও আদর্শের পরিপূর্ণ মিলন ঘটেছে এবং সামান্য কাজটুকু পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। মার্শাল শুধু সিংহচূড় সম্বন্ধে নয় সমস্ত মৌর্য শিল্পকলার অসাধারণ সূক্ষ্ম ও নিখুঁত কারুকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে অ্যাথেন্সের কোনো শ্রেষ্ঠ কারুকার্যও একে অতিক্রম করতে পারেনি।

মৌর্যযুগের ভারতীয় প্রস্তর-শিল্পীদের তুলনা নেই। অশোকেব সময়ে চল্লিশ কি তারও বেশি প্রস্তর স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক স্তম্ভের উপরে একটি চূড়া আছে এবং চূড়ার উপরিভাগে একটি জন্তু। একখানা পাথরে চূড়াটি এবং বাকি স্তম্ভটুকু আর একখানা পাথরে তৈরি। লৌড়িয় নন্দনগড় স্তম্ভ অশোক-স্তম্ভের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এটি সম্পূর্ণ একখানা পাথরে তৈরি, সুন্দর পালিশ করা—প্রায় তেত্রিশ ফুট লম্বা। নিচে ব্যাস সাড়ে পঁয়ত্রিশ ইঞ্চি এবং উপরে সাড়ে বাইশ ইঞ্চি। অশোকের স্তম্ভগুলির মধ্যে এটিই সব চেয়ে মনোরম। এরকম বড় বড় এমন কি পঞ্চাশ টন ওজনের স্তম্ভ নির্মাণ, তাকে স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া, সোজা করে দাঁড করানো প্রভৃতি থেকে মনে হয় অশোকের ইঞ্জিনিয়র ও প্রস্তরছেদকরা কুশলতায় যে কোনো দেশের যে কোনো যুগের ইঞ্জিনিয়র ও প্রস্তরছেদকদের সমকক্ষ ছিলেন। 'তক্ষশিলায় প্রাপ্ত প্রাচীন কীর্তির নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে কলাবিদ্যা হিসাবে প্রস্তর ছেদন ও পালিশের কার্য উন্নতির সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল, মৌর্যযুগেও তা বজায় ছিল এবং পরবর্তী যুগে কখনো তার চেয়ে উন্নত অবস্থা আর আসেনি' (কুমারস্বামী)।

কঠিন প্রস্তর পালিশ করার বিদ্যা সে যুগে এমন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল যে আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার সত্ত্বেও এ যুগে তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় সে বিদ্যা এখন লুপ্ত। অশোক বরাবর পাহাড়ে আজীবক সন্ন্যাসীদের জন্য অতি কঠিন প্রস্তর কেটে সুদান প্রভৃতি গুহা নির্মাণ করিয়েছিলেন। সে সমস্ত গুহার ভিতরকার প্রস্তর এমন পালিশ করা যে মনে হয় যেন কাচের দর্পণ। অক্লান্ত পরিশ্রম, অশেষ ধৈর্য ও নিপুণতার এ এক আশ্চর্য নিদর্শন। অশোকের শিলালিপির অক্ষরগুলিও অতি নিখুঁত ভাবে খোদাই করা। প্রস্তরকার্যের এরকম সর্বাঙ্গীন উন্নতি যে বহু

শতাব্দী সঞ্চিত সংস্কারের পরিণত ফল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মৌর্যযুগের শিল্পকলার বিশেষত্ব এই যে, বৌদ্ধ মন্দিরের ভাস্কর্যের মধ্যে তখনও বুদ্ধেব মূর্তি স্থান পায়নি। মহাভিনিষ্ক্রমণ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধের পরিনির্বাণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই প্রতীকের সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে।

অশ্বত্থ বৃক্ষ, সামনে উপাসনার জন্য সিংহাসন বা বেদীর উপর স্থাপিত বিভিন্ন প্রকারের পবিত্র চিহ্ন বা দ্যোতক বস্তু বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের প্রতীক। ধর্মচক্র সারনাথে বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের কথা ব্যক্ত করে, এবং স্তূপ, বুদ্ধের পরিনির্বাণ বা কুশীনগরে তিরোভাবের চিহ্ন। বৌদ্ধধর্ম বিশেষ ভাবে বৈরাগ্যের ধর্ম—সংসারে সমস্তই অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী, একথা বৌদ্ধরা বিশেষ করে প্রচার করেছেন। অন্তিম বৈরাগ্যে ধ্যানের উপযুক্ত স্থান শ্মশান, তাই বুদ্ধের চিতাভস্ম, দাঁত প্রভৃতি স্মারক সযত্নে রক্ষিত হয়েছে; আর বুদ্ধ এবং কোনো মৃত বৌদ্ধ অর্হৎ বা মহাপুরুষের স্মৃতিমন্দিব বা স্তূপ বা ডাগোবা বৌদ্ধদের প্রিয় উপাসনা-গৃহ। ভারতীয় শিল্পকলায় স্তূপ ছাড়াও যজ্ঞাগ্নির ভস্ম, বরফে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গ, অস্তগামী সূর্য বা চন্দ্র ও শুভ্র কুমুদ বৈরাগ্যের বা জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের প্রতীক। উদীয়মান সূর্য ও প্রভাতের উন্মেষের সঙ্গেই বিকশিত পদ্ম কর্মমার্গাবলম্বীদের প্রতীক। আর ভক্তিমার্গের প্রতীক হচ্ছে নীলপদ্ম, মধ্যাহ্ন-ভাস্কর ও সুবিস্তৃত বৃক্ষের সুনিবিড় ছায়া।

সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপের কথা উল্লেখ করেছি। যদিও এই দুটি জায়গার শিল্পকলা মৌর্যযুগের বলে মনে হয় না, তবু, তা যে মৌর্য ধারারই বিকাশ একথা বলতেই হবে। অতএব ঐ যুগের শিল্পকলার সঙ্গেই তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেব। সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্কর্যে জাতকের গল্প অনুযায়ী বুদ্ধের জীবনচিত্র বেশ আবেগ ও সরলতার সঙ্গে খোদিত হয়েছে। তার মধ্যে কোনো কোনোটি কলানৈপুণ্যের দিক দিয়ে বেশ উন্নত। সেখানকার খোদাই করা গ্রাম্য ঘরবাড়ি ঠিক বাঙলার বাঁশ ও খড়ের তৈরি ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারহুতের অল্প দূরে বিকানীয়ের এক ধনী ব্যবসায়ীর প্রাসাদ যেন ভারহুতের তেতলা দেবতার প্রাসাদের অনুকৃতি। এ থেকে মনে হয় শিল্পকলার একটা রীতি ভারতবর্ষে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত চলে এসেছে।

সাঁচি স্তূপের উচ্চাঙ্গের কারুকার্য সমন্বিত চারটি তোরণদ্বার ভারতীয় শিল্পকলা সেকালে কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল তারই সাক্ষ্যস্বরূপ। ভারহুতের

তোরণদ্বারও বেশ কারুকার্য সমন্বিত। সাঁচি ও ভারহুতের স্তূপের চার দিককার পাথরের রেলিঙ নানারূপ সুন্দর ভাস্কর্যে পরিপূর্ণ। শিল্পীরা তৎকালীন জীবনের চিত্র মনের আবেগে সরল বাস্তবতার সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন। ভারহুতের ভাস্কর্য সম্বন্ধে ফার্গুসনের মত এই—জগতের যে কোনো স্থানের ভাস্কর্যের চেয়ে সেখানে অধিক মনোরম ভাবে খোদাই করা অনেক হাতি, হরিণ, বানর প্রভৃতি জন্তু দেখতে পাওয়া যায়। সেরূপ মনোরম অনেক বৃক্ষও আছে। এবং যে রকম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও পারিপাট্য সহকারে খোদাইকার্য সুসম্পন্ন হয়েছে তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। সেখানকার মানুষের মূর্তিগুলি আমাদের সৌন্দয ও মাধুর্যের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হলেও তথাপি একত্র সমাবিষ্ট মূর্তিগুলি এক অপূর্ব সুষ্ঠুতার পরিচয় দেয়। সদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত র‍্যাফায়েলের পূর্বের শিল্পকলায় সম্ভবত এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কোথাও নেই। সাঁচি ও ভারহুতের শিল্পকলা যদিও বৌদ্ধভাবমূলক তবু, সেখানে বৈরাগ্য-প্রধান বৌদ্ধধর্মের চিত্রের পাশাপাশি জীবনের পরিপূর্ণ আনন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ সুরুচিসম্পন্ন ভাস্কর্য বিদ্যমান রয়েছে।

মৌর্যযুগে ভারতীয় শিল্প যে উন্নতি লাভ করেছিল পরবর্তীকালের শিল্পীরা সে ধারা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অনেক উন্নতি সাধনও করেছিলেন, যার পরিণতি গুপ্তযুগের শিল্পকলায়। মৌর্যযুগের অব্যবহিত পরে অমরাবতী, অজন্তা, মথুরা, গান্ধার, উদয়গিরি ও সারনাথ প্রভৃতি স্থানে শিল্পকলার বিশেষ চর্চা হয়। অমরাবতী শতবাহন রাজাদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্ধ্ররাজদের বদান্যতায় অমরাবতী প্রথম শ্রেণীর বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে ওঠে, এবং সেখানে শিল্পকলার প্রভূত চর্চা হয়। হ্যাভেলের মতে অমরাবতীর শিক্ষাকেন্দ্র অশোকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এবং তাঁর দ্বারা নির্মিত হওয়াও অসম্ভব নয়। অশোকের সময়ে শতবাহনরা মগধের অধীন ছিলেন। অমরাবতী তখনও তাঁদের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুমারস্বামীর মতে অমরাবতীর শিল্প খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অর্থাৎ অশোকের মৃত্যুর পর স্বাধীন শতবাহন রাজাদের রাজত্বকালের। 'অমরাবতীর উৎকীরণচিত্রের কলানৈপুণ্য বা ভোগানুকূল সৌন্দর্য অতিরঞ্জিত করা প্রায় অসম্ভব; এটি ভারতীয় ভাস্কর্যের অতি নমনীয় উৎকৃষ্ট অংশবিশেষ এবং অতিশয় আদিরসাত্মক' (কুমারস্বামী)।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে অজন্তার প্রথম পত্তন হয় এবং এই সময় থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত অজন্তার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। অজন্তা ভারতীয়—শুধু ভারতীয় কেন, সমস্ত জগতের—চিত্রশিল্পের মুকুটমণি বললেও অত্যুক্তি হয় না। গুপ্তযুগের শিল্পকলার সঙ্গে অজন্তার শিল্পের বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করব।

গান্ধার ও মথুরা-শিল্পের প্রধান বিশেষত্ব বুদ্ধমূর্তি। আগেই বলেছি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে বৌদ্ধরা মহাযান ও হীনযান এই দুই প্রধানভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাযান মতাবলম্বীরা বুদ্ধের উপাসনা করে, এমন কি বুদ্ধকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই কারণে বৌদ্ধদের ভিতর চাহিদা অনুযায়ী বৌদ্ধ অনুপ্রেরণায় গান্ধার ও মথুরার স্থানীয় শিল্পীরা একই সময়ে (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে) বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেন। 'গান্ধার শিল্পে গ্রীক প্রভাব সুস্পষ্ট কিন্তু গান্ধার ভাস্কর গ্রীক-দেবতা অ্যাপোলোকে বুদ্ধে পরিণত করেননি, বুদ্ধকেই অ্যাপোলোতে পরিণত করেছেন। তিনি কোনো ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুকরণ করেননি বটে, কিন্তু তাঁর এবং মথুরার বুদ্ধমূর্তির ভিত্তি একই ভারতীয় সাহিত্যিক ও লোকপরম্পরা প্রচারিত চিন্তাধারা' (কুমারস্বামী)। মথুরার শিল্পে বিন্দুমাত্র গান্ধার প্রভাবও বিদ্যমান নেই, এবং এটি স্পষ্টত ভারতীয় শিল্পীদের নিজস্ব সৃষ্টি। মার্শালের মতে গান্ধার বা গ্রীক প্রভাবান্বিত শিল্প ভারতীয় শিল্পের উপর সত্যিকারের স্থায়ী কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। অপর দিকে কনিষ্কের রাজত্বের প্রথম ভাগেই মথুরার শিল্পীরা গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থানে নিজেদের তৈরি মূর্তি পাঠিয়েছেন। গয়া, কাশীর শিল্পীরা সেই সব মূর্তিই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মথুরার মূর্তি নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। গুপ্তবুদ্ধ যে মথুরার রীতিতে তৈরি তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে গুপ্তবুদ্ধ গান্ধার শিল্পের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করে কুমারস্বামী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'বুদ্ধমূর্তি যে গ্রীক সৃষ্টি এ মতবাদের কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।'

গ্রীক প্রেরণায় ভারতে হিন্দু ও জৈনমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে এ মতও টিকতে পারে না। তবে ভারতীয় শিল্পকলায় সামান্য গ্রীকভাব যে কিছুটা প্রবেশ করেছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, যদিও তার মূল্য খুবই কম এবং তাও সম্ভবত রসবোধের দিকের চেয়ে ঐতিহাসিক দিক দিয়েই বেশি। হ্যাভেলের

মতে—'অশিক্ষিত গ্রীকো-রোমীয় শিল্পীদের কাছে তাদের গুরু বৌদ্ধভিক্ষুরা বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় ভাব সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়েছিলেন, গান্ধার ভাস্কর্য তাকে রূপ দেওয়ার স্থূল চেষ্টা মাত্র।' পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে শিব স্কন্দ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি বিক্রির কথা উল্লেখ করেছেন। কাজেই গান্ধার বুদ্ধমূর্তির সৃষ্টির আগেই ভারতবর্ষে মূর্তি তৈরি হয়েছে। গান্ধার শিল্পীদের মনের উপর শুধু বৌদ্ধ চিন্তাধারার প্রভাবই স্থান পায়নি হিন্দু-প্রভাবের অস্তিত্বও সুস্পষ্ট। চরসাদায় প্রাপ্ত মহেশ মূর্তি তার প্রমাণ। মথুরার শিল্পীরা শিবমূর্তি, নানা দেবীমূর্তি ও গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ তৈরি করেছেন। 'মথুরার শিল্পী দিয়ের তৈরি কাশিয়ার পরিনির্বাণ বুদ্ধমূর্তি বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর মিকেল এঞ্জেলোর মোজেসের সমকক্ষ' (পিপার)। শিল্পকলার দিক দিয়ে ভারতবর্ষে মথুরা অঞ্চলের মতো মূল্যবান স্থান খুব কমই আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মথুরা-শিল্প সম্বন্ধে যেরকম সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন তা এখনো হয়নি।

গুহা নির্মাণশিল্প গুপ্তযুগে বেশ উন্নতিলাভ করেছিল এবং পরে তা আরও উন্নত হয়। ভাজা, কার্লে প্রভৃতি গুহা শুধু সাধুদের বাসস্থানই ছিল না, চৈত্য বা উপাসনা-গৃহও সেখানে নির্মিত হয়েছিল এবং মনোরম ভাস্কর্য ও নানাবিধ কারুকার্যে সেগুলি সুশোভিত ছিল। প্রথম শতাব্দীতে নির্মিত বোম্বাই ও পুণার মধ্যবর্তী লোনাভলার নিকটবর্তী কার্লে গুহা কারুকার্যের দিক থেকে শুধু ভারতবর্ষে নয় সমস্ত জগতে শ্রেষ্ঠ। এই গুহাটি একজন ধনীমহাজনের বদান্যতায় নির্মিত হয়েছিল। কার্লের উপাসনা-গৃহের ভিতরটা ১২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, ৪৫ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ৪৫ ফুট উঁচু। চৈত্যের দুই দিকে পনরোটি করে ত্রিশটা স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের উপরকার চূড়া বিচিত্র কারুকার্য খচিত।

গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। কালিদাসের মতো কবি, শূদ্রকের মতো নাট্যকার, আর্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের মতো জ্যোতির্বিদ সে যুগের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ফা-হিয়েনের বর্ণনা অনুযায়ী তৎকালীন শাসন পদ্ধতিও অতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং জনসাধারণের মঙ্গলদায়ক ছিল। শিল্পকলার দিক থেকেও এ যুগ ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ যুগ, সমসাময়িক জগতে গুপ্তযুগের শিল্পীদের তুলনা অন্য কোনো দেশে ছিল না। গুপ্তযুগের বহু কীর্তি বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, খুব অল্পই রক্ষা পেয়েছে।

সামান্য যা কিছু বর্তমান আছে তা থেকেই কুমারস্বামী, হ্যাভেল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, জার্মান পণ্ডিত ডিট্স্ ও ফিশার, স্টেলা ক্রামরিশ ও লেডি হেরিংহ্যাম গুপ্তযুগের শিল্পকলার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের দিক দিয়ে সারনাথ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চম শতাব্দীর সারনাথের ভাস্কর্য ও ফ্লোরেন্সের ষোড়শ শতাব্দীর ভাস্কর্য উভয়কেই চরম উৎকর্ষের নিদর্শন বলা যেতে পারে। সারনাথে বুদ্ধমূর্তি ও ফ্লোরেন্সে ম্যাডোনা মূর্তির ভিতর দিয়ে সে উৎকর্ষ বিকশিত হয়ে উঠেছে। ডিট্সের মতে সারনাথের উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, মিকেল এঞ্জেলোর 'করুণা', র‍্যাফায়েলের 'ডিসপিউতা' ও লিওনার্দোর 'সান্ধ্যভোজন'-এর মতো সুন্দর—অঙ্গবিন্যাস, রেখার সুস্পষ্টতা, পরম রমণীয়তা ও নিখুঁত সম্পাদনের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। মিকেল এঞ্জেলোর আর্টের মতো গুপ্তযুগের ভাস্কর্য শারীর-সংস্থান বিদ্যার দিক দিয়ে নিখুঁত, অথচ তার প্রতি রক্তবিন্দুতে, শিরায় শিরায় উচ্চাঙ্গের ভাবধারা প্রবাহিত। প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তরঙ্গায়িত লীলাভঙ্গী আর আধ্যাত্মিক ভাববিকাশের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। বাস্তবের ভিত্তির উপর অতীন্দ্রিয় রসসৃষ্টি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের বিশেষত্ব।

শুধু ভাস্কর্যে নয়, স্থপতি বিদ্যায়, চিত্রশিল্পে এবং ধাতুনির্মিত বস্তু প্রস্তুতেও গুপ্তযুগ খুব উৎকর্ষ লাভ করেছিল। দিল্লীর বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ গুপ্তযুগের। স্তম্ভটি মাটির উপরে বাইশ ফুট এবং নিচে কুড়ি ইঞ্চি, এর ব্যাস নিচের দিকে ষোলো ইঞ্চি এবং উপরের দিকে বারো ইঞ্চি। এই লৌহস্তম্ভটি প্রায় দেড় হাজার বছর আগেকার তৈরি। ইউরোপ অনেক পরবর্তী কালে এত বড় লৌহ-স্তম্ভ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু বৃহত্ত্বের কথা বাদ দিলেও, এর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে এত দীর্ঘকাল রৌদ্র, বৃষ্টি ও হাওয়ায় বাইরে থেকেও তাতে বিন্দুমাত্র মরচে ধরেনি। গত একশো বছরের মধ্যে বিজ্ঞানের খুব দ্রুত উন্নতি হয়েছে, কিন্তু জল, বায়ু ও রৌদ্রের প্রভাবে মরচে ধরে না এরকম লোহা আজও কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করতে পারেননি। তামা ও ব্রোঞ্জের মূর্তি নির্মাণেও শিল্পীরা বেশ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। নালান্দায় আশি ফুট উঁচু এক তামার বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। সুলতানগঞ্জের (ভাগলপুর) সাড়ে সাত ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের অতি মনোরম বুদ্ধমূর্তি বর্তমানে বার্মিংহাম যাদুঘরের শোভা সম্পাদন করছে।

গুপ্তযুগের স্থাপত্যের মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত ইলোরার বিশ্বকর্মা চৈত্য

গৃহ অতি চিত্তাকর্ষক স্মৃতিচিহ্ন। বিশ্বকর্মা দেব-শিল্পী, সমস্ত শিল্পীদের উপাস্য দেবতা। ইলোরার শিল্পীরা একত্র হয়ে বিশ্বকর্মার উপাসনার জন্য মন্দির তৈরি করেছিলেন। এটি সেই সময়কার শিল্পীসঙ্ঘের অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই শিল্পীসঙ্ঘের সভ্যরাই ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের মন্দির তৈরি করেছিলেন। যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসী জেলার অন্তর্গত দেওগড়ের প্রস্তর নির্মিত দশাবতার মন্দির ও কানপুরের অন্তর্গত ভিটারগাঁওয়ের ইটের তৈরি মন্দির গুপ্তযুগের। ভিন্সেন্ট স্মিথের মতে দেওগড়ের মন্দিরের দেওয়ালে ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা যায় এমন অনেক নিদর্শন আজও বর্তমান; ভিটারগড়ের পোড়ামাটির ভাস্কর্য সুবিখ্যাত, এগুলির পরিকল্পনা বেশ সুচিন্তিত। সুন্দর ভাস্কর্যসমন্বিত ভগ্নাবশেষ থেকে মনে হয় গুপ্তযুগে সারনাথে অতি চমৎকার প্রস্তর মন্দির বর্তমান ছিল।

গুপ্তযুগের চিত্রশিল্প অজন্তায় পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছে। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে কয়েকজন ভিক্ষু লোকালয় থেকে দূরে শান্তিতে বৌদ্ধকৃষ্টির চর্চা করার জন্য অজন্তা স্থানটি খুঁজে বের করেন। অজন্তা বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত অজন্তায় মোট চারটি চৈত্য বা সমবেত উপাসনা গৃহ ও পঁচিশটি সন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য বিহার তৈরি হয়। অজন্তায় একটি বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সেখানে ধর্ম, দর্শন, শিল্পকলা, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চা হত। পাহাড় কেটে তৈরি উপাসনা-গৃহই ছিল শিক্ষাগার।

কালক্রমে অজন্তা গহন জঙ্গলে আবৃত হয়ে চামচিকে, বাদুড়, পেঁচা, পায়রা প্রভৃতির বাসস্থান হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেনাবিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী শিকার করতে গিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে অজন্তা আবিষ্কার করেন। প্রায় হাজার বৎসরের অবহেলা, চামচিকে প্রভৃতি পাখির উপদ্রব, অজ্ঞ সাধু সন্ন্যাসীদের পাকের ধোঁয়া ও প্রকৃতির স্বাভাবিক ধ্বংসলীলা অজন্তার অনেক সুন্দর জিনিসকে শ্রীহীন করেছে। যা অবশিষ্ট ছিল তারও অনেক জিনিস অজ্ঞ ইউরোপীয় কর্মচারীরা নকল করতে গিয়ে সস্তা বার্ণিশ লাগিয়ে নষ্ট করে ফেলেছে। অনেক পর্যটক নিজ নাম খোদাই করে এবং কোনো কোনো জিনিস কেটে নিয়ে আরো শ্রীহীন করতে সাহায্য করেছে। সমস্ত ধ্বংসের হাত এড়িয়ে যা কিছু আজও বর্তমান আছে তা

ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল শ্রদ্ধার ও গৌরবের বস্তু হয়ে থাকবে।

অজন্তা সম্বন্ধে বিভিন্ন শিল্পীরা যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা একটু বিস্তৃত হলেও উদ্ধৃত করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্য এ কথা সত্যি যে যিনি অজন্তা দেখেননি বর্ণনা দিয়ে তাঁকে অজন্তার চিত্রশিল্পের অপূর্ব কলানৈপুণ্য বোঝানো একরকম অসম্ভব। 'অজন্তার প্রাচীর-চিত্র ইউরোপের শ্রেষ্ঠ প্রাচীর-চিত্রগুলির—গিওত্তো ও সিনিওরেলির চিত্রের সমকক্ষ। এই সমস্ত চিত্রে বাস্তবতার পরিপূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রকাশ আমাদের তৎকালীন জীবনের একটা সত্যিকারের ছবি ও গুপ্তযুগের উন্নত সভ্যতার পরিচয় দেয়' (ডিট্স্)।

'মোটের উপর (অজন্তার) অঙ্কন মধ্যযুগের ইটালীয় অঙ্কনের মতো। ভাবভঙ্গী প্রকাশের ক্ষমতা শিল্পীদের পূর্ণমাত্রাতেই ছিল। তাঁদের আদর্শ ও অবস্থা, ভাবভঙ্গী ও সৌন্দর্যের জ্ঞান অতি আশ্চর্যজনক। কতকগুলি রঙ ফলানোর পরিকল্পনা খুবই অপূর্ব ও চিত্তাকর্ষক' (লেডি হেরিংহাম)।

'এক একটি চিত্রে চোখের হাসি থেকে আরম্ভ করে অঙ্গুলীর অগ্রভাগের গতিবিধির মধ্য দিয়ে এমন স্বচ্ছতা ও সজীবতা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে যে শিল্পকলার দিক দিয়ে লিওনার্দোর চিত্রই তার সঙ্গে তুলনার যোগ্য' (ফিশার)।

'অজন্তার ১৬ ও ১৭ নং গুহার এবং বাগের চিত্রগুলি সমসাময়িক পঞ্চম শতাব্দীর ভাস্কর্যের মতো ভারতীয় শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন' (ক্রামরিশ)।

'১৬ নং গুহা বৌদ্ধ ভারতের গুহামন্দিরগুলির মধ্যে খুবই মূল্যবান। অতি প্রাচীনকালের পক্ষে সেখানকার চিত্রশিল্প জগতের মধ্যে অতি অদ্ভুত। খোদাই, স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের রীতি অতি সুললিত ও লাবণ্যময়। এই গুহার ছাদের নিম্নপৃষ্ঠ বিচিত্র সুন্দর সব চিত্রে ব্যাপকভাবে সুশোভিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই সব চিত্রের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ঐ গুহার হল-এর বামদিককার প্রাচীর গাত্রে এক মরণোন্মুখ রাজকুমারীর অতি সুন্দর চিত্র আছে। জগতের শিল্পকলার ইতিহাসে এর চেয়ে মনোরম চিত্র আছে কিনা সন্দেহ। এ ছাড়াও এই প্রাচীর গাত্রে আরো অনেক সুন্দর চিত্র আছে' (মুকুল দে)। ১৭ নং গুহার হল-এর ডানদিককার প্রাচীর গাত্রে বিজয়সিংহের লঙ্কায় অবতরণ এবং লঙ্কা বিজয়ের এক বিরাট ও চমৎকার চিত্র আছে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর বুদ্ধ যখন তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের নিকট যান, সে-সময়কার যে একটি চিত্র এই গুহায় আছে তার সম্বন্ধে উপরোক্ত শিল্পী লিখেছেন—

'প্রগাঢ় প্রেম ও গভীর ধর্মানুরাগের নিদর্শন এই চিত্রটি মহিমায় ও স্নিগ্ধতায় পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ভারতীয় শিল্পকলা যে কত দূর উন্নতি করেছিল এটি অনেকের কাছে সেই সত্য উদ্ঘাটিত করবে।' 'এক নং গুহার বহির্ভাগ অতি মনোরম ও বহু কারুকার্য সমন্বিত এবং অপরূপ চিত্রে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত চিত্র ভাবতবর্ষে বৌদ্ধ শিল্পকলার উচ্চ আদর্শের উদাহরণ—এই আদর্শ অতিক্রম করা হয়ে থাকলেও খুব কম ক্ষেত্রেই তা সম্ভবপব হয়েছে। এই গুহায় জগতের কয়েকটি অত্যুৎকৃষ্ট কীর্তি রয়েছে' (মুকুল দে)। গৌতম-যশোধারা এবং মার কর্তৃক বুদ্ধের প্রলোভন—এ দুটিও অত্যন্ত উঁচুদরের ছবি।

অজন্তা ছাড়া গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত বাগ গুহার চিত্রগুলি গুপ্তযুগের। একই ধরনের বৌদ্ধ চিত্রশিল্পের মধ্যে ভারতবর্ষেব বাইবে হলেও সিংহলের সিগিরিয়াব নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'অজন্তা, বাগ ও সিংহলেব গুহার ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প সমস্ত ভাবতীয় জাতির পূর্বপুরুষলব্ধ অতি মূল্যবান ও সুদুর্লভ সম্পত্তি। এগুলি, যেমন কলানৈপুণ্য তেমনই অতীত ভারতীয় সভ্যতার রেকর্ড হিসাবে মূল্যবান' (মুকুল দে)।

হ্যাভেলের মতে অজন্তাব সমগোত্রীয় সিগিরিয়ার চিত্রাবলীতে বত্তিচেলির চিত্রের মাধুর্য বর্তমান। কে জানে যুগ যুগ ধরে কত ভারতীয় মিকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফাইয়েল, লিওনার্দো, বত্তিচেলি ও গিয়োত্তো সমাহিত চিত্তে অজন্তা প্রভৃতি স্থানের অনুপম শিল্প সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতবর্ষ আজ সে শিল্পীদের নামও জানে না, প্রাণভরে তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতেও শেখেনি। আরো কত শিল্পীর কীর্তি যে তাঁদের অনুপযুক্ত দেশবাসীর অবজ্ঞায় ও ঔদাসীন্যে লোপ পেয়েছে তা কে বলবে! নির্জন বাগ গুহায় যে সমস্ত শিল্পী চিত্র অঙ্কনে মগ্ন ছিলেন তাঁদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজশক্তি শীতকালে সেখানে মেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। নৃত্যগীতে রত আনন্দে উৎফুল্ল লোকজনের সঙ্গে মিলে মিশে শিল্পীদের মনের স্বাভাবিক আনন্দ যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠান। কিন্তু আজ ভারতে শিল্পীর সে আদর কোথায়?

গুপ্তযুগের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মা (৬০০-৬২৫ খৃষ্টাব্দ) ও নরসিংহবর্মার (৬২৫-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ) রাজত্বকালে শিল্পকলা বেশ উন্নতিলাভ

করে। 'তামিল সভ্যতার ইতিহাসে মহেন্দ্রবর্মা শ্রেষ্ঠব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন' (কুমারস্বামী)। ত্রিচিনপল্লী ও মামল্লপুরমের (মহাবলীপুরমের) গুহামন্দির ও রথ, পল্লব-শিল্পের নিদর্শন। কুমারস্বামীর মতে মামল্লপুরমের ভাস্কর্য খুবই উচ্চাঙ্গের। গুপ্তযুগের মূর্তির চেয়ে পল্লব মূর্তি কৃশ, মুখ বেশি ডিম্বাকৃতি এবং চোয়ালও বেশি উঁচু। এখানে যে পাথর কেটে মন্দির তৈরি করার নমুনা দেখতে পাই ক্রমে তা উন্নতিলাভ করে। সে উন্নতির পরিণতি ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির (আনুমানিক ৭৮০ খৃষ্টাব্দ)। এর আগে তৈরি কাঞ্চীর কৈলাসনাথের (আনুমানিক ৭০০ খৃষ্টাব্দ) এবং পট্টডকলের বিরূপাক্ষ মন্দিরও (আনুমানিক ৭৪০ খৃষ্টাব্দ) উন্নতির পরিচয় দেয়। আগেই বলেছি ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির জগতের একটি আশ্চর্য জিনিস হিসাবে গণ্য। পাহাড় কেটে এমন সুন্দর মন্দির তৈরি করা আর সম্ভবপর হয়নি। 'এটি ভারতবর্ষের কয়েকটি অত্যুজ্জ্বল সুন্দরতম ভাস্কর্যের দ্বারা সুশোভিত। রাবণের কৈলাস পর্বত (শিবের পাহাড়-সিংহাসন) ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য' (কুমারস্বামী)।

পল্লবদের পরে নবম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সর্বময় কর্তৃত্ব চোলদের হাতে এসে পড়ে। চোলরাজারাও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বলতে গেলে স্থপতিবিদ্যার দিক দিয়ে চোলযুগ দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। চোলরাজ রাজারাজের সময় তৈরি তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির চোলযুগের শ্রেষ্ঠ মন্দির। 'রাজেন্দ্র চোলদেবের নূতন রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডপুরমের বিমানও (মন্দিরের অংশবিশেষ) তাঞ্জোরের মন্দিরের মতো দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য' (ক্রামরিশ)। 'তাঞ্জোর ও গঙ্গাইকোণ্ডপুরমের বিমানের মধ্য দিয়েই দ্রাবিড় স্থাপত্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছে। তাঞ্জোরের চমৎকার মন্দিরের সুঠাম গঠন, পরিকল্পনা ও ভঙ্গিমার গম্ভীর সরলতা, বাহুল্যবর্জিত কারুকার্যের সমন্বয় এবং মনোরম নির্মাণকলা দ্রাবিড় স্থাপত্যের গৌরব অন্য যে কোনো কীর্তির চেয়ে বেশি প্রতিষ্ঠা করেছে' (জোভো ডুব্রয়ল)।

চোলযুগের পিতল-ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক মূল্যবান অধ্যায়। শৈবভক্তদের, বিশেষ করে আপ্পাস্বামীর মূর্তি বাস্তবিকই খুব চিত্তাকর্ষক। আপ্পাস্বামী ভক্তিভারাবনত হৃদয়ে করযোড়ে একটি নিড়ানী

নিয়ে মন্দিরে আগাছা উৎপাটনের জন্ম মন্দির থেকে মন্দিরে তীর্থযাত্রা করেছেন। কিন্তু রাজারাজের তাঞ্জোর মন্দিরের নটরাজ এবং ঐ জেলা থেকে প্রাপ্ত, ও মাদ্রাজ যাতুঘরে রক্ষিত, আরো তুটি নটরাজের মূর্তি চোলযুগের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'এই তাণ্ডব নৃত্যের মূর্তিতে শিব অন্তগামী স্বর্ণরূপ অগ্নি-মণ্ডলীতে পরিবৃত হয়ে ত্রিপুরাস্থরের উপর নৃত্য করছেন—এক হাতে যজ্ঞাগ্নি এবং আর এক হাতে ডমরু বাজিয়ে মহাকালের বুকে আঘাত করছেন' (হ্যাভেল)।

মন্দিরের পুরোহিতরা নটরাজ সম্বন্ধে যে শ্লোক আবৃত্তি করেন তার মর্ম এই: 'হে নটরাজ, যারা জাগতিক জিনিসেই নিমগ্ন তুমি ডমরু বাজিয়ে তাদের আহ্বান করছ, অবনতদের ভয় দূর করে তোমার স্বর্গীয় প্রেমে সান্ত্বনা দিচ্ছ। তুমি তোমার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছ যে তোমার উন্নত পাদপদ্মেই মুক্তির আশ্রয়, তুমি যজ্ঞাগ্নি হাতে নিয়ে বিশ্ব সংসারে নৃত্য করছ, তুমি আমাদের রক্ষা কর।' পিপারের মতে নটরাজে সৃজন, পালন ও সংহার; কোরক, প্রস্ফুটিত ও ম্লান পুষ্প, কৈশোর, পরিণত বয়স ও বার্ধক্য—এই সমস্ত ঘটনাবলীর শাশ্বত আবর্তন অত্যাশ্চর্য ও পরিপূর্ণ সমন্বয়ের সঙ্গে বিশ্বছন্দের নিত্যরূপে মূর্তি পরিগ্রহ করেছে।

উত্তর ভারতের অনেক মন্দির মুসলমানদের আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে, তবুও এখনো যা অবশিষ্ট আছে তা থেকে মনে হয় এই যুগে উত্তর ভারতেও যথেষ্ট মন্দির তৈরি হয়েছিল। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত নির্মিত উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর, পুরী, কোণারক প্রভৃতি স্থানের মন্দির বেশ উচ্চাঙ্গের। কুমারস্বামীর মতে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির (আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ) ভারতীয় মন্দিরের মধ্যে সর্বাধিক মহিমান্বিত। পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দির একাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গদেব তৈরি করেন। পুরীর মন্দির গাত্রে অতি কুৎসিত ভাস্কর্য আছে। শ্লীলতার মাত্রা রক্ষা করে কোনো আধুনিক পুস্তকে তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয়। এর যত বড় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেওয়া হোক না কেন, সর্বসাধারণের পক্ষে এ কখনো কল্যাণকর হতে পারে না। অবশ্য শিল্পী কল্যাণ অকল্যাণের দিকে চেয়ে সৃষ্টি করেন না, মনের আনন্দে সৃষ্টি করে যান। তবুও মন্দির গাত্রে এরূপ সৃষ্টি নিতান্তই ছন্দভঙ্গ করে এবং তা সম্পূর্ণ অবাঞ্ছনীয়।

কোণারকের বিখ্যাত সূর্য-দেউল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত এবং অতি মনোরম। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই ২৩০ ফুট উঁচু মন্দিরের উপরের ভাগের প্রায় ১০০ ফুট খুব সম্ভবত পর্তুগীজ জলদস্যুদের আক্রমণে ধ্বংস হয়। ১২০০ শিল্পী ১৬ বৎসর ধরে কাজ করে এই মন্দির নির্মাণ করে। এই মন্দির নির্মাণে ৩৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, ৮ ইঞ্চি চওড়া এবং ১০ ইঞ্চি উঁচু লোহার কড়ি ব্যবহৃত হয়েছে। যান্ত্রিক যুগের পূর্বে এরকম কড়ি তৈরি লৌহ-শিল্পীদের অদ্ভুত নিপুণতার পরিচয় দেয়। ইউরোপ এর অনেক পরে এ রকম জিনিস তৈরি করতে পেরেছে। এই মন্দিবেব পাশে পতিত অবস্থায় ১৩০০ মণ ওজনেব একটি গজসিংহ মূর্তি আছে। মন্দির যখন অটুট অবস্থায় ছিল তখন ১৭০ ফুট উঁচুতে মন্দিরগাত্রে সেটি সন্নিবিষ্ট ছিল। এই সমস্ত মন্দির উড়িষ্যার তৎকালীন স্থপতিবিদ্যার উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়।

মধ্যভারতের চন্দেল্ল রাজাদের সময়কার বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত খাজুরাহোর মন্দিরগুলিও বেশ সুন্দর; এগুলির মধ্যে আনুমাণিক হাজার খৃষ্টাব্দে নির্মিত কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির তাঞ্জোরের মন্দিরের সঙ্গে তুলনার যোগ্য।

অনেকে মনে করেন এই সমস্ত মন্দির নির্মাণ একদিকে বর্বরসুলভ আড়ম্বর-প্রিয়তা এবং অপরদিকে গভীর কুসংস্কার ও আধ্যাত্মিক অবনতির ফল। এরূপ মন্তব্য তৎকালীন সামাজিক জীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। তখনকার দিনে মন্দির শুধু ধর্মশিক্ষাগৃহ নয়, পার্থিব-শিক্ষা-গৃহরূপেও ব্যবহৃত হত। এক-একটি মন্দির এক-একটি বড় বিদ্যালয় ছিল। রাজা ভোজের ধারা নগরীর বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজ তাঁর সরস্বতী মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুধু তাই নয়, খাজুরাহো মন্দিরের যেখানে পবিত্র দেবগৃহ তার প্রবেশ-পথে অনেক প্রশস্ত কক্ষ আছে; সেই সমস্ত কক্ষ সভাগৃহ, রঙ্গমঞ্চ ও সঙ্গীতশালারূপে ব্যবহৃত হত। অতএব ধর্মানুষ্ঠান, শিক্ষা ও নির্দোষ আমোদ-প্রমোদের অপূর্ব সমাবেশ সেকালে মন্দিরের সাহায্যে সম্ভব হয়েছিল। ধর্ম যদি বাস্তব ভিত্তির উপর না দাঁড়িয়ে শুধু নীতিবাদে পরিণত হয়, তবে তা জাতির প্রাণস্পর্শ করতে পারে না। ভারতবর্ষে ধর্ম কখনো একটা বিধিনির্দিষ্ট ব্যবস্থার গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়নি, জীবনের প্রতি কার্যের সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী মিলন ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। মন্দির এই বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ়তর রূপ দিয়েছে।

উপরে খাজুরাহোর মন্দিরের উল্লেখ করেছি। সেখানে জৈনমন্দিরও আছে। এক সময় দক্ষিণ-ভারতে, বিশেষ করে মহীশূরে জৈনদের খুব প্রভাব ছিল। ভদ্রবাহু মগধ থেকে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে মহীশূরের অন্তর্গত শ্রবণ-বেল-গোলায় তাঁর প্রধান কেন্দ্র করেছিলেন। তাই পাণ্ড্যরাজ্যের অন্তর্গত কালুগামালাই নামক স্থানে অতি সুন্দর একটি পাথরের মন্দির রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আবু, পালিতানা ও গিরনারে অনেক বিখ্যাত জৈনমন্দির তৈরি হয়। পালিতানা ও গিরনারের মন্দিরগুলি দ্বাদশ শতাব্দীর পরে তৈরি। এগুলির মধ্যে আবুর মন্দিরই বিশেষ প্রসিদ্ধ। আবু পর্বতের দিলওয়ারার মন্দির সম্বন্ধে টড লিখেছেন—'ভারতবর্ষের মন্দিরগুলির মধ্যে এটি নিঃসংশয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ, একমাত্র তাজমহল ছাড়া আর কোনো অট্টালিকা নেই যা এর সমকক্ষ হতে পারে।' 'আবুর চারটি মন্দিরই শ্বেতপাথরের তৈরি, তার মধ্যে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরটি শ্রেষ্ঠ।......১০৩১ খৃষ্টাব্দে বিমলসা (গুজরাটের এক ধনী মহাজন) কর্তৃক মন্দিরের উৎসর্গ কার্য সম্পন্ন হয়' (পুরাণচন্দ্র নাহার ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ)। আবুর মন্দির সম্বন্ধে কুমারস্বামী কাজিন্‌স্‌-এর নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন: 'এই সব মন্দিরের ছাদের নিম্নপৃষ্ঠ, স্তম্ভ, দরজার খোপ, কুলঙ্গী প্রভৃতি স্থানের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোদাই কারুকার্য এমন মনোহরভাবে সর্বত্র সুসজ্জিত রয়েছে যে তা বাস্তবিক অত্যদ্ভুত। ভঙ্গুর, পাতলা ও নির্মল পাথরের উপর শঙ্খের মতো কাজ অন্য কোথাও এমন দেখা যায় না। কতকগুলি পরিকল্পনা সত্যি সত্যি যেন স্বপ্নময় সৌন্দর্যের বাস্তবরূপ। সমস্ত কাজ এত কমনীয় যে সাধারণভাবে বাটালী দিয়ে কাটলে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যেত। এরূপ কথিত আছে যে মার্বেল ঘষে ঘষেই এর অধিকাংশ প্রস্তুত হয়েছে, এবং শিল্পীদের অপসৃত মার্বেল ধূলির পরিমাণ অনুসারে অর্থ দেওয়া হত।'

বাঙলায় পালরাজাদের সময় শিল্পকলার বেশ চর্চা হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'ধর্মপাল ও দেবপাল দেবের রাজত্বকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তরনির্মিত মূর্তি এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।' কুমারস্বামীর মতে পারিপাট্যের দিক দিয়ে পালযুগের শিল্পকলা খুবই উচ্চাঙ্গের, পরিকল্পনা

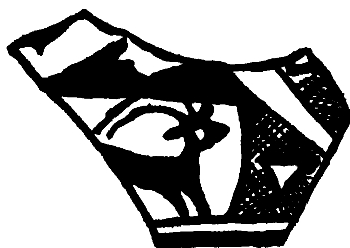
মনোহারী এমন কি শৌখিন। ভারতবর্ষ তার অধিকাংশ শিল্পীর নাম হারিয়ে বসে আছে, কিন্তু ধীমান ও বীতপাল নামে পালযুগের দুজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর নাম সৌভাগ্যবশত পাওয়া গিয়েছে।

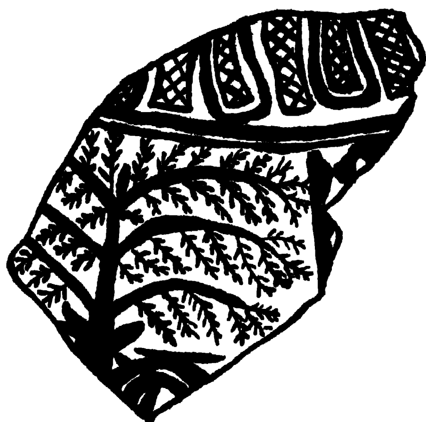
বাঙলা পালযুগের পূর্বেও শিল্পকলায় বেশ উন্নত ছিল। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত শিল্প তার নিদর্শন। পাহাড়পুর-শিল্প গুপ্ত-শিল্পের বাঙলা সংস্করণ। ওখানকার ভাস্কর্য গুপ্ত-ভাস্কর্যকে পাল ও সেন যুগের ভাস্কর্যের সঙ্গে সংযোজিত করেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষ অনেক বিষয়েই এশিয়ার শিক্ষকের স্থান অধিকার করেছিল। শিল্পেও তার সে স্থান বজায় ছিল। মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, সিংহল, আনাম, কাম্বোডিয়া, বলী ও যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের শিল্পকলার উপর ভারতীয় শিল্পের প্রভাব অপরিমিত। 'সুদূর প্রাচ্যের (চীন, কোরিয়া ও জাপান) শিল্পকলায় ভারতীয় ভাববৈশিষ্ট্য যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান' (কুমারস্বামী)। কাম্বোডিয়ার আঙ্কোর-ভাটের ও যবদ্বীপের বড়ভূধরের বিখ্যাত মন্দির ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাবের জলন্ত নিদর্শন। ফার্গুসন-এর মতে ভারত থেকে শিল্পীরা যবদ্বীপে গিয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই পণ্ডিতের মতে—'অজন্তা, নাসিক প্রভৃতি স্থানের গুহার ভাস্কর্য ও কারু-কার্যের যবদ্বীপের কীর্তির সঙ্গে খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রায় সব দিক দিয়ে এতটা মিল আছে যে, শিল্পনৈপুণ্যের সমতা নিঃসন্দিগ্ধ।' বড়ভূধরের মন্দির জগতের সব চেয়ে আশ্চর্য বস্তুর তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। মন্দিরের সমস্ত ভাস্কর্য একটার পর একটা সাজালে তিন মাইল লম্বা স্থান অধিকার করবে। এই মন্দির অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের ভিতর তৈরি।

ভারতীয় শিল্পকলার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষ সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গের মতো শিল্প-কলায়ও উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল—এমন কি সমসাময়িক জগতে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিল—একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে ভারতীয় শিল্পের যথার্থ আদর অনেকদিন দেশ থেকে প্রায় লোপ পেয়েছে। জার্মান পণ্ডিত হার্মান গয়েট্‌স্‌ লিখেছেন, 'অনিচ্ছাসত্ত্বে অসম্পূর্ণ জ্ঞান বা অজ্ঞতাবশত ইংরেজরা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সংস্কার নষ্ট করেছে, ভারতীয় রাজন্যবৃন্দও ইউরোপীয় শিল্পের

পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের ধ্বংসকার্যে সমান অংশ গ্রহণ করেছেন।' কিন্তু এই অন্ধকারের ভিতরে শিল্পীশ্রেষ্ঠ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দীপবর্তিকা হস্তে প্রবেশ করে—পুনরায় ভারতের দৃষ্টি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার প্রতি আকৃষ্ট করেছেন, তাই তিনি ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্যরা আমাদের পরম শ্রদ্ধার পাত্র।





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা

প্রাচীন ভারতবর্ষ অঙ্ক, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, কাব্য, নাটক, গল্প প্রভৃতি সাহিত্যের সকল বিভাগ ও দর্শনে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ করেছিল। এমন কি সেকালে জগতে অন্য কোনো দেশ ভারতবর্ষের সমকক্ষ ছিল না। ধর্মজগতেও ভারতবর্ষের মতো স্বাধীন চিন্তার এমন পরিপূর্ণ বিকাশ অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থেনিস থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতাব্দীতে আরবীয় পর্যটক আল ইদ্রিসী পর্যন্ত সকলেই ভারতীয় চরিত্রের অশেষ প্রশংসা করেছেন। ভারতীয়দের সততা সত্য-বাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা সকল বিদেশীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা কি দৈবঘটিত পরমাণু সংহতির মতো দুর্বোধ্য, না আকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতো নিতান্ত আকস্মিক, না কোনো সুনির্দিষ্ট কারণে সংঘটিত হয়েছে—এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে।

ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলেই যে এ উন্নতি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এমন সুচিন্তিত শিক্ষাপ্রণালীও সেকালে জগতের অন্য কোথাও ছিল না। ছাত্র ছেলেবেলা থেকেই গুরু গৃহে বাস করে শিক্ষালাভ করত। গুরুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লাভ করার সুযোগ

পেয়ে গুরুর কাছ থেকে শুধু যে বিদ্যার্জনই হত তা নয়, গুরুর চরিত্রের প্রভাবও ছাত্রের উপর পড়ত। গুরুও ছাত্রের চরিত্রের উৎকর্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন। বাল্যশিক্ষার নীতিবাক্য পড়িয়ে ছাত্রের চরিত্রের উন্নতিসাধনের ব্যর্থ প্রয়াস ভারতবর্ষ কোনোদিন করেনি। কিম্বা যার খারাপ কিছু করবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই তাকে সচ্চরিত্রতার পুরস্কার দিয়ে ছাত্রদের চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে উদ্বুদ্ধ করার প্রহসনও অভিনয় করেনি।

গুরু সবল ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন, তাঁর দৈনন্দিন সংস্পর্শে এসে ছাত্রের অজ্ঞাতসারে তার মানসিক চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠত। শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার মধ্যে যেমন মানুষের কোনো আয়াস নেই, কিম্বা এত বড় একটা কাজ—যা না করলে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়—তা করার জন্য কোনো গর্ব বোধও নেই, তেমনি স্বাভাবিক ভাবেই ছাত্ররা মহৎ হয়ে উঠত, অথচ তারা যে এত বড হয়েছে তা বুঝতেই পারত না। তাই ভারতবর্ষ জোর করে বলেছে: 'বিদ্যা বিনয় দান করে।' সেটা বিনয়ের অহঙ্কার নয়, সত্যিকারের বিনয়। গুরুর কাছে আসা মাত্র ভর্তির ফি এত ও মাসে মাসে এত মাইনে দিতে হবে, একদিন দেরি হলে জরিমানা হবে এ-কথা ছাত্রকে শুনতে হত না। দরিদ্র বলে কোনো ছাত্রের বিদ্যাভ্যাসের বিন্দুমাত্র অসুবিধাও ছিল না। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকে গুরু ছাত্র পর্যায়ভুক্ত করতেন। সমাজও গুরু ও ছাত্রদের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করত। সে ব্যবস্থা এমন ভাবে হত যে তা কেউ অনুভবই করতে পারত না। বরং এই ব্যবস্থা করা, সমাজ পুণ্যকার্যের মধ্যে গণ্য করত বলে তা পরম আনন্দ সহকারে নিষ্পন্ন হত।

প্রাচীন কাশীবিদ্যালয়ের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ সমাজের মৃতকল্প অবস্থায় এখনও হাজার হাজার ছাত্রের পড়াশুনার ব্যবস্থা করছে, কিন্তু তার জন্য সরকারী তহবিল থেকে বার্ষিক লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। কুশাগ্র বুদ্ধিসম্পন্ন আচার্যরা গ্রীষ্মকালে খালি গায়ে বা বড় জোর একখানা পাতলা চাদর আর শীতকালে একখানা বালাপোষ গায়ে দিয়ে দৈনিক আট দশ ঘণ্টা ছাত্র পড়াচ্ছেন। ছাত্ররাও ছত্রে খেয়ে পরম আনন্দে পড়াশুনা করছে।

'তৃণ শয্যা জীর্ণবাস, ভিক্ষার তণ্ডুল,
করিতে কি পারে মন তাহার আকুল'

কবির এই উক্তি এখনো সেখানে বিদ্বানের কণ্ঠগত নীতিবাক্যে পরিণত হয়নি ; পৃথিবীতে সূর্যের অস্তিত্বের মতো বাস্তব সত্য।

ভারতবর্ষে শিক্ষা রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ছিল না এ-কথা আগে বলেছি। শিক্ষা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত হলে জাতির স্বাধীন চিন্তার বিকাশেব পথ রুদ্ধ হয়, ভারতবর্ষ এ-কথা সম্যক উপলব্ধি করে, করগ্রহণ, দণ্ডদান ও প্রজারক্ষাব ভার দিয়েছিল রাজশক্তির উপর, কিন্তু শিক্ষার ভার রেখেছিল নিঃস্বার্থসেবী সমাজের পবম হিতাকাঙ্ক্ষী আচার্যদেব উপর। যিনি যত বড পণ্ডিতই হন না কেন, রাষ্ট্রতরঙ্গের সঙ্গে যদি তাঁকে তাল রাখতে হয় তবে তাঁর পাণ্ডিত্য সমাজের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করতে পারে না, বরং সে পাণ্ডিত্য সমাজকে পঙ্গু কববাব যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষ পাণ্ডিত্যের এত বড অমর্যাদা করে তার সভ্যতার আদর্শকে ধূলায় ধূসরিত করেনি।

ভারতবর্ষ চিরকাল সৌন্দর্যের উপাসক—তাই তার উপাস্য দেবতা : সত্যং শিবং সুন্দরম্। এই সৌন্দর্যবোধই তার শিক্ষাপদ্ধতিকে শুভ্র মহিমাময় আসন থেকে কর্দমাক্ত রাজপথে টেনে আনতে দেয়নি। ব্যক্তিগত পাণ্ডিত্য যত অগাধই হোক না কেন, তা যদি রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয় তবে তা ছাত্রদের কাছে প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে স্ফুরিত স্বাভাবিক ভক্তির দাবি করতে পাবে না। প্রাচীন ভারতের আচার্যরা সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করতেন, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর অধ্যাপকরা অশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও রাষ্ট্রনীতি তাঁদের নিয়ামক বলে সমাজে তাঁরা গৌণ আসন গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রাচীন ভারতের আচার্যরা রাজা ও সমাজের কাছে সমভাবে আদৃত ও পূজিত হতেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ সেবক যদি সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ না করে তবে সমাজে স্বচ্ছন্দ স্রোত প্রবাহ বন্ধ হয়ে তাতে শেওলা জন্মায়, অবশেষে সকল চলাচলের পথই রুদ্ধ হয় এবং জাতির সত্যিকারের অকল্যাণ ঘটে। ভারতের ঋষিরা পূর্বাপর চিন্তা করে সে অকল্যাণের রাস্তা উন্মুক্ত হওয়ার সুযোগ দেননি। সমাজ-জীবনের আসল ভিত্তি শিক্ষাকে সর্বতোভাবে স্বাধীন রেখেছিলেন।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালেই ভারতবর্ষ হৃদয়ঙ্গম করেছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের মতো প্রাচীন উপনিষদে পাই—পিতা আরুণী ছেলে-বেলায় শ্বেতকেতুকে বিদ্যাভ্যাসে অমনোযোগী দেখে তাঁদের বংশে বিদ্যার্জন না করে কেহ ব্রহ্মবন্ধু হয়নি এ-কথা বলে বিদ্যাশিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করছেন। শুধু

তাই নয় শিক্ষা যে কত ব্যাপক ছিল তার আভাসও ঐ উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদ থেকে পাই। একদিন নারদ সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে ভগবন্, আপনাদের মতো জ্ঞানীজনের নিকট শুনেছি আত্মবিদ লোক শোক উত্তীর্ণ হয়। আমি শোক অনুভব করছি, আমাকে শোকের পরপারে নিয়ে যান।' তখন সনৎকুমার বললেন, 'তুমি যা জানো, আগে তা আমাকে বল, পরে তোমাকে অজানা বিষয়ের উপদেশ দেব।' প্রত্যুত্তরে নারদ বললেন, 'আমি ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ববেদ, পঞ্চমবেদ—ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, পিতৃলোক সম্পর্কিত বিদ্যা, রাশি (গণিতবিদ্যা), দৈবতবিদ্যা, নিধিবিদ্যা (খনিজশাস্ত্র), বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিবিদ্যা, দেববিদ্যা (নিরুক্ত), ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবজনবিদ্যা (নৃত্য, গীত ও শিল্প বিজ্ঞান প্রভৃতি) এই সমস্ত বিদ্যা অবগত আছি।'

মুণ্ডকোপনিষদে অপরা বিদ্যার মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ ও জ্যোতিষের উল্লেখ আছে। ভাসের প্রতিমা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে রাবণ বলছেন, 'আমি অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমেত বেদ, মানবধর্মশাস্ত্র, মহেশ্বরকৃত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতির অর্থশাস্ত্র, মেধাতিথির ন্যায়শাস্ত্র ও প্রচেতসের শ্রাদ্ধকল্প পড়েছি।' শিক্ষা যে শুধু ব্যাপক ছিল তা নয়, খুব উচ্চাঙ্গেরও ছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অধ্যায়ে তার অনেকটা আভাস দিয়েছি। কিয়ের মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে শিক্ষা বা উচ্চারণ প্রণালী ভাষার মূল জিনিসের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ছিল যে তা থেকে আধুনিক যুগেও অনেক শেখবার আছে। 'মাতার ন্যায় সুখদায়িনী কি?—সুবিদ্যা'—আচার্য শঙ্করের এই অমৃতময়ী বাক্য প্রাচীন ভারতের চিন্তাধারার মূর্ত রূপ।

সুপণ্ডিত আচার্যের কাছে ছাত্ররা আপনি এসে জুটে যেত। এমনি করে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠত। কোনো এক জায়গায় বিভিন্ন বিভাগের আচার্য সমবেত হলে সেখানে আপনিই একটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হত। প্রয়োজনবোধে, জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত সাহায্য ও রাজবদান্যতা এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টিসাধন করত। কিন্তু এঁদের কেউই অর্থ দিয়ে আচার্যদের নিয়ন্ত্রিত করার কথা মনেও স্থান দিতেন না। শিক্ষা-ব্যাপারে আচার্যরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ

করতেন। এমনি করে ভারতবর্ষে বহু বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, নালান্দা, কাশী, বলভী, অমরাবতী, অজন্তা, মাদুরা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। প্রত্যেকটি বড় বৌদ্ধ ও জৈনবিহার এক-একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনী প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগের। তক্ষশিলা চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল এবং উজ্জয়িনী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দানে। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না, কিন্তু চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করলেও অন্যান্য বিষয়েও উচ্চাঙ্গের শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। খ্যাতনামা চিকিৎসক জীবক যেমন তক্ষশিলার কৃতি ছাত্র, বিখ্যাত বৈয়াকরণিক পাণিনি ও অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা কৌটিল্যও তেমনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সুযোগ্য ছাত্র। পাণিনি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর; জীবক মগধের রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন অতএব তিনি ছিলেন খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর এবং কৌটিল্য খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লোক। জীবকের পড়া শেষ হবার পর তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল তা থেকে মনে হয় তক্ষশিলায় চিকিৎসাশাস্ত্র-শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে উদ্ভিদ-বিদ্যারও বিশেষভাবেই চর্চা হত। সাত বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার পর জীবকের শিক্ষক বললেন, 'এই কোদালী নাও, এবং তক্ষশিলার চারধারে এক যোজন ধরে অনুসন্ধান কর, যদি এমন কোনো চারাগাছ দেখা যায় যার ওষুধ হিসাবে কোনো গুণ নেই, তবে সেটি তুলে নিয়ে এস।' জীবক শহরের চারিদিক ঘুরে এমন একটি গাছও দেখতে না পেয়ে গুরুর কাছে এসে সেই কথা নিবেদন করলেন। গুরু জীবকের জ্ঞানলাভ সম্পূর্ণ হয়েছে বুঝে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার ছেলেদের শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা আছে। তা থেকে বুঝতে পারা যায়, তাদের শিক্ষা খুবই ব্যাপক ছিল। 'বৃত্ত চৌলকর্মা লিপিং সংখ্যানং চোপযুঞ্জীত। বৃত্তোপনয়ন স্ত্রয়ীমান্বীক্ষিকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্তা-মধ্যক্ষেভ্যঃ দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রয়োক্তৃভ্যঃ।'—চূড়াকর্ম শেষ হলে লিপি ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করবে (চূড়াকর্ম সেকালে পাঁচ বৎসর বয়সে সম্পন্ন হত), উপনয়নের পর শিষ্টদের অর্থাৎ সর্ববাদীসম্মত সুপণ্ডিত আচার্যদের কাছে তিন বেদ (ঋক্, সাম ও যজু) আন্বীক্ষিকী (সাংখ্য, যোগ ও লোকায়তদর্শন—

লোকায়তদর্শন চার্বকদর্শনও হতে পারে, বৌদ্ধদর্শনও হতে পারে), সরকারী অধ্যক্ষদের কাছ থেকে বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য বিদ্যা) এবং বক্তা ও প্রয়োক্তা অর্থাৎ যাদেব পুস্তকগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান আছে এমন লোকের কাছ থেকে দণ্ডনীতি বা রাজধর্ম শিক্ষা করবে। পাঁচ বৎসর বয়সে চূড়াকর্মের পর বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হত। বর্তমানে আমাদের দেশে ঐ বয়সের ছেলের হাতে-খড়ি দেওয়ার প্রথা আছে। লিপিশিক্ষা ও অঙ্কশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ এই ছিল ছাত্রের প্রথম শিক্ষণীয় বিষয়। সাত বৎসর বয়সে উপনয়ন হলে ছাত্র যথাক্রমে তিন বেদ, সাঙ্খ্য, যোগ ও লোকায়তদর্শন, কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য-বিদ্যা, দণ্ডনীতি বা রাজধর্ম শিক্ষা করত। এইখানেই শেষ নয়। সর্বদা বিদ্যাবৃদ্ধদের সঙ্গ করার ব্যবস্থা রয়েছে—যাতে ছাত্রবা বিনয়ী হয়ে উঠতে পারে। এই সব শিক্ষার পর দিবসের পূর্বভাগে হস্তী, অশ্ব, রথ ও প্রহরণ বিদ্যা অর্থাৎ যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষালাভের ব্যবস্থা, আর দিবসেব পশ্চিমভাগে ইতিহাস শ্রবণের ব্যবস্থা। ইতিহাস বলতে পুবাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা উদাহরণ (নীতিশিক্ষামূলক উদাহরণস্বরূপে গ্রহণযোগ্য গল্প), ধর্মশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্র বোঝায়। দিবারাত্রির অবশিষ্ট সময়ে তারা নূতন পাঠগ্রহণ ও পুবানো পাঠের সঙ্গে পরিচয় করত এবং যা সম্যক্‌রূপে বোধগম্য হয়নি তা বার বার শ্রবণ করত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে ইউয়ান চোয়াং ও ইত-সিং-এর বিবরণ থেকে কতকটা জানতে পাবি। ইউয়ান চোয়াং-এর মতে সে-সময়ে সুনিয়ন্ত্রিত জনশিক্ষার প্রথা বর্তমান ছিল। লিপিশিক্ষা ও সিদ্ধন বা সিদ্ধিঃ অস্তু (ইতসিং বর্ণিত সিদ্ধিরস্তু আর এই পুস্তক এক হওয়া সম্ভবপর)-নামক দ্বাদশ অধ্যায়ে লিখিত একখানা প্রাথমিক পুস্তক পাঠ থেকে ছেলেদের বিদ্যারম্ভ হত। সাত বৎসর বয়সে ব্যাকরণ থেকে আরম্ভ করে পাঁচটি বিদ্যার জ্ঞানলাভে ছাত্রেরা নিয়োজিত হত। এই পাঁচটি বিদ্যা যথাক্রমে : (১) শব্দ-বিদ্যা বা ব্যাকরণ, (২) শিল্পস্থানবিদ্যা—শিল্প ও কলাবিজ্ঞান (৩) চিকিৎসা-বিদ্যা, (৪) হেতুবিদ্যা—ন্যায়শাস্ত্র, (৫) অধ্যাত্মবিদ্যা। এই সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করতে ছাত্রের বয়স প্রায় ত্রিশ হত। এই সমস্ত জ্ঞান সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেরই শিক্ষার অঙ্গস্বরূপ ছিল। তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখেছেন—'অন্তত আদর্শ হিসাবে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপকরা বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে সাধারণ শিক্ষার

অনেক শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবন করেছিলেন বলেই মনে হয়।' ইউয়ান চোয়াং ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশিক্ষকদের নির্বন্ধাতিশয়তা ও অধ্যবসায়ের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁরা প্রথম দৈনিক পাঠের সাধারণ ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করতেন, পরে খুব সাবধানতা সহকারে সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতেন। তাঁরা ছাত্রদের নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করতেন এবং বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তাদের ক্রমে ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যেতেন। তাঁরা নিশ্চেষ্টকেও শিক্ষাদানের গুণে যত্নশীল করে তুলতেন এবং স্থূলবুদ্ধিকেও চতুরে পরিণত করতেন। এমন কি অলস ফাঁকিবাজ ছেলেদের জন্যও তাঁরা যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করতেন, একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁদের বক্তব্য বার বার বলতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না ছাত্ররা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সাধারণত ত্রিশ বৎসর বয়সের আগে ছাত্রদের বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ হত না। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করে ছাত্ররা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করত এবং কর্মজীবনে তাদের প্রথম কাজই ছিল যথাসাধ্য গুরুর ঋণ পরিশোধ করা। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-শিক্ষকরা কর্তব্যনিষ্ঠায় পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন' (হ্যাভেল)। ইউয়ান চোয়াং-এর মতে শিক্ষা বৌদ্ধসন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার ছিল না। যে-কোনো লোক—সে সন্ন্যাসীই হোক বা গৃহীই হোক—শিক্ষালাভ করতে পারত।

ইতসিং-এর মতে ছেলেরা ছ' বছর বয়সে সিদ্ধিরস্তু নামে একখানা তিনশত শ্লোক সমন্বিত পুস্তক পাঠ আরম্ভ করত এবং পাঠ সমাপ্ত করতে ছয় মাস লাগত। জাপানী পণ্ডিত টাকাকুসুর মতে এই পুস্তকের প্রারম্ভে 'সিদ্ধিরস্তু' বা সিদ্ধিলাভ হোক এই বাক্য আছে, তা থেকে পরে এই পুস্তকের নামই সিদ্ধিরস্তু হওয়া সম্ভব। তারপরে আট বছর বয়সে ছেলেরা পাণিনির ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করত। বৃত্তি প্রভৃতি সমেত সমস্ত ব্যাকরণ পাঠ শেষ করতে তাদের বারো বৎসর লাগত। ব্যাকরণ পাঠ শেষ হলে হেতুবিদ্যা ও অভিধর্মকোষ পাঠ করতে হত। সর্বশেষে নালান্দা বা বলভীতে দু-তিন বছর থেকে শিক্ষা সমাপ্ত হত।

আগে যে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে তক্ষশিলাই প্রাচীনতম। তক্ষশিলায় দেশবিদেশ থেকে ছাত্ররা শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে আসত। নিতান্ত দুঃখের বিষয় তক্ষশিলার কোনো বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায়নি।

তক্ষশিলার পরেই নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে অশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। নালান্দার গৌরবময় যুগে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। নালান্দা বৌদ্ধদের ও কাশী ছিল নৈষ্ঠিক হিন্দুদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আচার্য শঙ্কর কাশী বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাত্র ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নালান্দা সম্বন্ধে ইউয়ান চোয়াং যেরকম বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন, কাশী সম্বন্ধে তা করেননি। ইউয়ান চোয়াং ছাত্র হিসাবে নালান্দায় কয়েক বছর ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, কাজেই তাঁর বিবরণ একজন অভিজ্ঞ পণ্ডিতেব বিবরণ হিসাবে খুবই মূল্যবান এবং ভ্রম শূন্য হওয়াই স্বাভাবিক।

নালান্দা পাটনা জেলার বিহার মহকুমার বড়গাঁও নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানটি প্রথমে একজন ধনী-জমিদারের আমবাগান ছিল, বাগানে একখানা বাগানবাড়িও ছিল। বুদ্ধেব পাঁচশত বণিকশিষ্য বহু অর্থব্যয়ে বাগানটি ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ নিজে তিন মাস সেখানে থেকে বণিকশিষ্যদের কাছে ধর্মমত প্রচার করেন। ক্রমে সেখানে একটি বৌদ্ধ-বিহার গড়ে ওঠে। পরে পাঁচজন রাজার প্রদত্ত সম্পত্তি ও ঘরবাড়ি ঐ বিহারকে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সম্পদশালী বিহারে পরিণত করে। ইউয়ান চোয়াং-এর সময় পর্যন্ত পাঁচজন রাজা নালান্দার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন, পরে পালবংশীয় রাজারাও যথেষ্ট সাহায্য করেন। ঐ পাঁচজন রাজার মধ্যে গুপ্তসম্রাট নরসিংহ বালাদিত্যের নাম উল্লেখযোগ্য। ইউয়ান চোয়াং খুব উচ্ছ্বসিত ভাষায় নালান্দার উঁচু বুরুজগুলি বর্ণনা করেছেন—যেন প্রভাতের কুজ্ঝটিকা ভেদ করে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সমস্ত বুরুজের জানলা থেকে যে-কেউ অস্তগামী সূর্যের অপূর্ব শোভা দেখতে পাবে, এবং সেখানে বসে নির্মল চন্দ্রালোকের মাধুরিমা সম্বন্ধে নীরবে প্রশান্তচিত্তে ধ্যান করতে পারে। বাগানের ঘন আম্রকুঞ্জের আনন্দদায়ক সুশীতল ছায়া, উজ্জ্বলবরণ পুষ্পে শোভিত কনক-বৃক্ষ, নীলপদ্মে সুশোভিত সাপের মতো বক্রাকৃতি স্বচ্ছ সরোবর স্থানটিকে অতি মনোরম করে তুলেছিল—এমনটি তিনি যেন আর কোথাও দেখেননি।

দশহাজার ছাত্র নালান্দায় থেকে পড়াশুনা করত। একশো বক্তৃতা গৃহ থেকে আচার্যরা বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্রদের উপদেশ দিতেন। ক্রমান্বয়ে রাজাদের ও জনসাধারণের বদান্যতায় আচার্য ও ছাত্রদের সমস্ত পার্থিব অভাব পূরণ হয়ে যেত; প্রায় একশো গ্রামের খাজনা এইজন্য নির্দিষ্ট ছিল।

ছাত্রদের খাওয়া, পোশাক, বিছানা ও ওষুধের কোনো অভাবই ছিল না। ছাত্রদের কোনো বেতনও দিতে হত না। ছাত্রবা ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত সকল বিষয়ের আলোচনা করত—নানা গভীর বিষয়ের আলোচনার জন্য সমস্ত দিনটা যেন যথেষ্ট ছিল না। তারা একে অন্যকে, উচ্চশ্রেণীব ছাত্র নিম্ন-শ্রেণীর ছাত্রকে সাহায্য করে শিক্ষার পরিপূর্ণতা লাভ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করত। নালান্দার আচার্যরা এমন সুন্দবভাবে শৃঙ্খলা রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেব সাতশত বৎসবেব মধ্যে একটি নিয়মের ব্যতিক্রমও কোনো ছাত্র করেনি। নালান্দায শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সমস্ত ভাবতবর্ষে তাঁদের চরিত্র ও জ্ঞানের উৎকর্ষের জন্য খ্যাতিলাভ করেছিলেন, শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বাইরেও তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পডেছিল। নালান্দার খ্যাতি ও নালান্দায় পডাশুনা কবেছে একথা বললে দেশে সম্মান বাড়বে এই দুই কারণে বিদেশ থেকে বহু ছাত্র নালান্দায় আসত। কিন্তু নালান্দার শিক্ষা এত উচ্চস্তরের ছিল যে সেখানে অনেকে প্রবেশাধিকারই পেত না। ভর্তি হতে হলে প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ বিদ্যাবত্তার পরীক্ষা দিতে হত। পরীক্ষায় উপযুক্ত বিবেচিত হলে তারা নালান্দায় প্রবেশাধিকার লাভ করত।

নালান্দা যদিও মহাযান বৌদ্ধদের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তবুও সেখানে ধর্মান্ধতা প্রাধান্য লাভ কবেনি। হীনযান সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখার ভিক্ষুরাও সেখানে ছিলেন। বেদ, অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্রও শিক্ষণীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কোনো প্রকারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না। ইউয়ান চোয়াং-এর অবস্থিতি কালে শীলভদ্র নালান্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউয়ান চোয়াং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শীলভদ্র বাঙালী ছিলেন। বাঙালী জাতির পক্ষে এটা খুবই গৌরবের কথা যে নালান্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এক সময়ে ছিলেন একজন বাঙালী। শীলভদ্রের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী নামক স্থানের সুপণ্ডিত ধর্মপাল নালান্দার অধ্যক্ষ ছিলেন (ধর্মপালের গুরু ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক দিঙ্নাগ এবং দিঙ্নাগের গুরু ছিলেন আচার্য বসুবন্ধু)। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত নালান্দা প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান ছিল। মুসলমান আক্রমণকারীদের হাতে নালান্দা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পণ্ডিতরা মাটি খুঁড়ে বড়গাঁও নামক স্থান থেকে অনেক পুরাতন মঠ ও ছাত্রাবাস আবিষ্কার করেছেন।

নালান্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় একদিক দিয়ে বিংশ শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে নেই। দশহাজার ছাত্রকে বেতন দিতে হত না, খাওয়া, কাপড়, বিছানা ও ওষুধ এই চার অত্যাবশ্যক পার্থিব অভাব পূরণের জন্য তাদের এক পয়সাও খরচ করতে হত না। অর্থাৎ গুরুদের সঙ্গে একজায়গায় থেকে দশ হাজার ছাত্র নিজেদেব এক পয়সা খরচ না করে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালাভ করতে পারত। ভারতবর্ষ বর্তমানে এবকম ব্যবস্থার কথা ভাবতেই পারে না। নালান্দা তখন এশিয়ার এক শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আজকাল যেমন লোকে শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ করবার জন্য ইউবোপে যায়, সে সময়ে তেমনি সেই উদ্দেশ্যে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্ররা নালান্দায় আসত।

ইউয়ান চোয়াং-এর বর্ণনা থেকে মনে হয় কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বেশ প্রভাব সম্পন্ন ছিল। বর্তমান কাশীর অবস্থা দেখে এটা অনুমান করা মোটেই অযৌক্তিক নয় যে কাশীতেও তখন হাজার হাজার ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। গুজরাটের অন্তর্গত বলভীও তখন শিক্ষার এক বড় কেন্দ্র ছিল একথাও ইউয়ান চোয়াং উল্লেখ করেছেন। তিনি একথাও স্পষ্টভাবে লিখেছেন—'ভারতবর্ষে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল কিন্তু কোনোটিই তুলনায় নালান্দাব সমকক্ষ ছিল না।' এই সমস্ত হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বহু ছাত্র শিক্ষা পেত একথা বলাই বাহুল্য। প্রত্যেকটি বৌদ্ধবিহার বা জৈনমঠে এক-একটি শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এগুলি ছাড়া হিন্দুদেরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ভিন্সেট স্মিথ-এর মতে অশোকের সময়েই খুব সম্ভবত অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের হার বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। তবে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে বেশি ছিল তা একবকম নিশ্চিতই মনে হয়। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি বেশ উন্নত ছিল, নালান্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, যেখানে সমস্ত এশিয়া থেকে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করতে ছাত্ররা আসত এবং শিক্ষিতের হারও বর্তমানের চেয়ে বেশি ছিল। মোগল রাজত্বের সময় পঞ্চদশ শতাব্দীতেও প্রত্যেক হিন্দুগ্রামেই একটি বিদ্যালয় ছিল। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি বা গ্রামের উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ থেকে শিক্ষক প্রতিপালিত হতেন। হিন্দুযুগে যে এ ব্যবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

দক্ষিণ ভারতে পাণ্ড্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় মাদুরাও বেশ একটি ভালো শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। সমালোচক ও কবিরা মিলিত হয়ে একটি 'সঙ্গম'

স্থাপন করেন। কোনো কবিতা বা নাটকের গুণাগুণ এই সঙ্গম নির্ধারণ করত। উনপঞ্চাশ জন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা থেকে মনে হয় সঙ্গম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতেই এই সঙ্গমের অস্তিত্ব ছিল।

নালান্দার মতো বিখ্যাত না হলেও অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা ধর্মপাল কর্তৃক স্থাপিত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ও মহাযান বৌদ্ধদের এক বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভবত ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানে এই শিক্ষাকেন্দ্র অবস্থিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য ধর্মপাল প্রচুর অর্থদান করেন। বিক্রমশীলায় ১০৭টি মন্দির ও ছটি কলেজ ছিল। পাঠ্যক্রম অনেকটা নালান্দার মতোই ছিল। বিখ্যাত অতীশ দীপঙ্কর এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় করার গৌরব অতীশ দীপঙ্করের। তিনি ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে মারা যান। আজও অতীশ দীপঙ্করের নাম তিব্বতবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তিনি একজন বাঙালী ছিলেন। তিব্বত থেকে অনেক ছাত্র বিক্রমশীলায় আসত, তাদের মধ্যে কৃতী ছাত্ররা অনেক পুস্তক তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে সুধীরা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতেন। কেউ কেউ আজীবন দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করে নির্জনে বিদ্যাচর্চায় নিজেদের নিয়োজিত করতেন। তাঁরা জগতের নিন্দা বা প্রশংসা উভয়কেই সমভাবে দেখতেন। সঙ্গতিপন্ন ঘরের অনেক ছেলেও ভিক্ষান্ন মাত্র সম্বল করে জ্ঞানলাভের জন্য নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। যদি শুনতেন কোনো জায়গায় একজন বিশেষ জ্ঞানী লোক আছেন তবে দেড়শো মাইল হেঁটে তাঁর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য যাওয়া তাঁরা মোটেই কষ্টকর বিবেচনা করতেন না। খুব কম দেশই, কম যুগেই এরূপ লোকের গর্ব করতে পারে।

তারপরে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য 'কুশীলব' ভারতবর্ষের এক অপূর্ব সৃষ্টি। সারাদিনের পরিশ্রমের পর জনসাধারণ সন্ধ্যাবেলায় কথকের মুখ থেকে রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সীতার আদর্শ পাতিব্রত্য, সাবিত্রী-সত্যবান, ও নল-দময়ন্তীর অপূর্ব কথা শ্রবণ করত। শিবি রাজার আত্মদান, ধ্রুব-প্রহ্লাদের ঐকান্তিক ভক্তি, বিষ্ণু, বায়ু ও অন্যান্য পুরাণের ভক্তিরসে ভরপুর আখ্যায়িকাগুলি তাদের সরল প্রাণকে অজ্ঞাতসারেই উন্নত ও মহীয়ান করে তুলত।

যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণপাঠ জনসাধারণের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল। কাজেই যারা বিদ্যালয়ে পড়ে জ্ঞানলাভ করার সুযোগ পেত না তারাও ভারতের উন্নত সভ্যতার দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারত। তাই হ্যাভেল উক্তি করেছেন, এমন কি বিংশ শতাব্দীর ভারতের নিরক্ষর জনসাধারণও বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের বৈজ্ঞানিক অসভ্যদের সভ্যতা শিক্ষা দিতে পারে। হ্যাভেলের এ উক্তি আমার কাছে মোটেই অতিরঞ্জিত মনে হয় না। কলেজে ছাত্রাবস্থায় এক নাপিত যে আমাকে প্রায়ই ক্ষৌরী করত, ক্ষৌরকর্মের সময় মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতি এবং শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাব সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা আরম্ভ করত। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সে যতটা হৃদয়ঙ্গম করেছিল আমার তখন ততটা বোধ ছিল না একথা আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। অথচ সে অতিকষ্টে নিজের নামটুকুই শুধু লিখতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গত ত্রিশ বছরের মধ্যে যাত্রা, কথকতা, পাঠ ইত্যাদি দেশে অনেক কমে গিয়েছে। অথচ তার বদলে উন্নততর বা অন্য কোনো প্রকারের জনশিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত হয়নি। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে পারেনি। তাই তথাকথিত শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে প্রাণের যোগাযোগ নেই—যে যোগ প্রাচীন ভারতবর্ষে দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়ে সুনিবিড় সত্য হয়ে উঠেছিল।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে তাতে শূদ্রের অধিকার ছিল না। বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে নয়, নৈষ্ঠিক হিন্দু প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরই এই অভিযোগ। বৈদিকযুগে জন্মগত জাতিভেদ ছিল না, দাসীপুত্র কবষও একজন বৈদিক ঋষি। পরবর্তীকালে জন্মগত জাতিভেদ হিন্দু সমাজে প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের বিভিন্ন কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়। সেই সময় থেকে শূদ্রের সাধারণ শিক্ষালাভে অধিকার ছিল, কিন্তু বেদাদিশাস্ত্র পাঠে অধিকার ছিল না। উপনিষদের যুগেও দ্বিজদেরই ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকার ছিল, কিন্তু সত্য কথা বলার জন্যই বেশ্যাপুত্র সত্যকামকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত বলে ধরে নেওয়া দেখে মনে হয় সেকালে গুরু কাউকে গুণসম্পন্ন বিবেচনা করলেই তাকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীভুক্ত করে নিতেন এবং সে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে পারত। অবশ্য মনুর সময়ে এই ব্যবস্থা ছিল

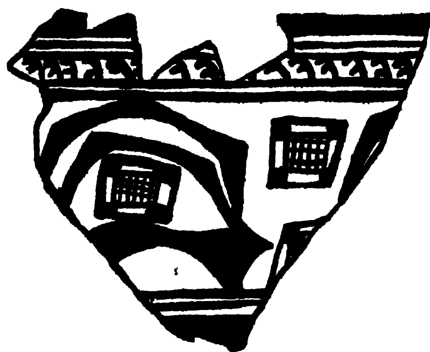
না। তখন থেকে জন্মগত অধিকারভেদবাদ সমাজে কঠোরভাবে প্রতিপালিত হয়। কিন্তু ভারতীয় সমাজে শূদ্র বলে কোনো রাজার অভিষিক্ত হওয়ার কখনো অসুবিধা হয়নি। অভিষিক্ত হলেই রাজা অন্যান্য ক্ষত্রিয়ের মতো ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অধিকারী হতেন এবং পরে তাঁর বংশধরেরাও। অবশ্য শূদ্ররাজা আর কয়জন হয়েছেন!

রাজসূয় যজ্ঞের সময় যুধিষ্ঠির সম্মানার্হ ও সদ্বিদ্বান শূদ্রদের নিমন্ত্রণ করতে বলেন। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে মহাভারতের যুগে শূদ্ররা যে শুধু বিদ্যা লাভে অধিকারী ছিলেন তা নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে সদ্বিদ্বান বলে রাজসভায় সম্মানিতও হতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চারবর্ণের যে কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে তা এই: ব্রাহ্মণের স্বধর্ম অধ্যয়ন-অধ্যাপন, যজন-যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের অধ্যয়ন, যজন, দান, যুদ্ধোপজীবিকা ও প্রজারক্ষা; বৈশ্যের অধ্যয়ন, যজন, দান, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এবং শূদ্রের ধর্ম দ্বিজাতিসেবা, বার্তা (কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য), শিল্প ও কুশীলব কর্ম। শূদ্র কুশীলব হত। কুশীলবদের পাণ্ডিত্য থাকা নিতান্তই প্রয়োজন। কুশীলবরা অবশ্যই বিদ্যালাভ করত। জনশিক্ষার ভার মুখ্যতই ছিল কুশীলবদের উপর। বাণিজ্য করতে হলেও লেখাপড়া জানা দরকার। অতএব কৌটিল্যের সময় শূদ্রদের বেদাধ্যয়নে অধিকার ছিল না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষালাভে অধিকার ছিল। এই জন্মগত অধিকারভেদবাদ কোনো মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। কিন্তু বর্তমানে জন্মগত অধিকারভেদবাদ স্বীকৃত না হলেও দারিদ্র্যগত ভেদবাদ এমন কঠোরভাবে স্বীকৃত হচ্ছে যে দেশের শতকরা ৯৫ জন শূদ্রেরও অধম থাকতে বাধ্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নির্বিশেষে দেশের অধিকাংশ লোকই বর্তমানে শিক্ষার মাপ-কাঠিতে শূদ্রের চেয়ে নিম্নপর্যায়ভুক্ত। আজ কত আরুণিকেও শ্বেতকেতুর মতো পুত্রকে অর্থাভাবে যে ব্রহ্মবন্ধু হতে দেখতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। ভারতবর্ষ এক সময় শুভবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হয়েই হয়তো পরীক্ষা হিসাবে জন্মগত ভেদবাদ প্রবর্তন করেছিল, কিন্তু পরীক্ষার ফল শুভ হয়নি। বৌদ্ধ ও জৈনরা জন্মগত অধিকার ভেদবাদ মানত না। দীর্ঘকাল জাতির শিক্ষায় তারা বেশ মোটা অংশ গ্রহণ করেছিল।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতি দেশে অনেক জ্ঞানী ও গুণীজন সৃষ্টি করেছিল। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাঁদের দান অপরিমেয়। সমস্ত জাতির চিন্তাধারার

সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতির যেন একটা নাড়ীর যোগ ছিল। গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক মধুর ছিল। দারিদ্র্যের অজুহাতে কাউকেও শিক্ষালাভে বঞ্চিত হতে হয়নি। অশোকের সময় না হলেও অন্তত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমানের চেয়ে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক এই দুই বিষয়ের সামঞ্জস্য করার চেষ্টা প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সুস্পষ্ট। এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি আবার হুবহু দেশে প্রবর্তন করা সঙ্গত হবে। পাশ্চাত্যের ভালো জিনিস আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু একথা সত্য যে বর্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষের অন্তর স্পর্শ করেনি। জাতির অতীত ইতিহাসের ভিত্তিতে এর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা দরকার, নয়তো এ শিক্ষা জাতির সত্যকারের কল্যাণ সাধনে কখনো সক্ষম হবে না।





সপ্তম পরিচ্ছেদ

রাজকাহিনী ও রাষ্ট্রব্যবস্থা

সভ্যতার ইতিহাসে রাজাদের দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের সভ্যতার ধারা যেমন তার রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে, রাষ্ট্রব্যবস্থাও তেমনি তার সভ্যতার প্রগতির উপরে অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। আগেই বলেছি ভারতীয় ধর্মের বৈশিষ্ট্য উদারতা। প্রাচীন ভারতের প্রধান প্রধান রাজা ভারতবর্ষের ধর্মের সেই মহান ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেননি, বরং উজ্জ্বলই করেছেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সম্রাট অশোক শুধু সমস্ত ভারতবর্ষে নয়, পশ্চিম এশিয়ায় এমন কি সুদূর মিশর ও গ্রীসে তথাগতের বাণী প্রচার করেছিলেন। কিন্তু সেজন্য তিনি ভারতবর্ষের কোনো ধর্মমতের উপর অবিচার বা অত্যাচার করেননি। বরাবর পাহাড়ে বহু অর্থব্যয়ে আজীবক সাধুদের জন্য গুহা নির্মাণ করে দেওয়ার কথা তাঁর শিলালিপিতে উল্লেখ রয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণদেরও মুক্তহস্তে দান করতেন। গুপ্তরাজারা পরম ভাগবত বা বৈষ্ণব ছিলেন। গুপ্তরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন বৌদ্ধ, আর যুদ্ধমন্ত্রী ও মন্ত্রী শিখর স্বামীন্ উভয়েই ছিলেন শৈব। তাঁর পিতা সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সেই দেশের ছাত্র ও তীর্থযাত্রীদের (অবশ্য বৌদ্ধ) সুবিধার জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করবার অনুমতি পেয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে বহু অর্থসম্পদসম্পন্ন বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠা তাঁর ও তাঁর পরামর্শদাতাদের উদারতারই

পরিচয় দেয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, রামায়ণ মহাভারতের নূতন সংস্করণ করে হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে অশেষ সাহায্য করেছিলেন। গুপ্তযুগকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগ বলে অভিহিত করা হয়, কিন্তু কোনো গুপ্তরাজা কোনো বৌদ্ধ সঙ্ঘের অর্থসম্পদের উপর হস্তক্ষেপ করেননি বা বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রবল শক্তিকে খর্ব করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। নিজেবা করা দূরে থাক, তাঁরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তথাগতের কোনো অনুগতের প্রতি অত্যাচারের বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় পর্যন্ত দেননি। গুপ্তরাজাদের সময় অসংখ্য বৌদ্ধ ও জৈনবিহার জনসাধারণের শিক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্যের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ আচার্য বসুবন্ধু। বালাদিত্য অনেক বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষ করে নালান্দায় প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছিলেন। কুমারস্বামীর মতে নরসিংহ বালাদিত্যই নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রতিষ্ঠাতা। এই মত সমর্থন যোগ্য না হলেও মনে হয় তাঁর প্রচুর দানের ফলেই নালান্দা বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে পেবেছিল। কিন্তু নবসিংহ গুপ্ত এমন এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর ভগ্নীর বিবাহ দিয়েছিলেন যিনি প্রাচীন বৈদিক ধর্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বসুবন্ধুর বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। শতবাহন বংশের হিন্দুরাজারা বৌদ্ধসঙ্ঘেই বেশির ভাগ দান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রথমে শৈব ছিলেন, পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছিল। তিনি সকল সম্প্রদায়ের ধার্মিক ব্যক্তিদেরই অকাতরে অর্থ দান করতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ বা জৈনসন্ন্যাসী কেউই তাঁর দান লাভে বঞ্চিত হননি। তিনি বৌদ্ধমতের প্রতি সমধিক অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও শৈব কবি বানভট্টই তাঁর সভাকবি ছিলেন। হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং তাঁর অনুগত কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা বার বার বিশেষভাবে অনুরোধ করে বৌদ্ধ ইউয়ান চোয়াংকে নালান্দা থেকে কামরূপ নিয়ে যান। কামরূপে ইউয়ান চোয়াং যে রকম রাজোচিত ভাবে অভ্যর্থিত ও সমাদৃত হয়েছিলেন তা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত গৌরবের। ভাস্কর বর্মা ক্ষত্রিয় ছিলেন (আসামের ঐতিহাসিকরা তাঁকে মহাভারতের ভগদত্ত বংশোদ্ভূত বলে মনে করেন), কিন্তু জাতিগত সংস্কারের প্রতি তাঁর সত্যিকারের অনুরাগ থাকার দরুন সকল বিদ্বান লোকের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাঁর দেশের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে

নালান্দার মতো বিভিন্ন দেশের ছাত্ররা আকৃষ্ট হত, যদিও বৌদ্ধধর্ম সেখানে প্রসার লাভ করেনি। বাঙলার বৌদ্ধ পালরাজারা পাশুপত সম্প্রদায়ের জন্য শৈব মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাঙলার শৈব রাজা শশাঙ্ক কর্তৃক বিহারের বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের উপর অশেষ প্রকার অত্যাচারের কথা ইউয়ান চোয়াং উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে জার্মান ঐতিহাসিক হার্টমুট পিপার লিখেছেন যে ভারতবর্ষে হর্ষবর্ধনের সকল ধর্মের প্রতি উদার দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও সংস্কার ও তার প্রতিক্রিয়া রক্ত-রঞ্জিত ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন শেষ হয়নি; মধ্য বাঙলার রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার করেছেন, অনেক বৌদ্ধবিহাব ধ্বংস করেছেন এবং বোধিদ্রুম উৎপাটিত করেছেন। পিপারের মতে যেমনভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে তা রক্তরঞ্জিত আপ্রাণ যুদ্ধ ছাড়া কখনো সম্ভব হতে পারে না। শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী সত্য বলে ধরলেও এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। একটি মাত্র ঘটনার উপর নির্ভর করে এতবড একটা সিদ্ধান্তে পৌছানো কিছুতেই সম্ভবপর হত না যদি ইউরোপীয় ধর্মযুদ্ধেব সংস্কার গ্রন্থকারকে প্রভাবান্বিত না করত। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরেও অনেকদিন হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন এবং বৌদ্ধদের অকাতরে অর্থদান করেছিলেন, এমন কি শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধভিক্ষুদেরই সবচেয়ে বেশি অর্থদান করতেন। অতএব শশাঙ্কের সাময়িক অত্যাচারের কাহিনী সত্য হলেও তাকে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কারণ বলে ধরা যায় না।

ভিন্সেণ্ট স্মিথ, পুষ্যমিত্র ও শশাঙ্কের বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কাহিনী আংশিকভাবে সত্য বলে স্বীকার করলেও লিখেছেন—'এটা সত্য যে প্রধানত অত্যাচার ছাড়াও অন্য কোনো কারণেই ঐ ধর্ম ক্রমে ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে।' আরো লিখেছেন—'আশ্চর্য এই যে অত্যাচার খুবই বিরল ছিল এবং সাধারণত বিভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীভাবেই একত্র বাস করত এবং তারা প্রায় সমভাবেই রাজবদান্যতা উপভোগ করত।' রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঙলার ইতিহাসে লিখেছেন, 'বৌদ্ধাচার্যদের প্রতি শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। তার প্রথম কারণ এই যে চৈনিক শ্রমণের ধর্মমত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধর্মীদের প্রতি সর্বত্র অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইউয়ান চোয়াং যাহা লিখিয়াছেন

তাহা যদি সত্য হইত, বৌদ্ধধর্মের বিলোপ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধতীর্থ সকলের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে পরিব্রাজক স্বয়ং শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৌড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ সঙ্ঘারাম ও বিহারাদি দেখিতে পাইতেন না। বৌদ্ধধর্মানুরক্ত স্থানীশ্বররাজের অনুকূলাচরণের জন্যই বোধ হয় শশাঙ্ক বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের ধর্ম-যাজকদের শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।' ইউয়ান চোয়াংকে সত্যবাদী ধরলেও শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য না হতে পারে। হর্ষবর্ধন ও কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা এই উভয়ের সম্মিলিত শক্তির কাছে শশাঙ্কের পরাজয়ের পরে ইউয়ান চোয়াং বাঙলায় আসেন। তিনি শশাঙ্কের শত্রুপক্ষীয় লোকের কাছে শুনে এসব লিখেছেন। কাজেই একমাত্র ইউয়ান চোয়াং-এর ইতিবৃত্ত থেকে শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য বলে স্থির করা যুক্তিযুক্ত নয়। গৌড়ের বৌদ্ধরা ইউয়ান চোয়াং-এর কাছে কোনো অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেনি। অতএব শশাঙ্কের অত্যাচার কাহিনী সত্য হলেও বৌদ্ধ-বিদ্বেষ সত্য নয়। যাক, অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকই এ বিষয়ে একমত যে ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দ ধর্ম বিষয়ে সাধারণত উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। এ নিয়মের ব্যতিক্রম খুবই বিরল। ভারতবর্ষে রাজন্যবৃন্দকে জনসাধারণের শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করে চলতে হত। জনসাধারণের প্রতি রক্তবিন্দুতে ধর্মবিষয়ক উদার ও মহৎ ভাব প্রবাহিত হওয়াতে কোনো রাজাই সে ভাবকে শ্রদ্ধার পরিবর্তে আঘাত দিতে ভরসা করেননি। আর তাঁরা ছোটবেলা থেকে যে শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হতেন তার মধ্যে সঙ্কীর্ণতার স্থান ছিল না। হিন্দুর সমাজব্যবস্থা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হত যাতে ধর্ম বিষয়ে রাজাকে উদার হতেই হত। এজন্যই উদারতা ভারতবর্ষের 'চিরাচরিত প্রথা' হতে পেরেছে। তবে ঐতিহাসিক হিসাবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ভারতবর্ষের অনেক নরপতি অন্য ধর্মের উপর অত্যাচার না করে নিজ নিজ ধর্মমতের প্রচার ও প্রসারতার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু সে ব্যবস্থাও ভারতবর্ষের বর্তমান ব্যবস্থার চেয়ে ভালো ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমান সরকারী অর্থে একমাত্র প্রোটেস্টেণ্ট মতাবলম্বী ধর্মযাজকরাই পুষ্ট হন।

উপরে বলেছি ভারতবর্ষের রাজন্যবৃন্দকে জনসাধারণের শুভেচ্ছার উপর

নির্ভর করে চলতে হত। কিন্তু অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত 'প্রাচ্য স্বৈরাচার-তন্ত্রের' কথা উল্লেখ করেন। তাঁদের মতে প্রাচ্যের তথা ভারতবর্ষের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা স্বৈরাচার-তন্ত্রমূলক ছিল। এর চেয়ে বড় অসত্য আর কিছুই নেই। রাজা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যিনি প্রজারঞ্জন করেন। স্মরণাতীত কাল থেকেই হিন্দুরা রাজা সম্বন্ধে এই ধারণা করে আসছেন। বৈদিকযুগে রাজা নির্বাচিত হতেন কাজেই সে-সময়ে স্বৈরাচারের কথা উঠতেই পারে না। অন্তত ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সময় থেকে ভারতবর্ষের রাজারা তাঁদের অভিষেকের সময় উপস্থিত প্রজাবৃন্দকে লক্ষ্য করে এই শপথ গ্রহণ করতেন 'যাঞ্চ রাত্রিমজায়েহং যাঞ্চ প্রেতাস্মি তদুভয়মন্তরেণেষ্টা পূর্তং মে লোকং সুকৃতমায়ুঃ প্রজাং বৃঞ্জীথা যদি তে দ্রুহ্যেয়মীতি'—যে রাত্রিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আর যে রাত্রিতে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হব, এই উভয়ের মধ্যে আমি যা-কিছু সুকৃত কর্মের অনুষ্ঠান করি, অর্থাৎ আমার সারাজীবনের সুকৃত কর্মের ফল, আর আমার পরলোক, জীবন এবং সন্তান-সন্ততি সমস্ত থেকেই যেন বঞ্চিত হই যদি আমি তোমাদের উপর অত্যাচার করি। সময় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও একথা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্বে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ রচিত হয়েছিল। প্রাচীন উপনিষদসমূহ বুদ্ধের পূর্ববর্তী কালের এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ উপনিষদেরও পূর্বে রচিত। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রয়েছে, 'প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্॥'—প্রজার সুখে রাজার সুখ, প্রজার হিতে হিত, রাজার নিজের প্রিয় (জিনিস বা কার্য) হিত নয় প্রজাদের প্রিয়ই হিত। এটাই প্রাচীন ভারতের রাজার আদর্শ। তাই হ্যাভেল লিখেছেন—'কোনো প্রকারের শাসন-পদ্ধতি তা গণতন্ত্র, স্বেচ্ছাতন্ত্র, আমলাতন্ত্রমূলক বা অন্য যে-কোনো প্রকারেরই হোক, প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের যে-কোনো স্থানেরই হোক এমনভাবে পরিকল্পিত হতে পারেনি যাতে তা অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ না হতে পারে। কিন্তু ইউরোপের এই যে সাধারণ ধারণা যে, ভারতবর্ষের রাজতন্ত্র চির-কাল দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বৈরাচারতন্ত্র ছিল, তা প্রাগ্‌মুসলমানযুগের উপর প্রয়োগ করলে বলতেই হবে যে এটা ইউরোপীয়দের ভারত-ইতিহাস সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে একটি।..... ইংরেজদের স্বাধীনতা অনিচ্ছুক রাজার হাত থেকে ঘোরতর সংগ্রাম ও অন্তর্বিপ্লবের দ্বারা আদায় করা হয়েছিল। ভারতের আর্য

রাষ্ট্রব্যবস্থা জনসাধারণকে পণ্ডিতদের স্বেচ্ছাকৃত দান।' 'ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকারের জন্য ভারতবর্ষে কোনো সংগ্রাম করতে হয়নি, কারণ দেশের অলিখিত বা প্রচলিত আইনের দ্বারা উভয়ই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রত্যেক রাজা তাঁর অভিষেককালীন শপথে তা বলবৎ করতেন' (হ্যাভেল)। শুধু তাই নয়, হ্যাভেল একথাও মুক্তকণ্ঠে লিখেছেন যে বিংশ শতাব্দীতে একজন ইংরেজ কৃষক ইংলণ্ডে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা উপভোগ করে, একজন ভারতীয় কৃষক মুসলমান আক্রমণের বহু শতাব্দী পূর্বে তার চেয়ে বেশি সুবিধা উপভোগ করত। ভারতবর্ষে রাজা রাজত্বলাভ করে প্রজার হিতের জন্যও নিজ ইচ্ছামত শাসন করতে পারতেন না। তাঁকে মন্ত্রীদের সাহায্যে শাসন করতে হত। শুক্রসারনীতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে—'রাজা যদি সর্ববিদ্যায় কুশলী ও সুমন্ত্রবিদ্‌ও হন তথাপি মন্ত্রীদের পরামর্শ ভিন্ন একাকী রাজকার্য করার কথা চিন্তাও করবেন না। বুদ্ধিমান রাজা মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারেই কাজ করবেন, কখনো নিজের ইচ্ছামত নয়। যদি রাজা স্বাতন্ত্র্য লাভ করেন তবে তিনি তাঁর অনর্থই কল্পনা করেন, সময়ে তিনি রাজ্য ও প্রজাহীন হন।'

কৌটিল্য এই ব্যবস্থা দিয়েছেন যে—অধিকাংশের মতানুসারেই রাজাকে চলতে হবে: 'আত্যয়িক বা বিশেষ কার্যের জন্য মন্ত্রীগণ ও মন্ত্রীপরিষদ এই উভয়কে আহ্বান করতে হবে। মন্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীগণের সম্মিলিত সভার অধিকাংশের মতানুসারেই রাজাকে কাজ করতে হবে।' মন্ত্রীদের আপত্তি হলে রাজা ইচ্ছামতো দান করতে পারতেন না। সম্রাট অশোকের আদেশ সত্ত্বেও মন্ত্রী রাধাগুপ্ত তাঁর বৌদ্ধসঙ্ঘের দানের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন একথার উল্লেখ আছে। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজা অমাত্য ও প্রজা—এই তিনজনের মধ্যে সামঞ্জস্য করে শাসন-ব্যবস্থা চলত। রাজা স্বেচ্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক ছিল না। কৌটিল্যে রাজাও বেতনভোগী এই ধারণা রয়েছে। যুদ্ধের প্রাক্কালে রাজা সৈন্যদের সমবেত করে বলবেন—'তুল্য বেতনোঽস্মি ভবদ্ভিস্‌সহ ভোগ্যমিদং রাজ্যং'—আমিও তোমাদের মতো বেতনভোগী, তোমাদের সঙ্গে একযোগেই এই রাজ্য ভোগ করব।

রাজা দেবতা, রাজার অধিকার ভগবৎ দত্ত—মানুষের দেয় নয় বা মানুষের সে ক্ষমতা খর্ব করার অধিকার নেই—এই ধারণা মধ্যযুগে ইউরোপকে বিষাক্ত ও

পূতিগন্ধময় করে তুলেছিল; পরম সৌভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষে এই মতবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। অবশ্য মনুতে রয়েছে—'বালোঽপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ। মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেন তিষ্ঠতি॥'—রাজা বালক হলেও তাঁকে সাধারণ মানুষ ভেবে অবহেলা করবেন না, কারণ রাজা মহান দেবতা—নররূপে অবস্থান করছেন। কিন্তু মনুর পূর্বাপর সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে রাজা দেবতা এটা শুধু অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছু মনে হয় না। মনু একথাও বলেছেন—'তং রাজা প্রণয়ন্সম্যক্ত্রিবর্গেনাভিবর্দ্ধতে। কামাত্মা বিষমঃ ক্ষুদ্রো দণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥'—যে রাজা সম্যকভাবে দণ্ডের প্রয়োগ করেন তিনি ত্রিবর্গের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ উন্নতি লাভ করেন আর রাজা কামাত্মা বিষম ও ক্ষুদ্র হলে দণ্ডদ্বারা নিহত হন। 'দণ্ডহি সুমহত্তেজোদুর্ধরাশ্চাকৃতাত্মভিঃ। ধর্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥'—দণ্ড মহৎতেজসম্পন্ন, অকৃতাত্মরাজা তা ধারণ করতে পারে না, ধর্ম থেকে বিচলিত হলে দণ্ড রাজাকে সবান্ধবে বিনাশ করে। অর্থাৎ রাজাকে ধর্মানুগ হয়ে চলতে হত, নতুবা দণ্ড অর্থাৎ প্রচলিত বিধান অনুযায়ী প্রজাশক্তি তাঁকে সবান্ধবে বিনাশ কবত। (মনুতে রাজার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা আছে—'যে অপরাধ করলে সাধারণ লোকের একপণ অর্থদণ্ড হয় সেই অপরাধে রাজার সহস্রপণ অর্থদণ্ড হবে।') রাজা যদি দণ্ডার্হ ও বিনাশার্হ হয় তাহলে রাজা দেবতা একথা শুধু অর্থবাদ ভিন্ন আর কিছুই হতে পারে না। অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রে বা অর্থশাস্ত্রে রাজা দেবতা এরূপ কথা নেই। কাজেই সমস্ত ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মনুর অর্থ করতে গেলেও এরূপ ব্যাখ্যাই স্বাভাবিক হয়। কোনো জিনিসের ব্যাখ্যা করতে হলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা যুক্তিযুক্ত। মনু খুব সম্ভবত পুষ্যমিত্রের সময় রচিত হয়েছিল। পুষ্যমিত্রই মৌর্যবংশের রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। বাস্তবের দিক দিয়ে দেখতে গেলেও ঐতিহাসিকযুগে কোনো ভারতীয় রাজাই নিজেকে দেবতা বলে ঘোষণা করেননি।

ভারতবর্ষের শিক্ষা কোনোদিন রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ছিল না। কাজেই সেখানে বিসমার্কের মতো কোনো রাজনীতিবিশারদ 'ছেলেদের মন শাদা কাগজের মতো, তার উপর যা খুশি লিখতে পার'—এই কথা বলে নূতন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করে ইচ্ছা মতো জাতির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করার কল্পনা করেননি।

বর্তমানেও ইউরোপের সর্বত্র শিক্ষা অল্পাধিক পরিমাণে রাজনীতিবিদ্দের গণিকার মতো ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষায় রাষ্ট্রশক্তির প্রভাব নিতান্ত পরোক্ষ হওয়ায় রাজশক্তি জাতির চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রিত করত না বরং জাতির স্বাধীনভাবে বিকশিত চিন্তাধারাই রাজশক্তিকে পরিচালিত করত। রাজনীতিবিদ্দের অঙ্গুলী হেলনে চলবার মতো পরম দুর্ভাগ্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতি-চালিত বিংশ শতাব্দীর অধ্যাপকদের ভাগ্যে অতি নিষ্ঠুর নিবিড় সত্য হলেও প্রাচীন ভারতের পণ্ডিতরা তার হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। রাজা কখনো জাতির সত্যিকারের ভাগ্যবিধাতা হয়ে ওঠেননি, জাতিই তাঁর ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল। রাজশক্তি কর্তৃক ছেলেবেলা থেকে পাঠ্যপুস্তক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ভারতবর্ষ কল্পনাও করেনি। জাতির চিন্তাজগতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকাতে রাজশক্তি সাময়িকভাবে অত্যাচারী হলেও জাতির চরম ক্ষতি করতে পারেনি ; জাতির অন্তরাত্মা কখনো শৃঙ্খলিত হয়নি, জাতি নিজেকে ভুলে যায়নি।

ভারতবর্ষের রাজা কখনো একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার চেষ্টা করেননি। তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়ক হয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন। তাই ইটালিতে পোপের রাজশক্তিকে খর্ব করতে গিয়ে যে আন্তর্জাতিক অসুবিধার মধ্যে জড়িত হওয়ার বিপদ উপস্থিত হয়েছিল এখানে তা কখনও হয়নি। কিম্বা তুরস্কের খলিফাকে নিয়ে নব্য তুরস্কের যে সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল ভারতবর্ষে সে সমস্যা কখনো দেখা দেয়নি। অন্য দিকে ধর্মাচার্যরাও কখনো রাজশক্তি খর্ব করতে চেষ্টা করেননি। রাজার যেখানে ক্ষমতা—দণ্ডদান, করগ্রহণ, ঋষিরা চিরকাল সেখানে তাঁদের অধিকার মেনে নিয়েছেন। ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মযাজকদের সঙ্গে রাজশক্তির যে বীভৎস দ্বন্দ্ব চলছিল, ভারতবর্ষে তা কখনো ঘটেনি। ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত ছিল বলে সকল শক্তিই নিজ নিজ সীমা রক্ষা করে চলত। ঋষিরা সমাজের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন চিন্তা-জগতের নিয়ামক ; রাজশক্তি ছিল রক্ষক ও শাসনকর্তা। উভয়ে উভয়কে মেনে চলত। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যশক্তি ও ক্ষাত্রশক্তি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে উভয়েরই শক্তি বৃদ্ধি করত—এটাই ছিল ভারতের সাধারণ সমাজব্যবস্থা।

এই সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার অঙ্গস্বরূপ হয়ে ভারতীয় নরপতিরা জাতির নানাবিধ কল্যাণসাধন করতে চেষ্টা করেছেন। মৌর্যযুগেই কৃষকের উপকারের

জন্য পূর্তবিভাগ বিধিমতোভাবে সুন্দর কার্য পরিচালনা করত। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (পাটনা) শহরে। কিন্তু রাজধানী থেকে হাজার মাইল দূরে কাঠিওয়ারের প্রজারাও তাঁর করুণাময় দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রজাদের সেচের সুবিধার জন্য চন্দ্রগুপ্তের পশ্চিম বিভাগের শাসনকর্তা পুষ্যগুপ্ত প্রাকৃতিক জলধারায় বাঁধ দিয়ে কাঠিওয়ারে একটি সুন্দর হ্রদ তৈরি করিয়েছিলেন—সেটি 'সুদর্শন হ্রদ' নামে বিখ্যাত। অন্তত আটশো বছর পর্যন্ত বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন নরপতি দৈব-দুর্বিপাক সত্ত্বেও ঐ হ্রদের বাঁধ মেরামত ও আরো অধিক পরিমাণে মজবুত করে রেখেছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় যা-কিছু অসম্পূর্ণ ছিল অশোক তা সম্পূর্ণ করান। প্রায় চারশো বৎসর পরে ১৫০ খৃষ্টাব্দে ভীষণ ঝড়ে বাঁধ ভেঙ্গে যায়। তখন শকরাজা রুদ্রদামা এই হ্রদটিকে আরও তিনগুণ দৃঢ় করে তৈরি করেন। এরপর আবার বাঁধ ভাঙ্গলে ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্রাট স্কন্দগুপ্ত বাঁধ মেরামত করান। তারপরে কখন এই হ্রদ নষ্ট হয়ে যায় তা বলা যায় না। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই হ্রদ যে প্রজাদের অশেষ কল্যাণসাধন করেছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। একাদশ শতাব্দীতে মালবের রাজা ভোজ বাঁধ দিয়ে ভোলপুরে ২৫০ বর্গমাইলব্যাপী এক কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করান। প্রাগ্‌মুসলমান যুগের রাজপুত রাজাদের সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখেছেন—'যে সমস্ত দেশ তাঁরা শাসন করতেন সে-সব জায়গায় সর্বত্র সেচ-বিভাগের বড় বড় কাজের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে—এই সমস্ত দ্বারা তাঁরা কৃষির সাহায্য এবং জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করতেন।' চোলবংশের প্রধান রাজা রাজেন্দ্র চোল একাদশ শতাব্দীতে কৃষির সুবিধার জন্য ষোলো মাইল লম্বা এক হ্রদ তৈরি করেছিলেন।

ব্যবসার উন্নতিকল্পেও রাজশক্তি সর্বপ্রকারে সাহায্য করত। শিল্পীরা দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করত। চন্দ্রগুপ্তের সময় সমুদ্রগর্ভ থেকে শঙ্খ, মুক্তা, প্রভৃতি সংগ্রহ করার জন্য সরকারী নৌ-জাহাজ সাধারণকে ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অবশ্য জনসাধারণ নিজেদের জাহাজ যে ব্যবহার করতে পারত এ কথা বলাই বাহুল্য। যারা অর্থের অভাবে জাহাজ তৈরি করতে পারত না, তারা সরকারী জাহাজ ভাড়া নিয়ে মুক্তা, প্রবাল সংগ্রহ করতে পারত। অন্যদেশের পণ্য দেশে আসবার বিশেষ সুবিধা করে দেওয়া হত। কৌটিল্যের মতে 'পর-

ভূমিজং পণ্যমনুগ্রহেনাবহয়েৎ। নাবিক সার্থবাহেভ্যশ্চ পরিহারমায়তিক্ষমং দদ্যাৎ॥'—যারা অন্য দেশজাত পণ্য আমদানী করবে, তাদের অনুগ্রহের সঙ্গে আহ্বান করবে। যে সমস্ত নাবিক ব্যবসাদার বিদেশী পণ্য আমদানী করে তাহাদের ব্যবসার জন্য ট্যাক্স মাপ দিতে হবে যেন তারা কিছু লাভ করতে পারে। ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষির সুবিধাই যে শুধু তাঁরা দেখেছেন তা নয়, যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাট বেশ ভালোভাবে রাখতেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পাটলিপুত্র থেকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ পর্যন্ত রাজপথ ছিল। পথিকদের সুবিধার জন্য ঐ রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ ও কূপ খনন করা হয়েছিল এবং কিছু দূরে দূরে সরাইখানাও ছিল। কৌটিল্যে পশু-চিকিৎসার ব্যবস্থাও আছে। সম্রাট অশোক শুধু যে নিজের রাজ্যেই মানুষ ও পশু-চিকিৎসার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা নয়, পার্শ্ববর্তী দাক্ষিণাত্যের চের, চোল প্রভৃতি রাজ্যে ও সিংহলে চিকিৎসক পাঠিয়ে হাসপাতাল স্থাপন করেছিলেন। সাহিত্য, শিল্পকলা প্রভৃতিও রাজাদের বদান্যতায় অশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। মৌর্য ও গুপ্তসম্রাটরা, হর্ষবর্ধন, অন্ধ্র, পল্লব, রাষ্ট্রকূট, চোল ও পাল রাজারা সকলেই সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ভোজ রাজার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি নিজে একজন জ্ঞানী ও গুণী লোক ছিলেন এবং গুণীদের যথেষ্ট আদর করতেন। তাঁর বেশ একটি বড় লাইব্রেরি (সরস্বতী ভাণ্ডাগার) ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও রাজারা পণ্ডিতদের নানাভাবে সাহায্য করতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে রয়েছে, বিদেহরাজ-জনক পণ্ডিতদের সভা করে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যাজ্ঞবল্ক্যকে সহস্র গো-দান করেছিলেন—সেই সমস্ত গরুর শিঙ সোনা দিয়ে মোড়া ছিল।

রাজাদের শৌর্য-বীর্যও অন্য কোনো দেশের রাজাদের চেয়ে কম ছিল না। ভারতবাসীর শৌর্য-বীর্যে ভীত হয়েই বিখ্যাত গ্রীক্ বীর আলেকজাণ্ডারের সৈন্যরা যুদ্ধ করতে পরাঙ্মুখ হয়, যার ফলে সেই বীর-অভীপ্সিত রাজ্যলাভের পূর্বেই তাঁকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করতে হয়। চন্দ্রগুপ্তের কাছে গ্রীক্ সেনাপতি সেলুকসের পরাজয় ও নিতান্ত অপমানজনক সন্ধি আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ক্ষুদ্র ভারতীয় রাজাদের পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করে দিয়েছিল। হূণ আক্রমণ ইউরোপকে ধ্বংস-বিধ্বস্ত করেছিল, কিন্তু তারা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়। হিন্দুদের সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে তারা

সমবেত হয়ে কখনো বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করেনি। সুলতান মামুদের বিরুদ্ধে আনন্দপালের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান রাজা একত্র হয়ে সংগ্রাম করেছিলেন। মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিজ অলঙ্কার বিক্রয় করে সমর-অভিযানের জন্য অর্থদান করেছিল। অষ্টম শতাব্দীতে বাঙলা যখন চারদিকের আক্রমণে বিব্রত ও অরাজক হয়ে ওঠে, তখন বাঙালী দেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গোপালকে রাজপদে নিযুক্ত করে। ভারতীয়রা শুধু যে সিংহল, বলী, সুমাত্রা, আনাম, কাম্বোডিয়া প্রভৃতি স্থানে রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করেছিল তা নয়, একাদশ শতাব্দীতে রাজেন্দ্র চোল নৌবহর পাঠিয়ে ব্রহ্মদেশের কতকাংশ জয় করেন। নরমাণ্ডীর ডিউক উইলিয়ম কর্তৃক ঐ শতাব্দীতে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ইংলণ্ড জয়ের কীর্তির চেয়ে রাজেন্দ্র চোলের ব্রহ্ম-অভিযানের কীর্তি বড়। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি যদি এত উন্নত ছিল, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যদি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল, রাজন্যবৃন্দ যদি বীর ছিলেন, তবে ভারতবর্ষ পরাধীন হল কি করে? তার এত অধঃপতন বা ঘটল কি ভাবে! এই প্রশ্নের প্রচলিত উত্তর: হিন্দুদের দোষেই হয়েছে। এ সবই পাপের ফল—এটা দুর্বলের বা ধর্মান্ধের উক্তি। ঐতিহাসিক সে উত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারে না। মানুষের ও জাতির ভাগ্য—কুলালচক্রের মতো পরিবর্তিত হয়—একথাও তার উত্তর নয়। আমার মনে হয়, হিন্দু-ভারতবর্ষের পতনের কারণ এখনো সঠিক নির্ণীত হয়নি—তা বিস্তর গবেষণা সাপেক্ষ বলেই আমার ধারণা। যাক্, সে-কারণ অনুসন্ধান এ পুস্তকের বিষয় বহির্ভূত। এখন বিম্বিসারের (৫৪৩—৪৯১ খৃষ্টপূর্ব) সময় থেকে মহম্মদ ঘোরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয় পর্যন্ত রাজকাহিনী বা রাজনৈতিক ইতিহাস সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব। বিম্বিসারের পূর্বেও ভারতবর্ষে অনেক রাজা ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা নিশ্চিত ভিত্তির উপর তাঁদের সময় নির্ধারণ করতে পারেননি বা তাঁদের ইতিবৃত্ত লিখতে পারেননি। একথা বলে রাখা ভালো যে, রাজবংশাবলী বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাঁদের যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস লেখাও এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়।

বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বের অষ্টমবর্ষ কালে বুদ্ধের মৃত্যু হয়। বিম্বিসার দীর্ঘ ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব বুদ্ধের মৃত্যুর ৬০ বৎসর পূর্বে বা খৃষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে ভট্টিয় পুত্র বিম্বিসার মগধের পৈত্রিক সিংহাসনে আরোহণ

করেন। এই বংশকে সাধারণত শিশুনাগবংশ বলে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমাণ করেছেন যে, শিশুনাগ, বিন্দুসার ও অজাতশত্রুর পরবর্তী। অতএব এই বংশকে বিম্বিসার বংশ নামে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত। রায়চৌধুরীর মতে আধুনিক জার্মান জাতির ইতিহাসে প্রয়সেন বা প্রুশিয়ার যে-স্থান, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে মগধের সেই স্থান। বিম্বিসার যে ভিত্তি পত্তন করেন, চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের সময়ে ক্রমে তা পরিপূর্ণতা লাভ করে। অশোকের সময়ে দাক্ষিণাত্যের সামান্য অংশ বাদে হিন্দুকুশ পর্বত থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ভারত মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিম্বিসাব যখন মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন মগধ-রাজ্য বর্তমান পাটনা ও গয়া জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিম্বিসারের সময়ে মগধ ছাড়া কোশল, অবন্তী ও বৎস (এলাহাবাদ জিলার অন্তর্গত) এই তিনটি প্রভাবশালী রাজ্য ছিল। বিম্বিসার কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনী কোশলদেবীকে বিবাহ করেন। কোশল-দেবী প্রসাধনের ব্যয়-নির্বাহের জন্য কাশীর কিয়দংশ যৌতুকস্বরূপ লাভ করেন। এই প্রসেনজিতের পুত্র বীরুধকই শাক্যদের হত্যা করেন এবং কপিলবস্তু ধ্বংস করেন। অবন্তীরাজ প্রদ্যোৎ ও গান্ধাররাজ পুক্কুসাতির সঙ্গে বিম্বিসারের বন্ধুত্ব ছিল। প্রদ্যোৎ পাণ্ডু-রোগাক্রান্ত হলে বিম্বিসার তাঁর চিকিৎসক প্রসিদ্ধ জীবককে অবন্তী পাঠিয়ে দেন। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মাতুল লিচ্ছবীবংশীয় বৈশালীরাজ চেতকের কন্যা চেল্লনা বিম্বিসারের অপর স্ত্রী ছিলেন। এক মতে কোশলদেবী এবং অপর মতে চেল্লনা অজাতশত্রুর মাতা। বৈশালী গণতন্ত্র-মূলক রাজ্য ছিল এবং লিচ্ছবীদের মধ্যে খুব উদার গণতন্ত্রের ভাব প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তাদের বেশ একটা খ্যাতি ছিল। বুদ্ধের জীবিতকালে বৈশালী ও শাক্যরাজ্য ছাড়াও ব্রিজিদের অধীনে মিথিলা, মল্লদের অধীনে পাবা এবং কুশীনগরও গণতন্ত্রমূলক রাজ্য ছিল। বিবাহসূত্রে কোশল ও বৈশালীরাজ ও সৌহার্দনিবন্ধন গান্ধার ও অবন্তীরাজের সঙ্গে সদ্ভাব থাকাতে মগধের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পক্ষে খুব সুবিধা হয়। বিম্বিসার অঙ্গ (ভাগলপুর, সম্ভবত মুঙ্গেরও) জয় করে মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ (রাজগির) মগধের রাজধানী ছিল। আশী হাজার গ্রাম বিম্বিসারের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সেই সকল গ্রামের আশী হাজার প্রতিনিধির বা গ্রামিকদের এক সভা [illegible] ছিল এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। আশী হাজার সংখ্যাটি আমার

কাছে অতিরঞ্জিত মনে হয়, কিন্তু তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামের প্রতিনিধিদের সভা হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। মনে হয় প্রজাসাধারণের অভিরুচি অনুযায়ী শাসন করবার জন্যই বিম্বিসার গ্রামিকদের সভা আহ্বান করেছিলেন। বিম্বিসারবংশ সম্বন্ধে এই অখ্যাতি প্রচলিত যে 'রোমে নেরোবংশ যেমন মাতৃহন্তাবংশ, তেমনি বিম্বিসারবংশও পিতৃহন্তাবংশ' (পিপার)। ভিন্সেণ্ট স্মিথের মতে এই প্রবাদের মূলে কোনো সত্য নেই।

জৈনদের মতে বিম্বিসার ও অজাতশত্রু উভয়েই জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। আবার বৌদ্ধগ্রন্থে পাওয়া যায় অজাতশত্রু বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি তথাগতের অনুরক্ত এই কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আমার মনে হয় বিম্বিসার ও অজাতশত্রু উভয়েই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন কিন্তু তাঁদের বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মাবলম্বী বলা ঠিক নয়।

বিম্বিসার যে জয়ের সূচনা করেন, অজাতশত্রু (৪৯১-৪৫৯ খৃষ্টপূর্ব) রাজা হয়ে পিতার প্রবর্তিত পথে আরো অধিকতর কৃতকার্যতার সঙ্গে অগ্রসর হন। তাঁর সময়ে বৈশালীরাজ্য মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। মগধের বিরুদ্ধে কাশী কোশলরাজ ও বৈশালীরাজ একত্র হয়ে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ অনেকদিন ধরে হয়েছিল। অবশেষে অজাতশত্রুর মন্ত্রী বর্ষকারের কূটবুদ্ধি ও অজাতশত্রুর ক্ষমতাবলে কোশল ও বৈশালী পরাজিত হয়। এই রাজ্যবৃদ্ধির দরুন অবন্তীরাজের সঙ্গে মগধের মৈত্রী ক্ষুন্ন হয়। অজাতশত্রু অবন্তীরাজ প্রদ্যোতের আক্রমণ আশঙ্কা করে নিজ রাজধানী অধিকতরভাবে সুরক্ষিত করেছিলেন। সে আক্রমণ হয়েছিল কিনা জানা নেই, তবে মগধ যে অবন্তীর মাথা নত করাতে পারেনি একথা সত্য। বিম্বিসারবংশ অজাতশত্রুর সময়েই সবচেয়ে বেশি প্রতিপত্তি লাভ করে। ৩২ বৎসর রাজত্ব করে অজাতশত্রুর মৃত্যু হলে তাঁর পুত্র উদয়ী রাজা হন। তিনি গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে পাটলীপুত্র নগর প্রতিষ্ঠা করে সেখানে রাজধানী পরিবর্তন করেন। উদয়ীর পরবর্তী বিম্বিসারবংশীয় রাজাদের ব্যবহারে প্রজারা অসন্তুষ্ট হয়ে ঐ রাজবংশকে বিতাড়িত করে অমাত্য শিশুনাগকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অজাতশত্রুর সময়ে অবন্তীর সঙ্গে যে বিবাদ শুরু হয়েছিল শিশুনাগ কর্তৃক অবন্তীর পরাজয়ে তা পরিসমাপ্তি লাভ করে। ফলে চম্বল নদীর তীর পর্যন্ত মগধ রাজ্য বিস্তৃত হয়। শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ বা কালাশোককে

হত্যা করে 'শূদ্রাগর্ভোদ্ভব' মহাপদ্ম নন্দ বা উগ্রসেন খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহাপদ্ম নন্দ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনা করে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর ব্যতীত উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত অংশই মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কলিঙ্গও (বৈতরণী ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্তী দেশ) নন্দর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ নন্দ জয় করেছিলেন। নন্দের সময়েই প্রথম ভারতবর্ষে এক বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়; আটাশ বৎসর রাজত্বের পর পুত্রদের জন্য বিস্তীর্ণ রাজ্য, প্রচুর ধনসম্পদ, বিরাট সৈন্যবাহিনী রেখে নন্দ মারা যান। নন্দের আট ছেলে মোট বারো বৎসর রাজত্ব করেন। নন্দবংশীয় রাজারা রাজ-কোষে প্রচুর অর্থ জমা করেছিলেন। মহাপদ্মের কনিষ্ঠ পুত্র ধনসম্পদ সঞ্চয় পছন্দ করতেন বলে ধননন্দ নামে অভিহিত হয়েছিলেন। প্রজাদের উৎপীড়ন করে অর্থ আদায় এই প্রচুর ধনসম্পদের মূলে থাকা অসম্ভব নয়। তাই নন্দবংশীয় রাজারা প্রজাদের অপ্রীতিভাজন হয়ে উঠেছিল। তার পরিণতি মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক নন্দবংশ ধ্বংস ও মৌর্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা।

যখন মগধে এমনি করে একটি শক্তিশালী বিস্তীর্ণ রাজ্য গড়ে উঠেছিল, সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ও ধনসম্পদশালী হওয়ায় বিদেশীর লোলুপদৃষ্টি আকর্ষণ করে। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে (৫৫৮-৫৩০ খৃষ্টপূর্ব) পারস্যের রাজা কুরুস্ গেড্রোসিয়ার ভিতর দিয়ে ভারত-বর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু কোনো রকমে মাত্র সাতজন সঙ্গীকে নিয়ে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। অবশ্য দ্বিতীয় অভিযানে তিনি কাবুল উপত্যকার কতকাংশ অধিকার করতে সক্ষম হন। কুরুসের পরে সেই বংশেরই তৃতীয় রাজা দরায়ুস (খৃষ্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬) ভারতবর্ষ আক্রমণ করে গান্ধার ও সিন্ধু-নদের তীরস্থ কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্য অধিকার করেন। পারস্য সম্রাট ভারতীয় রাজ্য থেকে বার্ষিক ৩৬০ ট্যালেণ্ট পরিমিত স্বর্ণ (আধুনিক হিসাবে প্রায় ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা) পেতেন। দরায়ুসের পুত্র জ্যারাক্সেসের রাজত্ব-কালেও ভারতের ঐ সমস্ত স্থান পারস্যের অধীনে ছিল। ঠিক কখন ভারতবর্ষ থেকে পারস্যের অধিকার বিলুপ্ত হয় তা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার কর্তৃক ৩৩১ খৃষ্টপূর্বাব্দে দরায়ুস পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হলে ভারতের উপর পারস্যের অধিকার যে বিলুপ্ত হয় সে বিষয়ে কোনো

সন্দেহ নেই। পারস্য জয়ের পর আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে ভারত অভিমুখে অভিযান শুরু করেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান ইউরোপীয়দের বিজয়ীরূপে প্রথম ভারতবর্ষে পদার্পণ। তাই বোধ হয় ভিন্সেন্ট স্মিথ মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে তাঁর প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রায় এক সপ্তমাংশ ধরে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ বর্ণনা করেছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর পুস্তকের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে সত্য কথা অতি সরল ও প্রাঞ্জলভাবে লিখেছেন—'আধুনিক ইউরোপীয়েরা গ্রীসের ধার করা গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করেন তাই তাঁরা এই বিষয়টিকে খুব একটি মনোমুগ্ধকর ঘটনা বলে ধরেন, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতান মামুদ, তৈমুরলঙ্গ, বা নাদির সাহের আক্রমণের চেয়ে এই অভিযান বেশি মূল্যবান ঘটনা বলে দাবী করতে পারে না।' শুধু তাই নয় আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ইতিহাস গ্রীক তথা ইউরোপীয় সভ্যতার পক্ষে গৌরবের নয়। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণও তৈমুরলঙ্গ বা নাদির সাহের আক্রমণের মতো নৃশংসতায় পরিপূর্ণ। ম্যাসাগার দুর্গের সৈন্যদের শঠতাপূর্ণভাবে হত্যা, স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে অধিকৃত শহরের অধিবাসীদের বিনাশ গ্রীকবিজয়ের ইতিহাসকে চিরকাল জগতের সম্মুখে কলঙ্কিত করে রাখবে। মুলতান থেকে ৮০।৯০ মাইল দূরে ঝঙ্গ ও মণ্টগোমারী জিলার মধ্যে অবস্থিত তৎকালীন একটি শহর আক্রমণে আলেকজাণ্ডার সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। তাই শহর দখল করার পর 'উত্তেজিত সৈন্যরা হতভাগ্য অধিবাসীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুসন্তান নির্বিশেষে সকলকে হত্যা করেছিল।' (ভিন্সেণ্ট স্মিথ)।

আলেকজাণ্ডার পাঞ্জাবে বিপাশা নদীর সীমা পর্যন্ত জয় করেন। বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরু খুব বীরত্ব সহকারে আলেকজাণ্ডারের গতিরোধ করেন। যদিও পুরু পরাজিত হন তথাপি পুরু ও তাঁর সৈন্যদের বীরত্ব ও সাহসিকতায় গ্রীকরা এতদূর শঙ্কিত হয়েছিল যে বিপাশা নদীর পূর্বতীরে তাদের বাধা দেওয়ার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ সাহসী ভারতীয় সৈন্যরা প্রস্তুত আছে এবং মগধের রাজাও বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত একথা শুনে তারা বিপাশা নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে অস্বীকার করে। ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা পুরুর সঙ্গে যুদ্ধ করতেই গ্রীকসৈন্যদের

যেরকম বিব্রত হতে হয়েছিল বিরাট সৈন্যবাহিনীর কথা শুনে যে তারা এরকম শঙ্কিত হবে সে আর বিচিত্র কি! আলেকজাণ্ডারের শত উৎসাহব্যঞ্জক বাণীও তাদের প্রবুদ্ধ করতে পারেনি—সৈন্যরা একরকম আলেকজাণ্ডারের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। গ্রীক সৈন্যদের এই দুর্বলতা সত্বেও ভিন্সেণ্ট স্মিথ ইউরোপীয় গর্বান্ধতাবশত অনৈতিহাসিকের মতো লিখেছেন: 'হিমালয় থেকে সাগব পর্যন্ত আলেকজাণ্ডারের সগর্ব অভিযান এই কথাই প্রমাণ করে যে এশিয়ার বৃহত্তম সৈন্য যখন ইউরোপীয় নৈপুণ্য ও কর্মকুশলতার সম্মুখীন হয় তখন তার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।'

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ ভারত ইতিহাসে একটা বড় ঘটনা নয়। গ্রীক-সৈন্যরা অগ্রসব হতে অনিচ্ছুক হলে খৃষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৩২৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যেই ভাবতবর্ষ থেকে গ্রীক-ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। বীর যুবক চন্দ্রগুপ্ত এই কার্যে সেনাপতিত্ব করেন। সম্ভবত তক্ষশিলাই গ্রীকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। চন্দ্রগুপ্ত তখন তক্ষশিলায়। অসামান্যবুদ্ধিসম্পন্ন তক্ষশিলা নিবাসী ব্রাহ্মণ কৌটিল্য বা চাণক্য চন্দ্রগুপ্তের গুরু এবং তিনি এই কার্যে তাঁর সহযোগী ছিলেন, এরূপ প্রবাদ আছে। চাণক্য ও চন্দ্রগুপ্তের মিলন ভারত ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চাণক্যের বুদ্ধি আর চন্দ্রগুপ্তের বীরত্ব—এই দুইয়ের মণিকাঞ্চন সংযোগ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে। আধুনিক জার্মান ইতিহাসে বিসমার্কের যে স্থান প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে চাণক্যের সেই স্থান একথা বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

পুরুকে আলেকজাণ্ডার তাঁর একজন অধীনস্থ রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কিন্তু একজন গ্রীক শাসনকর্তা সম্ভবত পুরুকে হত্যা করেন। ফলে জনসাধারণ খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর খবর তক্ষশিলায় পৌছলে চন্দ্রগুপ্ত সুযোগ বুঝে গ্রীকদের বিরুদ্ধে লোকদের উত্তেজিত করে সৈন্য সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে চাণক্য তাঁর প্রধান সহায় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত এই সমস্ত সৈন্যের সাহায্যে আলেকজাণ্ডার যে গ্রীকবাহিনী রেখে গিয়েছিলেন তার প্রায় সবই ধ্বংস করেন। এবং এই সৈন্যদের সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত (৩২১-২৯৮ খৃষ্টপূর্ব) মগধের নন্দরাজাকে পরাজিত ও হত্যা করে

৩২১ খৃষ্টপূর্বাব্দে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রীক ক্ষমতা ও নন্দবংশ ধ্বংসের তথা চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বপূর্ণ ভারত-ইতিহাসের এক অংশের বিস্তৃত বিবরণ আজ পাওয়া যায় না।

চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যে বংশ মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে মৌর্যবংশ বলে। কেন এই বংশকে মৌর্যবংশ বলে সে সম্বন্ধে তিনটি মত আছে:—(১) মুরা নামক এক দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম; (২) নন্দরাজার এক ময়ূর-পোষকের কন্যার গর্ভে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম তাই এই বংশ মৌর্যবংশ নামে খ্যাত, এই উভয় মতেই নন্দবংশীয় এক রাজা চন্দ্রগুপ্তের পিতা; (৩) তৃতীয় মতে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতের পিপ্পলিবনের মৌর্য নামক ক্ষত্রিয় বংশ থেকে উদ্ভুত বলে এই বংশের নাম মৌর্যবংশ। শেষোক্ত মতই অধিকতর সমর্থনযোগ্য।

সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত সমস্ত উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে মগধ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে মগধকে অশেষ ক্ষমতাশালী করে তোলেন। নর্মদা নদী পর্যন্ত যে তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের মতে তামিল দেশের তিনেভেলি জিলা পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের বিজয়-বাহিনী প্রবেশ করেছিল। মহীশূরে আবিষ্কৃত কোনো কোনো খোদিত লিপিতে উত্তর মহীশূর পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যবিস্তৃতিব কথা পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্ত যখন মগধের রাজ্যকে শক্তিশালী করছিলেন ঠিক সেই সময়ে আলেকজাণ্ডারের এক সেনাপতি সেলুকস নিকেটর (বিজেতা) প্রতিদ্বন্দ্বী এন্টিগোনাসকে পরাজিত করে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এক শক্তিশালী গ্রীক রাজ্য গড়ে তোলেন এবং নিজেই তার রাজা হন। আনুমানিক ৩০৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে সেলুকস আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত ভারতের অংশ নিজেব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছায় ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি মনে করেছিলেন আলেকজাণ্ডারের মতো তাঁর পক্ষেও বিপাশা পর্যন্ত জয় করা বিশেষ কষ্টকর হবে না। কিন্তু তিনি একটা কথা ভুলে গিয়েছিলেন যে আলেকজাণ্ডারের সময়ে উত্তর-পশ্চিম ভারত যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পরস্পরবিরোধী রাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল তখন আর তেমন নয়—তখন চন্দ্রগুপ্তের অধীনে সমস্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত এক শক্তিশালী রাজ্য। এই সর্বপ্রথম এক বীর সেনাপতির অধীনে একদল সুশিক্ষিত গ্রীকসৈন্য বীর নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত সঙ্ঘবদ্ধ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হয়।

যুদ্ধেব বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সেলুকস নিতান্ত অপমানজনক সন্ধি কবতে বাধ্য হন। অতএব ইউরোপীয় সৈন্যের রণনৈপুণ্য ও কুশলতার সম্মুখে এশিয়ার বৃহত্তম সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা সুস্পষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, ভিন্সেণ্ট স্মিথ-এর ইউরোপীয় নৈপুণ্যের গর্বই মিথ্যা ও অসাব প্রতিপন্ন হয়। তাই ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই যুদ্ধের উপর কোনো মন্তব্য কবেননি। সেলুকসেব পক্ষে ভারতবর্ষের কোনো অংশ জয় করা তো দূরে থাক বরং তিনি নিজ সাম্রাজ্য থেকে হিরাট, কাবুল, কান্দাহার ও মকরাণ এই চারটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দিতে বাধ্য হন। ফলে হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বিস্তৃত হয়। খৃষ্টপূর্ব ৩০৩ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকসের মধ্যে সন্ধি হয়। এর পরে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতিই ছিল। মেগাস্থেনিস নামক একজন গ্রীক রাজদূত চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায ছিলেন। এই সন্ধির প্রায় ছয় বৎসর পবে (২৯৮ খৃষ্টপূর্বাব্দে, হ্যাভেলের মতে ২৯৬ খৃষ্টপূর্বাব্দে) চন্দ্রগুপ্তেব মৃত্যু হয বা তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। জৈন মতে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে দাক্ষিণাত্যে উপবাস করে মারা যান একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। চন্দ্রগুপ্ত যে জৈন ছিলেন একথা অনেকে বিশ্বাস করেন না।

মেগাস্থেনিস ও অন্যান্য গ্রীক লেখকদের বিবরণ ও ১৯০৫ সালে শাম শাস্ত্রী কর্তৃক আবিষ্কৃত কৌটিল্যেব অর্থশাস্ত্র নামক সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক থেকে চন্দ্রগুপ্তের রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারা যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ চন্দ্রগুপ্তের বীরত্বের প্রশংসা করে কোনো কথা লেখেননি, বরং এই ভারতীয় নরপতিকে হেয় করে চিত্রিত করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তাঁর গ্রীকবিজয় সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, এতে প্রজাদের কোনো লাভ হয়নি, প্রভুর পরিবর্তন হয়েছে মাত্র এবং যদিও চন্দ্রগুপ্ত বিদেশীর অধীনতা থেকে তাদের মুক্ত করেছিলেন, তবুও চন্দ্রগুপ্তের অত্যাচারমূলক শাসন তাঁকে মুক্তিদাতা এই উপাধির অযোগ্য করেছিল।

এই মন্তব্যের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। কৌটিল্যে রয়েছে 'প্রজার সুখেই রাজার সুখ, রাজার আত্মপ্রিয় হিত নয় প্রজার প্রিয়ই হিত,' অতএব সেই রাষ্ট্র প্রজাপীড়ক ছিল একথা ছেলেদের বোঝাবার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হতে হবে। কৌটিল্যে আরও আছে, 'যে চাপ্যসম্বন্ধিনোঽবশ্যভর্ত্তব্যাস্তে'—যারা সম্বন্ধহীন অর্থাৎ পিতৃমাতৃহীন অনাথ তাদের অবশ্য ভরণপোষণ করতে হবে। বিংশ

শতাব্দীতেও ভারতবর্ষে সম্বলহীনদের জন্য কোনো সরকারী ব্যবস্থা নেই, তাদের অনেককেই ভিখারীরূপে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়। কৌটিল্যে সূত্রাধ্যক্ষের (সুতা ও বস্ত্রবিভাগের কর্তা) উপর নির্দেশ রয়েছে—যাঁরা 'অনিষ্কাষিণ্য'—অর্থাৎ ঘর থেকে বের হন না, 'প্রোষিত বিধবা' (যাদের স্বামী বিদেশে আছে), অঙ্গহীন ও মেয়েরা যদি নিজের ভরপোষণের জন্য কাজ করতে বাধ্য হন তবে সূত্রাধ্যক্ষ 'স্বদাসীভিরনুসার্য্য সোপগ্রহং কর্ম করয়িতব্যা' —নিজ বিভাগের দাসী দ্বারা তাঁদের খোঁজ করে খুব সম্মান ও ভদ্রতা সহকারে কাজ করিয়ে (সুতা কাটিয়ে) নেবেন; অর্থাৎ সুতা কাটিয়ে পয়সা দেবেন যাতে তাঁদেব ভরণপোষণের সাহায্য হতে পারে। এমন প্রাণের পরশ যে রাষ্ট্রের ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে সে রাষ্ট্রকে যাঁরা অত্যাচারী বলতে পারেন তাঁরা পৃথিবীতে সূর্যের অনস্তিত্ব প্রচার করতে পারেন এবং জন্মান্ধদের পক্ষে তা বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রতীয়মান হওয়াও অসম্ভব নয়।

কৌটিল্য পড়লেই মনে হয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-ব্যবস্থা প্রজার সুখের প্রতি লক্ষ্য রেখেই নিয়ন্ত্রিত হত। শুল্কাধ্যক্ষের ও পণ্যাধ্যক্ষের উপর যথাক্রমে নির্দেশ রয়েছে: 'যা রাষ্ট্রপীড়াকর এবং ফলহীন সেরূপ জিনিস দেশে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে, আর যা মহোপকারী এবং যে সমস্ত বীজ দুর্লভ সে সমস্ত বীজ বিনা শুল্কে আসতে দিতে হবে।' 'উভয়ং চ প্রজানামনুগ্রহেন বিক্রাপয়েৎ। স্থলমপি চলাভং প্রজানামোপঘাতিকং বাবয়েৎ॥'—স্বভূমিজ এবং পরভূমিজ এই উভয় প্রকারের দ্রব্যই যাতে প্রজার সুবিধা হয় এমন ভাবে বিক্রি করতে হবে, যেরূপ অধিক লাভ করলে প্রজার ক্ষতি হয় সেরূপ করা নিষিদ্ধ। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তাই বলে আমি বলছি না চন্দ্রগুপ্তের সময়ে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা ছিল তা বিংশ শতাব্দীতে চলতে পারে কিম্বা তা আদর্শস্থানীয়। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে খুব কঠোর দণ্ডনীতির ব্যবস্থাও ছিল—যথা গরু চুরি বা খনি থেকে মূল্যবান প্রস্তর চুরি অপরাধে প্রাণদণ্ড, বসন্ত বা গ্রীষ্মকালে দুবার গরু দোহন করলে দোহনকারীর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্তন। যদিও এক অন্যায় অপর অন্যায়ের সমর্থনে যুক্তিস্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারে না তবুও আমাদের দেশের লোকের একথা জেনে রাখা ভালো যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও ইংলণ্ডে অন্যের পকেট কেটে চুরি, কোনো দোকান থেকে পাঁচ শিলিং চুরি প্রভৃতি দুই শত প্রকারের অপরাধের

জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক চেষ্টার ফলে সে সমস্ত আইন রদ হয়েছে।

চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। মন্ত্রী রাজা নিজে নিযুক্ত করতেন, কিন্তু মন্ত্রীপরিষদের সভ্যরা কি ভাবে নিযুক্ত হতেন তার কোনো উল্লেখ নেই। রমেশচন্দ্র মজুমদার মন্ত্রীদের ও মন্ত্রীপরিষদকে যথাক্রমে শাসন পরিষদ (Executive Council) ও ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) আখ্যা দেওয়া যেতে পারে একথা বলেছেন। মনে হয় মন্ত্রীপরিষদের সভ্য সংখ্যা অনেক ছিল, কারণ কৌটিল্য মন্ত্রীপরিষদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন: 'ইন্দ্রের পরিষদে এক সহস্র ঋষি ছিলেন তাই ইন্দ্রকে সহস্রচক্ষু বলে।' মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীপরিষদের সভ্যরা সকলেই বেতনভোগী ছিলেন। মন্ত্রীদের বার্ষিক বেতন ছিল ৪৮০০০ পণ বা ৩২০০০৲ টাকা, আর মন্ত্রীপরিষদের সভ্যদের বেতন ১২০০ পণ বা ৮০০০৲ টাকা। কৌটিল্যের মতে রাজাও বেতনভোগী। রাজা, মন্ত্রীরা ও মন্ত্রীপরিষদের সভ্যদেব মিলিত সভায় অধিকাংশের মতানুসারে বিশেষ প্রয়োজনীয় (আত্যয়িক) সমস্ত কার্য নির্বাহ হত। অনুপস্থিত সভ্যদের লিখিত মত নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ কার্যের জন্য মন্ত্রীপরিষদ আহ্বান করা হত না, মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কাজ চলত। রাজকার্য পরিচালনার জন্য ১৮টি বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সমস্ত অধ্যক্ষ রাজা, মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য পরিচালনা করতেন। আকরাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, কুপাধ্যক্ষ (বন বিভাগের কর্তা), শুল্কাধ্যক্ষ, সীতাধ্যক্ষ (কৃষিবিভাগের কর্তা), সূত্রাধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, নাবধ্যক্ষ (নৌ বিভাগের কর্তা), গোহধ্যক্ষ, লক্ষণাধ্যক্ষ (টাঁকশালার কর্তা) প্রভৃতি অষ্টাদশ বিভাগের নাম পাওয়া যায়।

চন্দ্রগুপ্তের সময় স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা প্রস্তুত হত। রৌপ্য মুদ্রায় শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ রূপা, এবং তাম্রমুদ্রায় শতকরা ২৫ ভাগ রূপা ৭০ ভাগ তামা থাকত। স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করার জন্য ভিন্ন বিভাগ ছিল। সুবর্ণাধ্যক্ষের অধীনস্থ সৌবর্ণিক স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করতেন। জনসাধারণ সৌবর্ণিককে সোনা দিয়ে স্বর্ণ মুদ্রা তৈরি করিয়ে নিতে পারত।

বিভিন্ন বিভাগের কার্য সম্বন্ধে কৌটিল্যে যে সব বর্ণনা রয়েছে তাতে মনে

হয় বেশ বিজ্ঞ লোকের হাতেই বিভাগের কর্তৃত্ব ন্যস্ত হত। সে সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ছিল তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

পাটলিপুত্র শহর চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল। বর্তমানে যেমন বড় বড় শহরে মিউনিসিপালিটি আছে পাটলিপুত্রেও সে সময়ে নগর-পরিষদ ছিল। রাস্তায় ময়লা ফেললে জরিমানার ব্যবস্থা কৌটিল্যে দেখতে পাই। কাজেই মনে হয় সেকালে আমাদের দেশে নাগরিক দায়িত্ব সম্বন্ধে বেশ উন্নত ধারণা ছিল। মেগাস্থিনিসের বর্ণনানুযায়ী পাটলিপুত্র শহর আয়তনে প্রায় ১৬ বর্গমাইল ছিল—প্রাচীন রোমের চেয়ে অনেক বড। শহরে ৬৪টি তোরণ ও ৫৭০টি স্তম্ভ ছিল, আর চন্দ্রগুপ্তের কাষ্ঠনির্মিত প্রাসাদ সেকালে জগতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হত।

কৌটিল্য থেকে আমরা চন্দ্রগুপ্তের সময়কার অনেক খবর পেতে পারি। এরূপ মূল্যবান পুস্তক খুব কমই আবিষ্কৃত হয়েছে। কৌটিল্য পড়লে একথা দিবা-লোকের মতো প্রতিভাত হয় যে খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সভ্যতার দিক দিয়ে খুবই উন্নত ছিল। এই উন্নতি বহু শতাব্দী ব্যাপী ক্রমোন্নতির ফল। কৌটিল্যের বিস্তৃত আলোচনা এ পুস্তকে সম্ভবপর নয়, কিন্তু যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে চান তাঁদের পক্ষে এটি অবশ্য-পাঠ্য পুস্তক বললে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র বিন্দুসার (২৯৮-২৭০ খৃষ্টপূর্ব) মগধের রাজা হন। বিন্দুসারের সময়ে রাজ্যের কোনো কোনো স্থানে বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু তিনি সে সমস্ত দমন করতে সমর্থ হন। পুরানো মতে ২৫ এবং অপর মতে ২৮ বৎসর রাজত্বের পর খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ বা ২৭০ অব্দে বিন্দুসার মারা যান এবং তাঁর পুত্র প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক (২৭০-২৩২ খৃষ্টপূর্ব) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অশোক সম্বন্ধে এইচ. জি. ওয়েলস্ লিখেছেন, 'হাজার হাজার রাজা মহারাজা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হবে কিন্তু ভল্গা থেকে জাপান পর্যন্ত অশোক একাকীই উজ্জ্বল তারকার মতো আকাশে দেদীপ্যমান থাকবেন।' আরো বলেছেন, 'তাঁর রাজত্ব মানবজাতির উৎকণ্ঠাপূর্ণ ইতিহাসের একটি পরম রমণীয় অঙ্ক।'

বিন্দুসারের মৃত্যুর চার বৎসর পরে অশোক রাজা হিসাবে অভিষিক্ত হন। কেউ কেউ মনে করেন ভ্রাতৃবিরোধই এর কারণ। বৌদ্ধ পুস্তকে পাওয়া

যায় অশোক তাঁর একশত ভ্রাতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাই প্রথম তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে খ্যাত ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তাঁর আত্যন্তিক পরিবর্তন ঘটলে তিনি 'ধর্মাশোক' নামে খ্যাত হন। বৌদ্ধধর্মের গুণকীর্তন ভিন্ন এর মূলে কোনো সত্য নেই। ভিন্সেণ্ট স্মিথ মনে করেন সিংহাসন নিয়ে তাঁর এক ভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ থাকার মূলে সত্য থাকা অসম্ভব নয়। কাশীপ্রসাদ জয়সোয়ালের মতে সেকালে অভিষেকের নির্দিষ্ট বয়স ২৫ বৎসর ছিল; বিন্দুসারের মৃত্যুর সময়ে অশোকের বয়স ২১ ছিল, তাই চার বৎসর পরে তিনি যথারীতি অভিষিক্ত হন।

অশোকের রাজত্বের বারো বছর ও অভিষেকের আট বছর পরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক বন্দী এবং এক লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ছাড়া যুদ্ধের আনুষঙ্গিক দুঃখ, কষ্ট, অনাহার দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে আরো অনেক লোক মারা যায়। মানুষের এই অশেষ কষ্ট দেখে অশোকের করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। এর পর তিনি আর কোনো যুদ্ধ করেননি। রাজ্যবিস্তারের লিপ্সা রাজাদের প্রাণে সাধারণত প্রবল—বিশেষ করে জয়ের পর তা প্রবলতরই হয়। অতএব অশোকের এই পরিবর্তন জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। 'তিনিই জগতে একমাত্র রাজা যিনি যুদ্ধ জয়ের পর যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছেন' (ওয়েলস্)।

অশোক একজন মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। সমস্ত প্রাণীর জন্যই তাঁর প্রাণে দরদ ছিল। তিনি মানুষ ও পশু-চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু নিজ রাজ্যে নয় বিভিন্ন রাজ্যেও তিনি ডাক্তার পাঠিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন একথা আগে উল্লেখ করেছি। তিনি পথিকদের সুবিধার জন্য রাস্তার দুধারে গাছ রোপণ ও কূপ, দিঘি প্রভৃতি খনন করেছিলেন। তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মের মধ্যে অপ্রাকৃত বুজরুকী স্থান পায়নি। সত্য, জীবে দয়া প্রভৃতি ছিল তাঁর ধর্মমতের প্রধান কথা। ধর্মদান—শ্রেষ্ঠ দান, এই ছিল তাঁর মত। তাই তিনি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম জগতের একটি প্রধান ধর্ম বলে পরিগণিত হয়েছে। প্রজাদের মন যাতে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয় সেজন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র সহজ প্রাকৃত ভাষায় তাঁর অনুশাসনে ও খোদিত লিপিতে সরল অথচ উচ্চাঙ্গের

সব ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন। তিনি নিজপুত্র মহেন্দ্র, কন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও চারুমতীকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে ব্রতী করেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে মহেন্দ্র ভ্রাতা ও সঙ্ঘমিত্রা ভগিনী। মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে ও চারুমতী নেপালে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অশেষ সাহায্য করেন।

তাঁর ধর্মমতের মধ্যে কোনো ধর্মান্ধতা ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ও ভিন্ন ভিন্ন পথে পরম-পদ লাভেরই চেষ্টা করছে এই ভেবে তিনি সকল মতের প্রতিই উদার ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর রাজ্যে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের প্রতি দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা ছিল। তিনি যে শুধু একজন ধার্মিক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন তা নয়, রাজকার্যেও অতি সুদক্ষ ছিলেন। রাজকর্মচারীদের উপর তাঁর বিশেষ আদেশ ছিল প্রজাদের তাঁর নিজের ছেলের মতো দেখবার জন্য। প্রজাদের হিতকর কার্য করে তিনি নিজের কর্তব্য পালন ভিন্ন বিশেষ কিছু করছেন বলে ভাবতেন না। রাজকার্যে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁর অনুশাসনে নির্দেশ রয়েছে: 'সকল সময়ে এবং সকল স্থানে, আমি আহারে নিযুক্ত কিম্বা মহিলাদের প্রকোষ্ঠে, শয্যাগৃহে, গুপ্তগৃহে (পায়খানায়), গাড়িতে অথবা প্রাসাদ-উদ্যানে যেখানেই থাকি না কেন, সরকারী সংবাদদাতারা আমাকে সর্বদা প্রজাদের কার্যের বিষয় অবগত করবে এবং সব জায়গা থেকেই আমি প্রজাসাধারণের কার্য নির্বাহ করতে প্রস্তুত।' তিনি আরো বলেছেন যে যদি কখনো রাজাদেশ প্রতিপালন করতে কোনো অসুবিধা ঘটে তবে তৎক্ষণাৎ তা রাজাকে জানাতে হবে—'কারণ যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থানে সাধারণের উপকারের জন্য আমাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে।'

উদার ধর্মমত, প্রজাবাৎসল্য, কর্তব্যনিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অক্লান্ত প্রচেষ্টা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অশোককে জগতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটরূপে পরিগণিত করেছে। অশোক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পেরও একান্ত অনুরাগী ছিলেন। যদিও তাঁর তৈরি স্তম্ভ, স্তূপ ইত্যাদি বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ মাত্র, তবুও সাঁচি ও সারনাথে এখনো অনেক যে সমস্ত জিনিস বর্তমান তাতেই সে যুগের শিল্পকলার উন্নত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।

অশোকের যুদ্ধবিরতি বা অহিংসাধর্ম প্রচারের ফল মৌর্যরাজ্যের পতন, একথা

অনেকে বলেন। কলিঙ্গ বিজয়ের অর্থাৎ তাঁর যুদ্ধ বিরতির সংকল্পের পরও তিনি দীর্ঘ আটাশ বৎসর রাজত্ব করেন, কিন্তু এর মধ্যে অশোকের রাজ্যে কোনো বিদ্রোহ হয়নি, রাজ্যের সামান্য মাত্র অংশও অন্যের হস্তগত হয়নি, সৈন্যেরা আগের মতোই রাজ্যরক্ষার জন্য বর্তমান ছিল। অশোক অহিংসা-নীতিতে বিশ্বাসী হলেও প্রয়োজনমতো অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিতে দ্বিধা করেননি। কাজেই মনে হয় অশোকের পরবর্তী সম্রাটদের দুর্বলতা ও অক্ষমতাই অধঃপতনের প্রধান কারণ। অতিরিক্ত ধর্মভাব ও অহিংসানীতির ফলস্বরূপ মৌর্যরাজ্যের পতন হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ নেই। দাক্ষিণাত্যের সামান্য অংশ বাদে প্রায় সমস্ত বর্তমান ভারতবর্ষ এবং বর্তমান আফগানিস্থানের প্রায় সম্পূর্ণ অশোকেব রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই বৃহৎ রাজ্য রেখেই ২৩২ খৃষ্টপূর্বাব্দে অশোক মারা যান।

অশোক তাঁর রাজ্যকে পাঁচ প্রদেশে ভাগ করে প্রত্যেক প্রদেশে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি নিজেও প্রথম জীবনে তাঁর পিতার রাজত্বকালে যথাক্রমে উত্তরাপথ ও অবন্তীবিভাগের রাজধানী প্রসিদ্ধ শিক্ষা-কেন্দ্র তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনী শহরে থেকে শাসনকর্তারূপে কাজ করেছিলেন। তক্ষশিলা ও উজ্জয়িনীর প্রভাব অশোকের উপর যে যথেষ্ট ছিল তা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। অশোকের সময়েও তাঁর পুত্র কুনাল উত্তরা-পথের শাসনকর্তা ছিলেন।

অশোকের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত। কিন্তু তার মধ্যে কতটা সত্য আছে তা নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্য রাজত্বের অস্তিত্ব ৪৭ বৎসর ছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে সাতজন রাজা রাজত্ব করেন। এঁদের রাজত্বের বিস্তৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না। রাজ্যে বিদ্রোহ, গ্রীকদের আক্রমণ ও অবশেষে ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা এবং তাঁর মগধের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে মৌর্য রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

খৃষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দে পুষ্যমিত্র (১৮৫-১৪৯ খৃষ্টপূর্ব) মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন—এই বংশ শুঙ্গবংশ নামে খ্যাত। পুষ্যমিত্র বীর ছিলেন। যদিও মগধ তাঁর সময়ে পূর্ব গৌরব ফিরে পায়নি, তবুও তিনি সে গৌরব অনেকটা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বিদর্ভরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন

এবং গ্রীকরাজা মিনাণ্ডার বা মিলিন্দও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। অশোকের মৃত্যুর পর ব্যাক্‌ট্রিয়ার স্বাধীন গ্রীক-রাজারা আফগানিস্থান এবং উত্তর-ভারতের কতক অংশ জয় করেন। গ্রীক-রাজ মিলিন্দের রাজধানী ছিল শাকল বা বর্তমান শিয়ালকোট। এই সময়ে কলিঙ্গ ছিল স্বাধীনরাজ্য। কলিঙ্গরাজ খারবেলের সঙ্গেও পুষ্যমিত্রের যুদ্ধ হয়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। পুষ্যমিত্রের রাজ্য পাঞ্জাবে জলন্ধর এবং মধ্য-প্রদেশে বরদা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পাটলিপুত্র, অযোধ্যা, বিদিশা ও ভারহুত তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। বিদর্ভরাজ ও গ্রীকদের পরাজিত করে পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরবর্তী বৌদ্ধ লেখকরা পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ অত্যাচারী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। যদিও তিনি নৈষ্ঠিক হিন্দু ছিলেন তবুও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের কাহিনী সত্য বলে মনে হয় না। শুঙ্গ রাজত্বের প্রাধান্যের সময়ে ভারহুতের বৌদ্ধকীর্তি-গুলির নির্মাণ শুঙ্গদের বৌদ্ধ অত্যাচারের কাহিনী বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রবল যুক্তি। বিখ্যাত পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সময়ে সম্ভবত জীবিত ছিলেন। মধ্য-প্রদেশে গোনারদা নামক স্থানে পতঞ্জলির জন্ম। বৈযাকরনিক, যোগশাস্ত্রকার ও চরকের ভাষ্যকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি কিনা প্রশ্ন উঠেছে। আমার মনে হয় বৈয়াকরণিক ও যোগশাস্ত্রকার পতঞ্জলি একই ব্যক্তি, কিন্তু ইনিই চরকের ভাষ্যকার কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না।

পুষ্যমিত্রের সময়ে ধর্ম, শিল্পকলা ও সাহিত্যের এক নব জাগরণ দেখা দিয়েছিল। এই সময়কার সাঁচি ও ভারহুতের শিল্পকলা ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে ভাগবদধর্ম বেশ প্রভাব বিস্তার করে। পুষ্যমিত্রও মন্ত্রীপরিষদের সাহায্যে রাজকার্য পরিচালনা করতেন। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর পুষ্যমিত্র মারা যান এবং তাঁর পুত্র অগ্নিমিত্র খৃষ্টপূর্ব ১৪৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই অগ্নিমিত্রই কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের নায়ক। শুঙ্গ বংশের দশজন রাজা ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। দুশ্চরিত্র দশম রাজা ব্রাহ্মণমন্ত্রী বসুদেব কর্তৃক নিহত হয়। বসুদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কণ্ববংশ নামে খ্যাত। এই বংশের চারজন রাজা ৪৫ বছর ধরে মগধে রাজত্ব করেন। চতুর্থ রাজা সুশর্মণের রাজত্বকালে খৃষ্টপূর্ব ২৭ অব্দে অন্ধ্ররা মগধ অধিকার করে। অন্ধ্রদের হাতে সুশর্মণের পরাজয় ও

বিনাশের সঙ্গে মগধ রাজ্যের অবসান হয়। এই সময়ে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে অন্ধ্রের শালীবাহনরা এবং কলিঙ্গের চেতরা উল্লেখযোগ্য।

অন্ধ্ররা অতি প্রাচীন জাতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাঁদেব উল্লেখ আছে। অন্ধ্রদেশ মৌর্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোকের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে অন্ধ্ররা মৌর্যপ্রভুত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যে বংশ কণ্ববংশের শেষ রাজাকে হত্যা করে তা শতবাহন বা শালিবাহন বংশ নামে খ্যাত। এরা ব্রাহ্মণ ছিল কিন্তু তেলেগু না কর্ণাটকের ব্রাহ্মণ তা নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে শালিবাহন একজন রাজার নাম, এবং তাঁর নামের সঙ্গে শালিবাহন শক জড়িত। এইজন্য ভারতবর্ষে শালিবাহন নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই বংশের শিমুক সুশর্মণকে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বংশ খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজাদের মধ্যে গৌতমীপুত্র সাতকর্নীই (১০৬-১৩১ খৃষ্টাব্দ) সর্বাধিক খ্যাতি লাভ কবেছেন। তিনি মালব ও কাঠিওয়ারের শকদের পরাজিত করেন। শতবাহনদের প্রভাব এক সময় সমস্ত দাক্ষিণাত্য, মগধ, মালব এমন কি রাজপুতানা গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। শকদের সঙ্গে দীর্ঘকাল সংগ্রামের ফলেই শতবাহনবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে ২২৫ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিলুপ্তি ঘটে। ব্রাহ্মণ শতবাহন রাজারা ব্রাহ্মণদের চেয়ে বৌদ্ধদেরই বেশি দান কবতেন। দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ বৌদ্ধগুহা এঁদের সময়েই তৈরি। অজন্তা ও অমরাবতীর বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র তাঁদের সময়েই প্রথম নির্মিত হয়। সে সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে কোনো রকমের বিবাদ-বিসম্বাদ ছিল না।

কলিঙ্গের চেতরাও অশোকের মৃত্যুর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা খারবেল বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি অন্ধ্ররাজা সাতকর্নীর সমসাময়িক। অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কোনো কোনো মতে তিনি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক। তিনি মথুরা পর্যন্ত জয় করেন; দাক্ষিণাত্যে পাণ্ড-রাজ্য পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল।

অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্যরাজারা যখন দুর্বল হয়ে পড়েন তখন গ্রীকরা উত্তর-ভারতের কতক অংশ জয় করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন একথা আগে উল্লেখ

করেছি। তক্ষশিলা, শিয়ালকোট, পুষ্কলাবতী প্রভৃতি তাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু গ্রীকরা আত্মকলহে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময়ে বক্ষু বা অক্সাস নদীর তীর থেকে আগত শকদের আক্রমণে গ্রীকপ্রভাব বিলুপ্ত হয়। ক্রমশ শকরা তক্ষশিলা, মথুরা, সৌরাষ্ট্র, মালব প্রভৃতি স্থানে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সৌরাষ্ট্রের শক রাজাদের মধ্যে রুদ্রদামাই বিখ্যাত। তিনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেছিলেন। ব্রাহ্মণ গৌতমীপুত্র সাতকর্নীর পুত্র পুলুমায়ী শকরাজা রুদ্রদামার কন্যাকে বিবাহ করেন। তবুও শকদের সঙ্গে শতবাহনদের যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল এবং এই যুদ্ধে রুদ্রদামাই জয়ী হন। কাঠিওয়ারের সুদর্শনহ্রদের বাঁধ ভেঙে গেলে রুদ্রদামা কর্তৃক তা মেরামত বা পুনর্নির্মাণের কথা আগে উল্লেখ করেছি। সৌরাষ্ট্রে শকরা প্রায় ৩০০ বৎসর রাজত্ব করেন।

শকরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করে প্রায় সেই সময়ই (সম্ভবত কিছু পরে) পহ্লব বা পার্থিয়ানরাও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে উত্তর-ভারতের কতক অংশ জয় করে। পার্থিয়ান রাজাদের মধ্যে গণ্ডোফারেসের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পার্থিয়ানদের প্রভাব খুব অল্পদিন স্থায়ী হয়েছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে এরকম প্রবাদ প্রচলিত আছে যে সেণ্ট টমাস গণ্ডোফারেসকে সপরিবারে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী করেছিলেন এবং তাঁর দরবারে থেকে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। আনুমানিক ৮০ খৃষ্টাব্দের আগে পহ্লব প্রভাব বিলুপ্ত হয়। শক ও পহ্লবরা ব্যতীত আর একটি বৈদেশিক জাতিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করে—তারা ইউ-চি জাতির অন্তর্ভুক্ত কুষাণরা। ইউচি-জাতি কর্তৃক নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়েই শকরা ভারতবর্ষের দিকে আগমন করে। ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখার মধ্যে কুষাণ নামক শাখাই সর্বশেষ ভারতবর্ষে আসে। কুষাণ বংশীয় রাজা বিমকদফিস উত্তর-ভারতের কতকাংশ জয় করেন। তিনি শৈব ছিলেন একথা আগে উল্লেখ করেছি। তাঁর পর কনিষ্ক রাজা হন। কনিষ্ক কুষাণ বংশের সর্ব শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর বিশাল রাজ্য মধ্য-এশিয়ায় খোটান, খাসগর, সগদিয়ানা থেকে চম্বল ও যমুনা নদীর সঙ্গম স্থল অর্থাৎ কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও বেনারস পর্যন্ত উত্তর-ভারতের সমস্ত অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সিন্ধু, গুজরাট ও মালব শকরাজ বা ক্ষত্রপের অধীনে ছিল। তখন শতবাহনরাও বেশ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত বসুমিত্রের

সভাপতিত্বে কাশ্মীরের বৌদ্ধদের এক সভা হয়। মহামান্য কবি অশ্বঘোষ কনিষ্কের সভায় ছিলেন।

বৌদ্ধধর্মপ্রচারে কনিষ্ক যথেষ্ট সাহায্য করেন। তিনি অনেক সুন্দর সুন্দর স্তূপ, মঠ প্রভৃতি নির্মাণ করেন। পেশোয়ারে ৪০০ ফুট উঁচু, ত্রয়োদশ-তলা স্তূপ নির্মাণ তাঁর এক কীর্তি। পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার তাঁর রাজধানী ছিল। কনিষ্ক কোন সময়ে রাজত্ব করেছিলেন এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই মতই আমার কাছে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কনিষ্ক কোন সময় কি ভাবে মারা যান সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি অনবরত যুদ্ধে লিপ্ত থাকার দরুন প্রজাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন তাই তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় লেপ চাপা দিয়ে তারা হত্যা করে। অপর মতে তিনি যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা যান। ৭৮ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ কনিষ্কের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে একটি অব্দ প্রচলিত—এই অব্দ শকাব্দ নামে খ্যাত। কনিষ্কের মৃত্যুর পর আরো তিনজন কুষাণবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন। কনিষ্ক ও এই তিনজন অর্থাৎ চার রাজা প্রায় একশো বছর রাজত্ব করেন। তারপরে কুষাণ বংশের পতন হয়। কুষাণদের পতন এবং শতবাহন বংশের ধ্বংসের পর প্রায় একশত বৎসরের ভারত ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

তারপরে গুপ্তরাজারা মগধের গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে বেরারে ভকটকেরা (৩০০-৫০০ খৃষ্টাব্দ) এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তাদের প্রথম রাজা প্রবর সেন ও অষ্টম রাজা হরি সেন বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীগুপ্ত বা গুপ্ত নামে মগধের খুব একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন। তাঁর পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় (৩২০-৪০ খৃষ্টাব্দ) থেকেই গুপ্তবংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩২০ খৃষ্টাব্দ থেকে গুপ্ত সম্বৎ আরম্ভ। তিনি লিচ্ছবী বংশের কুমারীদেবী নামক এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে তাঁর প্রতিপত্তি আরো বৃদ্ধি হয়। খুব সম্ভবত প্রয়াগ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল এবং রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। বিশ বৎসর রাজত্বের পর চন্দ্রগুপ্ত মারা যান এবং তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত রাজা হন।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৪০-৩৭৫ খৃষ্টাব্দ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি একাধারে যোদ্ধা, রাজনীতিবিদ, কবি ও গায়ক ছিলেন। তাঁর মুদ্রায় দেখতে পাওয়া যায় সমুদ্রগুপ্ত

বসে বীণা বাজাচ্ছেন। শুধু গুপ্তবংশের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের নরপতিদের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য অবিসম্বাদিত। সমস্ত ভারতবর্ষে যে-সমস্ত কৌশলী বীর সেনাপতি জন্মগ্রহণ করেছেন সমুদ্রগুপ্ত তাঁদের অন্যতম। তাঁকে ভারতীয় নেপোলিয়ান বলা হয়। তিনি উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে জয় করে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। পরে আক্রমণ করে দাক্ষিণাত্যেরও অনেক রাজাকে তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেন। তিনি দক্ষিণ-ভারতে কাঞ্চীপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। এই দুই-তিন হাজার মাইলব্যাপী বিজয়-অভিযান তাঁর অদ্ভুত কীর্তি। এই বিজয়-কাহিনী তাঁর সভাকবি হরি সেন লিপিবদ্ধ করেছেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নর্মদা, পশ্চিমে চম্বলনদী এবং পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। নেপাল, বাঙলা ও কামরূপের রাজারা তাঁর অধীনতা স্বীকার করতেন। চম্বল নদীর পশ্চিমে যৌধেয়, মদ্র, আভির প্রভৃতি জাতির অধীনস্থ রাজারাও তাঁকে কর দিতে সম্মত হয়েছিল। আফগানিস্থানের কুষাণরা ও গুজরাটের শকরা তাঁর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়। ভারত-মহাসাগরের অনেক দ্বীপ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে, অতএব একথা মনে করা অযৌক্তিক নয় যে তাঁর নৌ-বিভাগও ছিল, যদিও এ বিষয়ে কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। রাজ্য জয়ের পর সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে বহুদিন যাবৎ অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রথা ভারতীয় রাজাদের মধ্যে বড় একটা প্রচলিত ছিল না। সমুদ্রগুপ্ত পুনরায় সেই প্রথা প্রবর্তন করে প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু তাই বলে তিনি ধর্মবিষয়ে মোটেই অনুদার ছিলেন না।

মৃত্যুর আগে পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই (৩৭৫-৪১৩ খৃষ্টাব্দ) উপযুক্ত মনে করে সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে রাজপদে মনোনীত করে যান। এ নির্বাচন যে যথাযথই হয়েছিল চন্দ্রগুপ্ত তা সর্বতোভাবে প্রমাণ করেন। তিনি শুধু পিতার বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করেননি, আরো রাজ্য জয় করে রাজ্যের প্রসারতা সাধন করেন। গুজরাট ও কাঠিওয়ারের শকদের পরাজিত করে এবং তাদের রাজাকে নিহত করে পশ্চিমে শকরাজ্য মগধরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন অর্থাৎ আরব সাগর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী শকারি বিক্রমাদিত্য ৫৮ খৃষ্টাব্দে শকদের পরাজিত করে বিক্রম সম্বত স্থাপন করেন। তাঁরই সভায় নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিত বা

নবরত্ন ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত শকদের পরাজিত করেন এবং নবরত্নের মধ্যে বিখ্যাত কবি কালিদাস তাঁর সভাকবি ছিলেন তা খুবই সম্ভবপর। কিন্তু তাঁর রাজত্বের প্রায় সাড়ে চার শত বৎসরেরও অধিককাল আগেকার বিক্রম-সম্বতের সঙ্গে তাঁর নাম কি করে সংযোজিত হল তার কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। ইনিই প্রচলিত প্রবাদের শকারি বিক্রমাদিত্য কিনা তা এখনো অমীমাংসিত। বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন এবং বিক্রম-সম্বতের কি কারণে উৎপত্তি হয়েছিল ভারত-ইতিহাসের এই দুই জটিল প্রশ্নের সমাধান বর্তমানে দুঃসাধ্য বলেই মনে হয়। উপরে নবরত্নের কথা বলেছি। এই নয়জন পণ্ডিতের নাম—মহাকবি কালিদাস, জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির, প্রাকৃত-বৈয়াকরণিক বররুচি, অভিধান-প্রণেতা অমরসিংহ, চিকিৎসক ধন্বন্তরী, কবি ঘটকর্পর, ক্ষপণক, শঙ্কু ও গল্পলেখক বেতালভট্ট। এঁদের মধ্যে প্রথম পাঁচজনই সমধিক পরিচিত। কিন্তু এই নয় পণ্ডিত যে সমসাময়িক এরূপ বলবার পক্ষে যুক্তি নেই।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পরম ভাগবৎ বা বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি রাজকার্য নির্বাহে কোনো রকম ধর্মান্ধতা প্রদর্শন করেননি। তাঁর বৌদ্ধ-সেনাপতি ও শৈব-মন্ত্রীই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এই সময়ে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্ ভারতবর্ষে আগমন করেন। অসম্পূর্ণ হলেও তাঁর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতবর্ষের বেশ একটা চিত্র পাওয়া যায়। সেকালে জনসাধারণ বেশ সঙ্গতিপন্ন ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, দেশে চোর-ডাকাতের ভয় বড় একটা ছিল না। পাটলিপুত্র শহরে অশোকেব প্রাসাদ তখনো বর্তমান ছিল। ফা-হিয়েন্ তা দেখে অবাক হয়ে যান। তখনো নিকটবর্তী দুইটি মঠে মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের ছ-সাতশো সন্ন্যাসী বাস করতেন এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্র ও জ্ঞান-পিপাসুরা তাঁদের কাছে শিক্ষালাভ করতে আসতেন। তিনি প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার প্রশংসাসূচক বর্ণনা দিয়েছেন। লোকের ভিতরে ধর্মভাব বেশ প্রবল ছিল। বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল, পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে থাকবার ঘর ইত্যাদি ছিল; রাজধানীতে উদারচেতা ও শিক্ষিত অধিবাসীদের অর্থে স্থাপিত একটি উৎকৃষ্ট দাতব্য হাসপাতাল ছিল। সেই হাসপাতালে উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা খুব যত্ন সহকারে রোগীদের চিকিৎসা হত। জগতের অন্য কোনো স্থানে সে সময়ে এরূপ কোনো সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা

সন্দেহ। সিন্ধুনদের তীর থেকে মথুরা পর্যন্ত ফা-হিয়েন্ বৌদ্ধ-মঠগুলিতে হাজার হাজার বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী দেখেছেন—মথুরার নিকটবর্তী মঠসমূহে প্রায় তিন হাজার সন্ন্যাসী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের উদার ধর্মভাবের এটি প্রকৃষ্ট পরিচয়।

মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য যে 'মুদ্রা' বা পাশের ব্যবস্থা ছিল চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে সেরূপ কিছু ছিল না। লোকজন ইচ্ছামতো যাতায়াত করতে পারত। চীনদেশের তুলনায় এদেশে অপরাধীদের দণ্ড অপেক্ষাকৃত মৃদু বা কম কঠোর ছিল। অধিকাংশ অপরাধের জন্যই অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, প্রাণদণ্ড এক রকম ছিল না বললেই চলে। বারবার বিদ্রোহ অথবা লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্য ডানহাত কেটে ফেলার ব্যবস্থা থাকলেও এরকম শাস্তি খুব কমই দেওয়া হত। বিচারঘটিত অত্যাচারও ছিল না। মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বিচারাধীন অপরাধীর স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ ভারতীয় চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে বলেছেন, 'সকল অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটই জানেন ভারতীয় পুলিশদের মনে কয়েদীকে অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করার সংস্কার কিরূপ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ এবং আধুনিক অবস্থায়ও এরূপ অত্যাচার করার অভ্যাস বন্ধ করা কিরকম শক্ত।' গুপ্ত-সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অত্যাচার ছিল না, ফা-হিয়েনের এই মত, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথও তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, এরকম অত্যাচারের সংস্কার ভারতবাসীর মনে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ নয়, রাজ্যের পরিচালকের উপর তা নির্ভর করে।

ফা-হিয়েনের বর্ণনা থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বেশ সুশাসিত ছিল। কর্তৃপক্ষ প্রজাদের কাজে কমই হস্তক্ষেপ করত বলে প্রজারা স্বাধীনভাবেই সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু ফা-হিয়েনের বর্ণনাতে পাওয়া যায়, গয়া তখন একরকম জনমানবশূন্য এবং গয়া থেকে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া ছিল জঙ্গলে আবৃত; শ্রাবস্তি শহরে মোট দুইশত পরিবার বাস করত আর কপিলবস্তু ও কুশীনগর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য ও পতিত অবস্থায় পরিণত হয়েছিল। কপিলবস্তু শহরের ধ্বংসের কারণ আগে উল্লেখ করেছি, কিন্তু অন্যান্য স্থান কখন কি কারণে এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হল তা বলা যায় না। উজ্জয়িনী বিক্রমাদিত্যের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল।

৪১৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র কুমারগুপ্ত (৪১৩-৪৫ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে রাজপুতানার পুষ্যমিত্র-গণতন্ত্রের সঙ্গে মগধের ভীষণ যুদ্ধ হয়। প্রথম কুমারগুপ্ত পরাজিত হন এবং মগধরাজ্য রাহুগ্রস্ত সূর্যের মতো নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। স্কন্দগুপ্তের ভাষায় বলতে গেলে 'বিচলিত-কুললক্ষ্মী' হয়েছিল। অবশেষে রাজপুত্র স্কন্দগুপ্তের বীরত্বে মগধরাজ্য রক্ষা পায়। পুষ্যমিত্র-গণতন্ত্র পরাজিত হয়। কিন্তু সংগ্রাম এত ভীষণ হয় যে, স্কন্দগুপ্তকে যুদ্ধক্ষেত্রে তৃণশয্যায় একরাত্রি কাটাতে হয়েছিল। কাশীপ্রসাদ জয়শোয়ালের মতে কুমারগুপ্ত এই গণতন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধেই নিহত হন। এই যুদ্ধের ফলে গুপ্তরাজাদের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং গুপ্তরাজ্য আর নিজ গৌরব-প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। (লিচ্ছবী-গণতন্ত্রের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। পরে গুপ্তরা অনেক গণতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে। এর পর আবার এক গণতন্ত্রের দ্বারাই গুপ্ত রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়। পরাজয়ের পর পুষ্যমিত্র-গণতন্ত্র বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে যায়, এবং তার সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়।)

কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র না হলেও পুষ্যমিত্র-সংগ্রামে অশেষ বীরত্ব-প্রদর্শনের জন্য স্কন্দগুপ্তই (৪৫৫-৪৬৭ খৃষ্টাব্দ) রাজা মনোনীত হন। স্কন্দগুপ্ত রাজা হয়েই হূনদের সঙ্গে সংগ্রামে ব্যাপৃত হতে বাধ্য হন। মধ্য-এশিয়া থেকে হূন নামক এক শ্বেতজাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। হূনরা নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের জন্য বিশেষ অখ্যাতি অর্জন করেছিল। কাবুল ও সোয়াত-নদীর উপত্যকা এক সময়ে সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল; কিন্তু হূনরা ঐ স্থানকে এমনভাবে বিধ্বস্ত করে যে, তার পূর্বগৌরবের কোনো চিহ্নই আজ সেখানে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের অনেক বৌদ্ধ-বিহারও হূনরা ধ্বংস করেছে। স্কন্দগুপ্তের জীবিতকালে বার বার আক্রমণ সত্ত্বেও হূনরা তাঁর রাজ্য দখল করতে পারেনি। খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি হূনদের গতিরোধ করতে সমর্থ হন। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে রাজকোষে অর্থাভাব হয়, তিনি তাই রাজত্বের শেষদিককার মুদ্রায় সোনার পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ কম করতে বাধ্য হন। স্কন্দগুপ্ত খুব সম্ভবত বেশি বয়সে রাজত্বলাভ করেন তাই মাত্র ১২ বৎসর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়।

স্কন্দগুপ্ত অপুত্রক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর কুমারগুপ্তের অপর পুত্র পুরগুপ্ত

৪৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পুরগুপ্ত, স্কন্দগুপ্তের সহোদর কি বৈমাত্রেয় ভাই, একথা ঠিক বলা যায় না। পুরগুপ্তের পর তাঁর পুত্র নরসিংহ-গুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত রাজা হন। এই তিন রাজা প্রায় ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। তারপর বুদ্ধগুপ্ত (৪৭৬-৫০০ খৃষ্টাব্দ) ২৪ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। বুদ্ধগুপ্তের সময় বাঙলা থেকে মালব পর্যন্ত গুপ্তরাজ্য বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্তরাজ্যে ভাঙন ধরে এবং ক্রমে গুপ্তরা ভারতবর্ষের এক ক্ষমতাশালী বড় রাজা থেকে মগধের এক ক্ষুদ্র রাজারূপে পরিণত হন। হর্ষবর্ধনের সময়েও (৬০৬-৬৪৭ খৃষ্টাব্দ) তাঁদের ক্ষুদ্ররাজ্য বর্তমান ছিল। পুনঃপুনঃ হূন আক্রমণই গুপ্তরাজ্যের পতনের কারণ।

গুপ্তযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক গরিমাময় অধ্যায়। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রভৃতি সব বিষয়েই এ যুগে ভারতবর্ষ অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর আবর্তনজনিত দিবারাত্রিভেদ আবিষ্কারক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, মহাকবি কালিদাস, সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শূদ্রক, অভিধান-প্রণেতা অমরসিংহ, বৌদ্ধপণ্ডিত বসুবন্ধু ও দিঙ্নাগ এই যুগের লোক। 'রাজাচন্দ্রের' দিল্লীস্থ বিখ্যাত লৌহস্তম্ভ এই যুগেই তৈরি হয়েছিল। এই 'রাজাচন্দ্র' কে তা নিশ্চিতরূপে এখনো স্থির হয়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ইনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক রাজপুতানার অন্তর্গত পুষ্করণের রাজা চন্দ্র বর্মা। শিল্পকলার দিক দিয়েও এ যুগে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্ত-যুগকে শ্রেষ্ঠ যুগ বললেও অত্যুক্তি হয়-না।

হূনদের আক্রমণে গুপ্ত রাজ্যের প্রভাব খর্ব হয়ে যায় কিন্তু আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চলের মৌখারীরাজা ঈশান বর্মা তাদের পরাজিত করে অগ্রগতি বন্ধ করেন। পরে ৫৩০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মালবরাজ যশোধর্মা কর্তৃক সম্পূর্ণ-রূপে পরাজিত হয়ে হূননেতা মিহিরকুল পালিয়ে যান এবং ভারতবর্ষ অশেষ অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই যশোধর্মা কে ছিলেন এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। জার্মান ঐতিহাসিক পিপারের মতে তিনি গুপ্তদের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং তাঁর জন্মবৃত্তান্ত রহস্যাবৃত। ইনি পরে প্রায় সমস্ত উত্তর-ভারত ও দক্ষিণ-ভারতের কতক অংশ জয় করেন। কিন্তু যশোধর্মার এই রাজ্য কি হল, তাঁর মৃত্যুর পর কে রাজা হলেন ইত্যাদি কোনো কথাই আমরা জানি না। তাঁর জীবন-নাট্যের প্রথম অঙ্কের মতো শেষ

অন্তও যবনিকার অন্তরালে লুক্কায়িত। তাঁর সম্বন্ধে শুধু এইমাত্র জানি যে তিনি ভারতবর্ষকে হূনদের হাত থেকে রক্ষা করে প্রকাণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পিপার যশোধর্মাকে সপ্তদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ জার্মান সেনাপতি ভালেনস্টাইনের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

হূননেতা মিহিরকুলের কথা উল্লেখ করেছি। মিহিরকুল ও তাঁর পিতা তোরমান এই দুইজনই হূনদের মধ্যে বিখ্যাত। তোরমান পাঞ্জাব জয় করে মালব পর্যন্ত অধিকার করেছিলেন।

হূনরা বিতাড়িত হল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনো শক্তিশালী স্থায়ী রাজ্য গড়ে উঠল না। পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য সৃষ্টি হল। তাব মধ্যে (১) কাঠিওয়ার, (২) থানেশ্বর, (৩) বাঙ্গালা,` (৪) বাদামীর চালুক্য রাজ্য ও (৫) দক্ষিণ-ভারতের পল্লব রাজ্যের উল্লেখ করা যেতে পাবে।

সেনাপতি ভট্টাবক সৌরাষ্ট্র বা কাঠিওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঐ রাজ্যের রাজধানী ছিল বলভী। এই বংশেব নাম মৈত্রকবংশ। মৈত্রকরা খুব সম্ভবত হূনদের অধীনস্থ রাজা ছিলেন, তাদের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা স্বাধীন হয়ে যান। মৈত্রকরা প্রায় তিনশত বৎসর (৫০০-৭৭০ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। মৈত্রকদের রাজত্বকালে ইউয়ান চোয়াং বলভী গিয়েছিলেন। বলভী নালান্দার মতোই একটি বড় শিক্ষাকেন্দ্র এবং একটি ব্যবসারও কেন্দ্র ছিল।

বলভীর সমসাময়িক থানেশ্বরে পুষ্পভূতি কর্তৃক একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্ধন পাঞ্জাব ও মালবের কতক অংশ জয় করেন। প্রভাকরবর্ধনের দুই পুত্র (রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন) ও রাজ্যশ্রী নামে এক কন্যা ছিল। মৌখারীরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। ৬০৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার সময় প্রভাকরবর্ধন মৃত্যুমুখে পতিত হলে রাজ্যবর্ধন রাজা হন।

ঠিক এই সময়ে বাঙলা দেশেও একটি রাজ্য 'গড়ে ওঠে। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা রাজ্য বিস্তার আরম্ভ করে, কিন্তু মৌখারীদের কাছে পরাজিত হয়ে প্রায় ৫০ বৎসরের জন্য অগ্রগতি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙলায় শশাঙ্ক (৬০০-৬১৯ খৃষ্টাব্দ) নামে একজন প্রতাপশালী ব্যক্তি রাজা হন। যশোধর্মার মতো শশাঙ্কের বীরত্বের কথাই শুধু ঐতিহাসিকেরা সঠিক জানে, তাঁর প্রথম ও শেষ জীবন এক রকম যবনিকার অন্তরালে।

শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। নিখিলনাথ রায়ের মতে কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম রাঙ্গামাটি—মুর্শিদাবাদ থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। মনোমোহন চক্রবর্তীর মতে কর্ণসুবর্ণের বর্তমান নাম লক্ষ্মণাবতী। শশাঙ্ক যে দক্ষিণে গঞ্জাম ও পশ্চিমে কনৌজ পর্যন্ত বাঙলার প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

মৌখারীদের সঙ্গে বাঙলার শত্রুতা প্রায় ৫০ বৎসর আগে শুরু হয়। থানেশ্বর-রাজের সঙ্গে মৌখারীরাজ গ্রহবর্মন আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় শশাঙ্ক মালবের গুপ্তরাজাদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। থানেশ্বররাজ মালবের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, কাজেই মালবরাজের পক্ষে এই মিত্রতার প্রয়োজনও ছিল। অতএব তখন উত্তর-ভারতে একদিকে শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত আর অপরদিকে থানেশ্বররাজ রাজ্যবর্ধন ও মৌখারীরাজ গ্রহবর্মন। রাজ্য-বর্ধনের সিংহাসন আরোহণের কিছুদিন পর হঠাৎ আক্রমণ করে মালবরাজ দেবগুপ্ত গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করে মৌখারী রাজধানী কান্যকুব্জ অধিকার করেন ও রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেন। এই সংবাদ পেয়েই কালবিলম্ব না করে দশহাজার অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্যবর্ধন যুদ্ধযাত্রা করেন। অনায়াসেই মালবরাজ পরাজিত হন। কিন্তু জয়ের আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। অল্পকাল পরেই শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধনের নিহত হওয়ার সংবাদ থানেশ্বরে পৌছয়। শশাঙ্ক যে রাজ্যবর্ধনকে বিশ্বাসঘাতকতা করে হত্যা করেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি বাণভট্ট ও ইউয়ান চোয়াং তা লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। যদিও দুজনেই শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে একমত, তবুও কি অবস্থায় কি ভাবে এই কার্য অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে দুজনের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

হর্ষবর্ধনের তাম্রশাসনে পাওয়া যায় যে রাজ্যবর্ধন 'সত্যানুরোধে শত্রুগৃহে গমন করে প্রাণত্যাগ করেছিলেন।' কবি বাণভট্ট শশাঙ্কের শত্রুপক্ষীয় রাজদরবার থেকে যে সংবাদ পান তার উপর ভিত্তি করেই এই বিবরণ লিখেছেন, অতএব তা দোষদুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ইউয়ান চোয়াংও ঐ রাজ-দরবার থেকে বা শশাঙ্কবিদ্বেষী ধর্মযাজকদের কাছে শুনেই একথা লিখেছেন। এছাড়া 'চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। কাজেই তিনি শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ যুক্তিতর্ক না করে বা প্রমাণ না নিয়ে অতি সহজেই বিশ্বাস করেছেন, এটা খুবই স্বাভাবিক। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মতে 'মালবরাজের পরাজয়ের পর শশাঙ্ক বোধহয় তাঁহাকে (রাজ্যবর্ধনকে) বহু সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনুমান হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজ্যবর্ধন অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন।' রাজ্যশ্রী বোধহয় শশাঙ্কের আদেশানুসারে কারামুক্ত হন। স্বামী ও ভ্রাতার মৃত্যুতে তিনি নিতান্ত কাতর হন এবং মুক্তির পর বিন্ধ্যপর্বতের দিকে চলে যান; এবং তিনি যখন ভগ্নহৃদয়ে সঙ্গীদের সমভিব্যাবহারে আগুনে প্রবেশ করতে উদ্যত ঠিক সেই সময়ে হর্ষবর্ধন তাঁর উদ্ধার সাধন করতে সমর্থ হন।

রাজ্যবধন নিহত হলে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন মন্ত্রীদের নির্দেশ মতো ৬০৬ খৃষ্টাব্দে থানেশ্বরের রাজা হন—যদিও তাঁর অভিষেক ৬১২ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই সময়ে কামরূপরাজ ভাস্কর-বর্মা শশাঙ্কের ভয়ে ভীত হয়ে বহুমূল্য উপঢৌকন পাঠিয়ে হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। হর্ষ ও ভাস্করবর্মার সম্মিলিত শক্তি অবশেষে শশাঙ্ককে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। অবশ্য এসব যুদ্ধের বিবরণ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু শশাঙ্ক যে মাথা নত করেননি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। হর্ষবর্ধন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করে উত্তর-ভারতে এক ক্ষমতাশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন: 'তাঁর মৃত্যুর সময় পাঞ্জাব ও রাজপুতানা বাদে সৌরাষ্ট্র সমেত সমস্ত উত্তর ভারতই তাঁর আধিপত্য স্বীকার করত' (রমেশ মজুমদার)। দাক্ষিণাত্যেও হর্ষবর্ধন অভিযান করেছিলেন কিন্তু চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক পরাজিত হওয়াতে নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করতে পারেননি। কামরূপরাজ খুব সম্ভবত তাঁর অধীন রাজা ছিলেন। হর্ষবর্ধন থানেশ্বর থেকে কান্যকুব্জে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে হর্ষবর্ধন যে খ্যাতি লাভ করেন তার প্রধান কারণ যুদ্ধনৈপুণ্য বা বীরত্ব নয়। জ্ঞানী, গুণী, দানশীল ও মহানুভব ব্যক্তি হিসাবেই তাঁর সমধিক খ্যাতি। তিনি নিজে একজন কবি ছিলেন। তাঁর রত্নাবলী, নাগানন্দ ও প্রিয়দর্শিকা নামক তিনখানি সংস্কৃত নাটক খ্যাতি লাভ করেছে। তাঁর সভায় অনেক পণ্ডিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে হর্ষচরিত ও কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্টই বিখ্যাত। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম স্থলে হর্ষ এক মেলা বসাতেন। অভিষেকের ৩০ বৎসর পরে ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগে তাঁর ষষ্ঠবারের মেলায় বর্ণনা ইউয়ান চোয়াং দিয়েছেন। চতুর্থ দিনে

দশহাজার বৌদ্ধভিক্ষুব প্রত্যেককে একশত স্বর্ণখণ্ড, একটি মুক্তা, একখানা কাপড়, মনোরম খাদ্য ও পানীয়, সুন্দব ফুল ও গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি দান করেন। তারপরে কুড়ি দিন ধরে অসংখ্য ব্রাহ্মণকে যথেষ্ট দান করেন এবং তারপর দশ দিন ধরে দূরদেশ থেকে আগত ভিক্ষার্থীদের দান করেন। দান করতে করতে হর্ষ রাজকোষে পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিঃশেষ কবে ফেললেন, এমন কি নিজের পবিহিত কাপডখানা পর্যন্ত দান করে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখণ্ড পুবানো বস্ত্র নিয়ে পরিধান কবলেন। ভগ্নী বাজ্যশ্রী বৌদ্ধধর্মানুবক্ত এবং সমস্ত কাজে হর্ষবর্ধনের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন।

এই মেলার অব্যবহিত পূর্বে হর্ষ কান্যকুব্জে এক ধর্ম-মহাসভা আহ্বান কবেন। সেই সভায় চাব হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং তিন হাজার নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ও জৈন সাধু উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় হর্ষ নিজেব সমান উঁচু এক স্বর্ণনির্মিত বৌদ্ধমূর্তি স্থাপন করেছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে হর্ষ তিন ফুট উঁচু আর একটি বৌদ্ধমূর্তিসহ শোভাযাত্রা কবে মন্দিবে যেতেন। যাবার সময়ে পথের দুধারে সোনা, রূপা, মুক্তা ইত্যাদি ছডানো হত। মন্দিরে পৌছবার পব প্রথমে বুদ্ধমূর্তির পূজা হত এবং পরে সকলে বিরাট ভোজে বসত। তারপরে চলত সমাগত পণ্ডিতদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্বালোচনা। এইভাবে একমাস কেটে যাবার পর সভাগৃহে আগুন লেগে যায়, সেই সময় হর্ষ এক স্তূপের উপর দাঁড়িযে সব দেখছিলেন। গোলমালের মধ্যে ছুরিকা হাতে এক ধর্মান্ধ হর্ষকে হত্যা করাব জন্য এগিয়ে যায়। তাকে ধরে ফেলাতে হর্ষের জীবন রক্ষা পায়। ব্রাহ্মণদের প্ররোচনাতেই সে এ কাজ করেছিল এই স্বীকারোক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট প্রধান অপরাধীদেব প্রাণদণ্ড ও নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়, আবার অনেককে ক্ষমাও কবা হয়। রাজাকে হত্যা করার জন্য ব্রাহ্মণরা ষড়যন্ত্র করে সভাগৃহে আগুন লাগায়, কারণ আগুন লাগলে যে হট্টগোল সৃষ্টি হবে তার-মধ্যে রাজাকে হত্যা করা সহজ হবে। হর্ষ বৌদ্ধধর্মের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন বলেই ব্রাহ্মণদের এ ষড়যন্ত্র। এ সব স্বীকারোক্তির মূলে কতটা সত্য আছে তা কে বলতে পারে। হর্ষ প্রথম জীবনে খুব সম্ভবত শৈব ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্মানুরাগী হন, এই জন্য কোনো ধর্মান্ধেব দুর্মতি হওয়া অসম্ভব নয়।

ইউয়ান চোয়াং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং ভারতবর্ষের অনেক

স্থান পরিভ্রমণ করেন। তাঁর বর্ণনা থেকে তৎকালীন ভারতের একটা চিত্র পাওয়া যায়। সে চিত্র বিশেষ মহিমাময়। অশোকের মতো হর্ষবর্ধনও তাঁর রাজ্যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পর্যটকদের সুবিধার জন্য রাস্তার ধারে বাসগৃহ নির্মাণ, কূপখনন ইত্যাদি করেছিলেন। কর আদায় বিষয়েও কঠোর ব্যবস্থা ছিল না। উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠমাংশ রাজকর দিতে হত। ধর্মবিষয়ে হর্ষবর্ধনের উদার মতের কথা আগেই বলেছি। জনসাধারণ বিভিন্ন মতাবলম্বী হয়েও পরস্পর বেশ মিত্রভাবে বাস করত। ইউয়ান চোয়াং-এর মতে ভারতবাসীরা— 'সত্যবাদী, সাধু, সরল, ন্যায়বান ও ধার্মিক ছিলেন।' সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে হ্যাভেল লিখেছেন: 'জগতের কোনো সভ্যতাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে একথা বলা যায় না, কিন্তু এটা সত্যি যে বৈদগ্ধ্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে সপ্তম শতাব্দীর ভারতীয় সভ্যতা এতটা উচ্চতা লাভ করেছিল, যাকে অতীত বা বর্তমান কোনো সভ্যতাই অতিক্রম করতে পারেনি।'

চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করে ৬৪৬ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মারা যান এবং পুনরায় উত্তর ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যদের নাম করেছি। প্রায় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে পুলকেশী নামে চালুক্যবংশীয় এক বীর বাদামীকে রাজধানী করে ঐ অঞ্চলে এক ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র কীর্তিবর্মা ও মঙ্গলেশের সময়ে সিন্ধু, কাঠিওয়ার ও উত্তর গুজরাট ব্যতীত বর্তমান বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সমস্ত অংশ চালুক্যরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কীর্তিবর্মার পুত্র দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। এই দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে যুদ্ধেই হর্ষ পরাজিত হন। তিনি বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণস্থ ভারতের সমস্ত ভূ-ভাগ জয় করে নিজ রাজ্য-ভুক্ত করেন, এমন কি হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। পুলকেশীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের বাইরেও বিস্তৃত ছিল। কথিত আছে যে পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর দরবার থেকে তাঁর কাছে দূত আসত এবং তিনিও পারস্যে দূত পাঠাতেন। পুলকেশীর রাজ্যও ইউয়ান চোয়াং ভ্রমণ করেন। তিনি তাঁর শৌর্যবীর্য এবং তাঁর প্রজাবৃন্দের বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা—যে পল্লবদের পরাজিত করে তিনি দাক্ষিণাত্যে প্রতাপশালী হয়ে ওঠেন, সেই পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা (৬২৫-৬৪৫ খৃষ্টাব্দ) ৬৪২ খৃষ্টাব্দে পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করে চালুক্য

রাজধানী বাদামী লুণ্ঠন করেন। পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিত্য তেরো বৎসর পরে পল্লবদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে পুনর্বায় চালুক্য গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টম শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যন্ত চালুক্যরা বেশ ক্ষমতাপন্ন ছিল। ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত করে রাষ্ট্রকূটরা দক্ষিণাপথে প্রধান হয়ে ওঠে। মুসলমানদের পরাজয় চালুক্যবংশের অন্যতম কীর্তি। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরা সিন্ধুদেশ জয় করে। পরে যখন তারা চালুক্যরাজ্যের উত্তর সীমানায় প্রবেশ করে তখন চালুক্যরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে ফিরে যেতে বাধ্য করে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবরা ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। পল্লবরা পার্থিয়ান, পূর্বে এরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এই মতবাদের মূলে কোনো সত্য নেই। (ভাবরাজু কৃষ্ণরাওয়ের মতে পল্লব একটি বংশের নাম, কোনো জাতির নাম নয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ভরদ্বাজগোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ।) প্রথম তাঁদের রাজত্ব বেলারী ও গুন্টুর জিলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু চের, চোল, পাণ্ড্যরাজ্য ও সিংহল জয় করেন, ফলে সমস্ত দক্ষিণ-ভারত তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। চালুক্যদের উত্থানই পল্লবদের পতনের কারণ। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে চোলদের হাতে এই রাজবংশের বিলোপ সাধিত হয়। পল্লবরা স্থাপত্য শিল্পের খুব অনুরাগী ছিলেন। বিখ্যাত কবি ভারবী ও দণ্ডী পল্লব রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন।

হর্ষের মৃত্যুর পর অনেকদিন পর্যন্ত উত্তর-ভারতে কোনো খ্যাতনামা বীর বিস্তীর্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোবর্মা নামে এক বীর যোদ্ধা কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করেন। শশাঙ্কের মতো যশোবর্মারও কোনো পূর্ব পরিচয় জানা নেই। তিনি মগধ ও বাঙলার রাজাকে পরাজিত করেন, রাজপুতানা এবং উত্তর ভারতের অন্যান্য স্থানও নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। 'যশোবর্মাদেব কর্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত একই ব্যক্তি। এই সময় বঙ্গদেশ কোন রাজার অধীনে ছিল তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। যশোবর্মার বঙ্গবিজয় তাঁর সভা কবি বাক্‌পতিরাজ 'গাউড়বহো' (গৌড়বধ) নামক অতি মনোরম প্রাকৃত কাব্যে বর্ণনা করেছেন। যদিও বাঙালীরা খুব

বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তবুও বিজয়লাভের সৌভাগ্য তাঁদের হয়নি— যশোবর্মাই জয়ী হন। যশোবর্মা ৭৩১ খৃষ্টাব্দে চীনসম্রাটের কাছে দূত প্রেরণ করেন। তিনি যেমন প্রতিপত্তিশালী রাজা ছিলেন তেমনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। বিখ্যাত কবি ভবভূতি তাঁর সভায় ছিলেন। যশোবর্মা ৭৪০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

৭২৪ খৃষ্টাব্দে ললিতাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যশোবর্মার মৃত্যুর পর তিনি থানেশ্বর রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি মালব ও গুরজাট জয় করেন এবং সিন্ধুদেশের আরবদেরও পরাজিত করেন। উত্তরে তিব্বতীয়দের এবং কাম্বোজ প্রভৃতি পার্বত্য জাতিসমূহকেও পবাজিত করেন। ফলে কাশ্মীরের রাজ্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে বাঙালী রাজাকে হত্যা করা চিরকাল তাঁর অপকীর্তি বলে ঘোষিত হবে। কাশ্মীরের সুবিখ্যাত মার্তণ্ড মন্দির ললিতাদিত্যের কীর্তি। ৩৬ বৎসর রাজত্বের পর ৭৬০ খৃষ্টাব্দে ললিতাদিত্যেব মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কাশ্মীরের দুর্বল রাজারা বিস্তীর্ণ রাজ্য রক্ষা করতে সমর্থ হননি। এই সময়ে ভারতবর্ষে (১) বাঙলার পাল (২) রাষ্ট্রকূট ও (৩) গুর্জর প্রতীহার এই তিনটি রাজশক্তি ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং একাধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করে। এই সব রাজাদের সম্বন্ধে বলবার আগে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।

আরবের মুসলমানবা প্রথম ধর্মপ্রচারের জন্যই অপর দেশ জয় করতে আরম্ভ করে, কিন্তু পরে তাদের মধ্যে রাজ্যলিপ্সাও দেখা দেয়। হজরৎ মহম্মদের মৃত্যুর ছয় বৎসরের মধ্যে তারা সিরিয়া ও মিশর জয় করে। অল্পদিন মধ্যে আফ্রিকা, স্পেন ও পারস্য তাদের হস্তগত হয়। একশত বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ফরাসীদেশের অন্তর্গত লোয়ার নামক স্থান পর্যন্ত এবং এশিয়ার কাবুল ও বক্ষুনদীর তীর পর্যন্ত খলিফার রাজ্য বিস্তৃত হয়। ভারতবর্ষের প্রচুর ধনরত্ন আরবদের প্রলুব্ধ করে, কিন্তু ৭১২ খৃষ্টাব্দের আগে তারা এ বিষয়ে কিছুই করতে পারেনি। ঐ সময়ে সিন্ধুদেশের রাজা দাহিরের সঙ্গে জলদস্যু কর্তৃক একখানি আরবীয় বাণিজ্য জাহাজ লুঠের ব্যাপার নিয়ে গোলযোগ আরম্ভ হয়। আরবের খলিফা দাহিরকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেন। জলদস্যুদের উপর তাঁর কোনো অধিকার নেই বলে দাহির এই দাবি পূরণ করতে অস্বীকার

করেন। ফলে যুদ্ধ বেধে যায়। দাহির দুবার আরব আক্রমণকারীদের পরাজিত করে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। পরে মহম্মদ ইবন কাসিমের নেতৃত্বে এক সৈন্যদল সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। এবারও দাহির প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ না করে সামান্য স্থানও আরবদের দখল করতে দেননি। অবশেষে রাজ-ধানীর সামনে অশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে নিহত হন। দাহিরের অপদার্থ পুত্র প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু তাঁর স্ত্রী অবশিষ্ট সৈন্যদের সমবেত করে প্রাণপণে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করতে থাকেন। যতদিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয়নি ততদিন তিনি রাজধানী রক্ষা করেছিলেন। পরাজয় যখন নিতান্ত আসন্ন তখন মহিলারা সুন্দর পোশাকে সজ্জিত হয়ে স্বামী ও পরিজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শিশুসন্তানসহ হাসিমুখে জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। পুরুষরা নীরবে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য দেখলেন। যখন মহিলাদের সব শেষ হয়ে গেল তখন তাঁরা রাজধানীর দরজা উন্মুক্ত করে তরবারী হাতে আরব সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে করতে প্রত্যেকে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

জগতের অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আছে বলে জানি না। এইভাবে সিন্ধুদেশে আরব রাজত্বের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সিন্ধুদেশ থেকে বহু টাকা বাগদাদের খলিফার ধনাগারে কর স্বরূপ যেত। আরবরা সিন্ধুদেশে অমুসলমানদের উপর বিশেষ ট্যাক্স ধার্য করে—মুসলমান হলেই তাদের সেই ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হত। এভাবে করভারে প্রপীড়িত হয়ে অনেক দরিদ্র হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সিন্ধুদেশ থেকে আরবরা তাদের বিজয় অভিযানে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য কর্তৃক তাদের পরাজয়ের কথা আগে বলেছি। গুর্জর প্রতিহাররাজ প্রথম নাগভট্টও তাদের পরাজিত করেছিলেন। চালুক্যদের কাছেও আরবরা পরাজিত হয়। তারপরে গুর্জরেশ্বরের ভয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রকূটরাজের সঙ্গে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় সেদিকেও আরবদের অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই সব কারণে ভারতবর্ষে আরবদের রাজত্ব সিন্ধুদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

আরবরা সিন্ধুবিজয়ের ফলে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ পায়। সে সময়কার ভারতীয় সভ্যতা—রাজনীতি, অর্থনীতি বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি 'সব দিক দিয়েই আরবীয় সভ্যতার চেয়ে অনেক

উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল' (হ্যাভেল), তাই সিন্ধুবিজয় আরব জাতির পক্ষে অশেষ কল্যাণকরই হয়েছিল। এমন কি হ্যাভেলের মতে 'যখন মুসলমান আক্রমণকারীরা ভারতবর্ষে নিজেদের স্থায়ী বাসস্থান করে এবং বন্য আরবীয় বৃক্ষ শাখা ভারতীয় আর্য সংস্কারের সঙ্গে কলমবদ্ধ হয় তখনই ইসলাম অন্তত কিছুদিনের জন্য জগতে সভ্যতার শিক্ষক শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।' 'রসায়ন, চিকিৎসা ও ভেষজ, অঙ্ক ও জ্যোতিষ শাস্ত্রেব জ্ঞান আরবরা ইউরোপে বিকীর্ণ করেছিল, কিন্তু এই জ্ঞানের প্রায় সমস্তটাই ভারতবর্ষ থেকে প্রাপ্ত। প্রতিভার দিক দিয়ে তাদের আকস্মিক অভ্যুত্থান এবং জ্ঞানেব প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা কদাচিৎ ইসলামের প্রভাবের উপর আরোপ করা যেতে পারে— যে শিক্ষা একমাত্র কোরাণকেই বিশ্বাসীর (মুসলমানের) আধ্যাত্মিক ও মানসিক পুষ্টিসাধনের জন্য যে জ্ঞানের দরকার তার ভাণ্ডার বলে গ্রহণ করেছিল। অন্ধকার যুগে পশ্চিম এশিয়ার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তাদের মধ্যে পণ্ডিত-জনোচিত আবেগ সংক্রামিত হয়নি। আরবরা যে যে বিজ্ঞানে পরবর্তীকালে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হয়েছিল, উত্তর পশ্চিম ভারতের বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সেই সমস্ত বিজ্ঞানে সমস্ত এশিয়ায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পাণ্ডিত্যের সকল সংস্কার ও সূক্ষ্ম বিচারসম্পন্ন বুদ্ধিবৃত্তির আবহাওয়া ছিল, যাতে ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি উদ্‌বুদ্ধ করে। আরব-বিজয়ের প্রথম যুগে এবং যখন ইসলাম তার নিজস্ব কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের গর্ব করতে পারত না তখন পারস্য ও আরবের উচ্চবংশীয় যুবকরা ভারতবর্ষে এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়েই জ্ঞানান্বেষণে যেতেন' (হ্যাভেল)।

পালরাজবংশ:—আগেই বলেছি শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর-বর্মা শশাঙ্ককে পরাজিত করেন। ভাস্করবর্মা অন্তত সাময়িকভাবেও কর্ণসুবর্ণ অধিকার করেছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলায় কোনো শক্তিশালী রাজা ছিলেন না। তদুপরি কান্যকুব্জের যশোধর্মা, কাশ্মীরের ললিতাদিত্য, কামরূপের হর্ষদেব, গুর্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক ক্রমাগত আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাঙলাদেশ বিশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বাঙলা দেশে তখন 'মাৎস্যন্যায়' প্রচলিত ছিল। বাঙলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীরা দেড়শত বৎসরেরও অধিককালের বৈদেশিক আক্রমণ ও উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করেন যে সমস্ত বাঙলা এক রাজার অধীনে এনে তাঁকে

সর্বতোভাবে সাহায্য করাতেই বাঙলার কল্যাণ, নতুবা বাঙালী জাতিকে চিরতরে দুঃখের বোঝা বইতে হবে। তাই বাঙলার ভূস্বামীরা সমবেত হয়ে গোপাল নামক এক ধার্মিক ও বীরপুরুষকে রাজপদে বরণ করেন। এই কার্য বাঙালী জাতির পক্ষে সত্যই গৌরবময়। কিন্তু এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না।

গোপালদেব থেকে যে বংশ বাঙলার রাজা হয় তা পালবংশ নামে খ্যাত। পালরাজাদের পূর্ব পরিচয় নির্ণীত হয়নি। গোপালদেবের পিতা ও পিতামহের নাম যথাক্রমে বপ্যট ও দয়িতবিষ্ণু। গোপালদেবের রাজত্বকালের কোনো ঘটনাই আজ পর্যন্ত আমরা জানি না। এবং ইনি কোন সনে বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন সে বিষয়েও মতভেদ আছে। খুব সম্ভবত ৭৫০-৭৭০ খৃষ্টাব্দ গোপালদেবের রাজত্বকাল। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল ও পৌত্র দেবপাল এই বংশের ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। 'কাইজার প্রথম ও দ্বিতীয় ভিলহেলমের রাজত্বকালে সমবেত জার্মান জাতির মধ্য-ইউরোপে প্রভুত্বের মতো ধর্মপাল ও দেবপালের অধীনে বাঙালী উত্তর-ভারতে প্রভুত্ব লাভ করে' (পিপার)। 'খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে গৌড়েশ্বর ধর্মপালদেবই উত্তর ভারতের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)। ধর্মপাল খুব সম্ভবত ৭৭০-৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

গোপালদেবের সময় বঙ্গ ও মগধ পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং মনে হয় তাঁর সুশাসনে দেশের অরাজকতা দূর হয়ে বাঙলা অনেক পরিমাণে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই সিংহাসনে আরোহণ করেই ধর্মপাল কান্যকুব্জ আক্রমণ করে তা অধিকার করেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসনচ্যুত করে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করেন। ধর্মপাল কর্তৃক এই রাজ-পরিবর্তন ভোজ, মৎস্য (বর্তমান রাজপুতানার অংশ), মদ্র, কুরু, যদু (পাঞ্জাব), যবন, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি জনপদের রাজারা স্বীকার করলেন। চক্রায়ুধের অভিষেকের সময়ে সাধুবাদ করাতে মনে হয় ঐ সমস্ত নরপতি ধর্মপালের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন। ঐ সমস্ত নরপতির মধ্যে অনেকে গুর্জর জাতীয় ছিলেন, তাই গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন।

প্রথমে চক্রায়ুধ পরে ধর্মপাল উভয়েই নাগভট্টের কাছে পরাজিত হন। ধর্মপাল নাগভট্টের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম হয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে গুর্জরদের মোটেই মৈত্রীভাব ছিল না, তাই গোবিন্দ ধর্মপালের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে নাগভট্টকে সম্পূর্ণরূপে পবাজিত করেন। নাগভট্ট পরাজিত হয়ে মরুভূমিতে চলে যান। অপরদিকে নিজ রাজ্যে গোলমাল আরম্ভ হওয়ায় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পর ধর্মপাল আজীবন উত্তর-ভারতেব রাষ্ট্রনায়কের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করার পর ধর্মপালেব মৃত্যু হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের আগেই মৃত্যু হওয়াতে দ্বিতীয় পুত্র দেবপাল আনুমানিক ৮১০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দেবপাল ৮১০-৮৫০ খৃষ্টাব্দে বাঙলার রাজ্য আরো বিস্তৃত করেন। তাঁর সেনাপতি লাউসেন উৎকল ও কামরূপ জয় করেন। তিনি দ্বিতীয় নাগভট্টের পুত্র রামভদ্র এবং হূনদের পরাজিত করেছিলেন। তাঁর সভাকবিরা লিখেছেন, তাঁর রাজত্ব হিমালয থেকে বিন্ধ্য এবং বঙ্গোপসাগর থেকে আরবসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেবপাল প্রায় ৪০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর খ্যাতি ভারতমহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ পযন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সুবর্ণ দ্বীপের অধিপতি রাজা বালপুত্রদেব নালান্দায় একটি মঠ তৈরি করে দেন এবং তাঁর অনুরোধে ঐ মঠের ব্যয নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। যদিও পালবংশ চারশো বছরেরও বেশি বাঙলায় রাজত্ব করেছিল তবুও দেবপালের মৃত্যুর সঙ্গেই পালবংশের গৌরবময় যুগের অবসান হয়। দেবপালের পর পাল রাজ্যের ভার দুর্বল রাজার হাতে পড়ে। গুর্জররাজ রামভদ্রের পুত্র রাজা ভোজ পালদের পরাজিত করেন, এবং কাশ্মীর, সিন্ধু, মগধ ও বাঙলা বাদে সমস্ত ভারত ভোজের অধীন হয়। ফলে গুর্জর-প্রতীহার বংশই উত্তর-ভারতের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠে। সেই সময় রাষ্ট্রকূটরা চালুক্যদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকায় পালদের কোনো সাহায্য করতে পারেনি। দশম শতাব্দীতে পালরাজ্যের কতকাংশ কাম্বোজ নামক পার্বত্য জাতি জয় করে। কিন্তু পালবংশের নবম রাজা প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮ খৃষ্টাব্দ) তাদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। এই মহীপালের নাম খুবই বিখ্যাত। 'তাঁর সম্মানসূচক গান কিছুদিন আগেও বাঙলার সর্বত্র গীত

হত, এখনও উড়িষ্যার সুদূরপ্রান্তে ও কুচবিহারে শুনতে পাওয়া যায়' (ভিন্সেন্ট স্মিথ)। দিনাজপুর অঞ্চলে প্রকাণ্ড মহীপাল দিঘি এই রাজার কীর্তি। কিন্তু মহীপাল নামে এই বংশেরই আর এক রাজা অর্থাৎ দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-১০৭৫ খৃষ্টাব্দ) একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করে প্রজাদের উপর খুব অত্যাচার করেন। ফলে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়। দিব্য বা দিব্বোক নামে কৈবর্ত নেতা মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল তৎকালীন কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করে পুনরায় রাজ্য অধিকার করেন। কামরূপ রামপালের রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনবংশের অভ্যুত্থান ও মুসলমান আক্রমণের ফলে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশের অস্তিত্ব লোপ হয়।

পালবংশ শুধু দীর্ঘ রাজত্বের জন্য নয়, নানা কারণেই ভারত-ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে। (এই বংশের প্রথম রাজা গোপাল ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বলে কথিত। ওদন্তপুরী কোথায় ছিল তা এখনো নির্ণীত হয়নি)। বিখ্যাত বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধর্মপালদেবের কীর্তি। বিক্রমশীলা খুব সম্ভবত ভাগলপুর জিলার পাথরঘাটা নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানে ছটি কলেজ ও ১০৭টি মন্দির ছিল বলে উল্লেখ আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান আক্রমণকারী কর্তৃক ধ্বংস হয়।

পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মপ্রচারের এবং বৌদ্ধবিহারের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। প্রথম মহীপালের রাজত্বকালে মগধের ধর্মপাল এবং একাদশ শতাব্দীতে নয়পালের রাজত্বকালে বিখ্যাত বাঙালী ভিক্ষু অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব পুনরুজ্জীবিত করতে তিব্বতে গিয়েছিলেন। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুদ্ধগয়া প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহার পাল রাজাদের অশেষ বদান্যতা লাভ করেছিল। শিল্পকলার দিক দিয়েও পাল রাজত্বের শিল্পকলা বেশ উল্লেখযোগ্য। শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বীতপাল (৮ম-৯ম শতাব্দী) সে যুগে চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পী হিসাবে বেশ খ্যাতি লাভ করেন। পালযুগের শিল্পের নিদর্শন যা এখন পাওয়া যায় তা কম গৌরবময় নয়। দিনাজপুর অঞ্চলের প্রকাণ্ড দিঘিগুলি এখনও পাল রাজাদের প্রজাহিতকর কার্যের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্তমান।

রাষ্ট্রকূটরাজবংশ :—রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের মতে রাষ্ট্রকূটরা রট্ট উপাধিধারী ক্ষত্রিয় বংশজাত। রট্টরা মহারাষ্ট্রের প্রাচীন অধিবাসী, সম্রাট অশোকের সময়ও তাঁরা সে প্রদেশে ছিলেন। এঁদের নাম থেকে মহারাষ্ট্রের নামকরণ হয়েছে। রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাজিত ও বাদামী অধিকার করে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রনায়ক হয়ে ওঠেন।
এই বংশ দন্তিদুর্গের চারপুরুষ আগে থেকেই রাজত্ব শুরু করেছিল। অপুত্রক অবস্থায় দন্তিদুর্গের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য কৃষ্ণরাজ (৭৫৮–৭৭২ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। তিনি সমস্ত চালুক্য রাজ্যকে তাঁর অধীনে আনেন। তাঁর রাজত্বের প্রধান কীর্তি এলোরার কৈলাসনাথের মন্দির। এই মন্দির জগতের একটি আশ্চর্য জিনিস এবং যে-কোনো জাতির গৌরবের বস্তু। এই মন্দিরের জন্যই কৃষ্ণরাজ ভারত-ইতিহাসে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। কৃষ্ণরাজের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুশ্চরিত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ অল্পকাল রাজা ছিল, তাকে সিংহাসনচ্যুত করে কৃষ্ণরাজের অপর পুত্র ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৪ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। ধ্রুব বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি গুর্জরেশ্বর বংশরাজকে পরাজিত করে বংশরাজ কর্তৃক গৌড়রাজ থেকে নীত দুইটি শ্বেতছত্র নিয়ে যান। ধ্রুবের মৃত্যুর পর তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৪ খৃষ্টাব্দ) রাষ্ট্রকূট রাজা হন। গোবিন্দ যে ধর্মপালকে সাহায্য করেছিলেন ও গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজয় করেছিলেন একথা আগে উল্লেখ করেছি। অতএব ধর্মপাল, তৃতীয় গোবিন্দ ও দ্বিতীয় নাগভট্ট সমসাময়িক। নাগভট্টের পরাজয়ের পর গোবিন্দের রাজ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লব সৃষ্টি না হলে হয়তো রাষ্ট্রকূটরা ভারতবর্ষে একছত্র রাজা হয়ে উঠতে পারতেন।
তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁর পুত্র অমোঘবর্ষ রাজা হন। অমোঘবর্ষ দীর্ঘ ৬২ বৎসর (৮১৫-৭৭ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। আরব-ব্যবসাদার ও ভ্রমণকারীদের মতে অমোঘবর্ষ তৎকালীন পৃথিবীর চারজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্যতম। অপর তিনজন ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট ও কনস্তান্তিনোপলের (রুমের) বাদশাহ। অমোঘবর্ষ দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তিনি সাধুজীবন যাপন করবার জন্য পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের উপর রাজত্বের ভার দিয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেন। অমোঘবর্ষের রাজত্বের অনেকটা সময়ই চালুক্যবংশের পূর্ব-শাখার সঙ্গে সংগ্রামে ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয়

কৃষ্ণরাজের সময় চালুক্যরা তাঁকে পরাজিত করে তাঁর রাজধানী জ্বালিয়ে দেয়। যখন রাষ্ট্রকূটদের এই অবস্থা এবং পাল রাজাও অত্যন্ত দুর্বল, ঠিক সেই সময়ে দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র ভোজদেব উত্তর-ভারতে গুর্জরপ্রতীহারদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও এই বংশের তৃতীয় ইন্দ্র গুর্জররাজ মহীপালকে পরাজিত করেন; কিন্তু এই জয়ের অল্পকাল পরেই ইন্দ্রের মৃত্যু এবং রাষ্ট্রকূটদের মধ্যে আভ্যন্তরিক গোলমালে তাবা বিশেষ কিঁছু করে উঠতে পারেনি। অবশেষে যে চালুক্যবংশকে পরাজিত করে রাষ্ট্রকূটরা দাক্ষিণাত্যে প্রবল হয়ে ওঠে সেই বংশেরই তৈলপ নামে এক রাজা দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে শেষ রাষ্ট্রকূটরাজা দ্বিতীয় কক্ককে সিংহাসনচ্যুত করেন। রাষ্ট্রকূটদের রাজধানী ছিল মান্যখেত, বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত "মালখেত। এই বংশ প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসর রাজত্ব করে। এই বংশের একটি বিশিষ্ট কীর্তি এলিফ্যাণ্টা গুহা।

গুর্জর-প্রতীহার-রাজবংশ :—অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে গুর্জররাও হূনদের মতো মধ্য-এশিয়ার মরুবাসী যাযাবর জাতি এবং হূনদের কিছু পরে ভারতবর্ষে আগমন করে। বাণভট্টের হর্ষচরিতে সর্বপ্রথম গুর্জর জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রভাকরবর্ধন, গুর্জর জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন কিন্তু তাদের জয় করতে সক্ষম হননি। গুর্জররা নানা শাখায় বিভক্ত ছিল তার মধ্যে প্রতীহারবংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে রাজপুতানাই তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কখন তারা রাজ্য স্থাপন করে এ কথা বলা যায় না। প্রথম তাদের রাজধানী ছিল আবু পর্বতের ৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভিল্লমাল নামক স্থানে। প্রতীহারদের এক শাখা ব্রোচে রাজত্ব করত; অবশ্য তারা ভিল্লমালরাজের অধীন ছিল। এই বংশের রাজা প্রথম নাগভট্ট অবন্তী বা মালবের রাজা ছিলেন। এই নাগভট্টই সিন্ধুদেশীয় আরবদের পরাজিত করে উত্তর-ভারতে মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা কয়েক শত বৎসরের জন্য স্থগিত করতে সমর্থ হন। নাগভট্টের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কুক ও দেবরাজ ভিল্লমালের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

দেবরাজ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। দেবরাজের পর তাঁর পুত্র বৎসরাজ রাজা হন। তিনি উত্তর-ভারতের অনেক স্থান জয় করে গুর্জর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে 'ষড়দিন্দুধবল গৌড়ীয় রাজচ্ছত্রদ্বয়' গ্রহণ করেন। কান্যকুব্জও তাঁর রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্তৃক

সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হওয়াতে বৎসরাজের একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সমূলে বিনষ্ট হয়। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট্ট সিংহাসনে আরোহণ করে পুনরায় গুর্জর গৌরব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। 'তিনি সিন্ধু, অন্ধ্র, বিদর্ভ ও কলিঙ্গে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন' (মজুমদার), পরে ধর্মপালের মনোনীত কান্যকুব্জের রাজা চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন। চক্রায়ুধকে সাহায্য করতে ধর্মপাল আসেন এবং তিনিও পরাজিত হন, একথা আগে উল্লেখ করেছি। ধর্মপাল নিরুপায় হয়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং গোবিন্দ নাগভট্টকে পরাজিত করেন। অতএব দ্বিতীয় নাগভট্টও বৎস রাজের মতো গুর্জর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বিফলকাম হন। কিন্তু নবম শতাব্দীতে (আনুমানিক ৮৩৬-৮৯০ খৃষ্টাব্দ) যখন রাষ্ট্রকূটরাজারা চালুক্যদের সঙ্গে জীবন-মরণ সংগ্রামে বিব্রত এবং পাল রাজ্য দুর্বল রাজার হাতে, তখন দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র মিহির বা ভোজ এই কার্যে সফলকাম হন। কাশ্মীর, সিন্ধু, মগধ ও বঙ্গদেশ ব্যতীত সমস্ত উত্তর-ভারত ভোজের রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি তাঁর রাজধানী কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত করেন।

ভোজের পর মহেন্দ্রপাল রাজা হন। মহেন্দ্রপালের সময়ে মগধের কতকাংশ প্রতীহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কর্পূরমঞ্জরী ও বালরামায়ণ প্রণেতা বিখ্যাত কবি রাজশেখর, মহেন্দ্রপালের গুরু ছিলেন। মহেন্দ্রপালের দ্বিতীয় পুত্র মহীপালের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র, মহীপালকে পরাজিত করে কান্যকুব্জ অধিকার করেন। যদিও মহীপাল তাঁর রাজধানী পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হন, তবুও প্রতীহারদের বিপদের সুযোগ নিয়ে অনেক ছোট ছোট রাজা মাথা তুলে ওঠেন। ফলে পুনরায় উত্তর-ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়। বাঙলার পাল রাজারা, রাষ্ট্রকূটরা ও গুর্জর প্রতীহাররা যদি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ না করে একযোগে ভারতবর্ষ শাসন করার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তাহলে হয়তো ভারতবর্ষ মুসলমান বিজয়ের হাত থেকে রক্ষা পেত।

গুর্জর-প্রতীহারবংশের পতনের ফলে অনেকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়ে ওঠে। তার মধ্যে জেজাকভুক্তি বা বর্তমান বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল, মালাবার পরমার, শাকম্ভরী ও আজমীরের চৌহান ও গুজরাটের অন্তর্গত অনহিলবরার চৌলুক্য বা শোলাঙ্কীদের নাম করা যেতে পারে। এই রাজপুতরা কারা

এবং কোথা থেকে এসেছে, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। অনেক রাজপুত বংশ গুর্জর জাতি থেকে উদ্ভূত বলে মনে হয়। এরা হিন্দুধর্মের আওতায় এসে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়েছে। রাজপুতরা নিজেদের বিখ্যাত চন্দ্র ও সূর্যবংশ থেকে উদ্ভূত বলে দাবি করে। হিন্দুধর্মের অসাধারণ গ্রহণশক্তি শক, কুষাণ, হূন, গুর্জর প্রভৃতি সব জাতিকেই নিজ সমাজের মধ্যে স্থান দিয়ে আপন করে ফেলেছে—এখন এদের আর কোনো ভিন্ন সত্তা নেই। এটা হিন্দুজাতির পক্ষে গৌরবেরই। আমার মনে হয় রাজপুতজাতি সেই গৌরবের সাক্ষ্য। এতে রাজপুতদেরও অগৌরবের কিছু নেই। প্রতিহাররা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম বা গান্ধার অঞ্চলে কখনো প্রতিপত্তি স্থাপন করতে পারেনি। অনেকদিন পর্যন্ত কুষাণবংশের রাজারা কাবুল উপত্যকায় রাজত্ব করেছিলেন। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের এক ব্রাহ্মণমন্ত্রী কুষাণ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে ব্রাহ্মণশাহী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রাহ্মণশাহী বংশের রাজা জয়পাল (আনুমানিক ৯৬৫-১০০১ খৃষ্টাব্দ) কাবুল থেকে আরম্ভ করে অধুনালুপ্ত হকরা নদী পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে প্রতীহার রাজ্য কান্যকুব্জ ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উপরোক্ত রাজপুত রাজ্যসমূহের মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে, ঠিক এমনি সময়ে গজনীর রাজা সবুক্তগীন ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করে কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। খুব সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জয়পাল সবুক্তগীনের রাজ্য আক্রমণ করেন। জালালাবাদের কাছে দুই পক্ষের সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হওয়ায় জয়পাল কোনো যুদ্ধ না করেই সবুক্তগীনের সঙ্গে সন্ধি করে প্রত্যাবর্তন করেন।

নিরাপদে ফিরে এসে জয়পাল সন্ধির সর্ত পালন করেননি। তাই সবুক্তগীন জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়পাল এই বিপদের সময় নিজের প্রতিষ্ঠার দিকে লক্ষ্য না করে সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজন্যবৃন্দের কাছে স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরব-রক্ষা কল্পে সমবেত হয়ে সংগ্রাম করার জন্য আবেদন করেন। সে-আবেদন ব্যর্থ হয়নি। কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজা, চৌহান ও চন্দেল্ল রাজা জয়পালের সঙ্গে একযোগে সংগ্রাম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। আনুমানিক ৯৯১ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানে কুরামনদীর উপত্যকায় ভীষণ সংগ্রাম হয়। হিন্দুরা

অশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে; কিন্তু সবুক্তগীনই শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করেন এবং হিন্দুদের রক্তে নদী লাল হয়ে যায়। ফলে সবুক্তগীন সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করেন।

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে সবুক্তগীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মামুদ অপর পুত্র ইসমাইলকে পরাজিত করে গজনীর সুলতান হন, এবং ১০০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারত-অভিযান শুরু করেন। জয়পাল এবারও বাধা দেন; কিন্তু পরাজিত ও বন্দী হন। অবশেষে কর দেওয়ার সর্তে মুক্তিলাভ করেন। এ অপমানের তীব্র দংশন-জ্বালা জয়পালের পক্ষে অসহ্য হয়, তাই তিনি নিজ হস্তে চিতা প্রজ্জ্বলিত করে আগুনে প্রবেশ করে প্রাণত্যাগ করেন। এর পরে প্রতি বৎসর সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর ভারত-আক্রমণের বিশেষত্ব লুটপাট ও মন্দির ধ্বংস। কিন্তু এর মধ্যে তথাকথিত ধর্মভাবের চেয়ে লুণ্ঠন প্রবৃত্তি ও অর্থ-লিপ্সাই বড় ছিল। ভাবতবর্ষ যদি মুসলমান রাজ্য হত, তাহলেও মামুদ এরূপ লুণ্ঠন করতে ক্ষান্ত হতেন কিনা সন্দেহ!

মামুদ বাগদাদের খলিফাকে লিখে পাঠান যে খোরাসানের যে অংশ তখনও খলিফার অধীনে, তা যেন তাঁকে দেওয়া হয়। খলিফাকে নম্র পেয়ে সমরকন্দ তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে দেওয়ার কড়া দাবি পাঠান, এমন কি সঙ্গে সঙ্গে এ ভয়ও দেখানো হয় যে, খলিফা অস্বীকৃত হলে মামুদ বাগদাদে অভিযান করে খলিফাকে হত্যা করে তাঁর ভস্ম গজনীতে নিয়ে আসবেন। অবশ্য হারুণ-উল-রসিদের স্থলাভিষিক্ত দুর্বল হলেও এরূপ অপমানজনক চিঠির খুব সংক্ষিপ্ত ও বীরত্বপূর্ণ উত্তর দেন। ফলে মামুদ ঠাণ্ডা হন। সিন্ধুদেশ আরবরা জয় করেছিল, এ কথা আগে উল্লেখ করেছি। পরে সিন্ধুর আরবরা সম্পূর্ণরূপে বাগদাদের অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকে। সুলতান মামুদের সময় সিন্ধু প্রধানত দুজন আমীরের অধীন ছিল। মামুদ হঠাৎ আক্রমণ করে আমীর ফতেদাউদকে পরাজিত করে গজনীর রাজকোষে বহু অর্থ দিতে বাধ্য করেন এবং ভবিষ্যৎ ভারত আক্রমণের জন্য তাঁর রাজ্যকে কেন্দ্র-স্বরূপ ব্যবহার করেন।

সুলতান মামুদের লুণ্ঠন কার্য ভারতবাসী নীরবে দাঁড়িয়ে দেখেনি। দেশের ও ধর্মের বিপদ লক্ষ্য করে উত্তর-ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা পুনরায়

জয়পালের পুত্র আনন্দপালের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হন। বাঙলার তৎকালীন পাল রাজা এই সংগ্রামে যোগদান করেননি। আনন্দপালের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী মামুদের রাজ্যে প্রবেশ করে। এবার সুলতান মামুদকে পরাজিত করতে না পারলে ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে এবং হিন্দু ধর্ম রক্ষা করাই কঠিন হবে একথা উত্তর-ভারতের অনেক লোক স্পষ্ট উপলব্ধি করছিল। তাই শুধু মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের রাজারা যে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন এবং অসংখ্য লোক যে সৈন্যদলভুক্ত হয়েছিল তা নয়, মহিলারা পর্যন্ত নিজ নিজ অলঙ্কার বিক্রি করে এই যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে অকাতরে অর্থ দান কবেন।

সুলতান মামুদ এবার আক্রমণ না করে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। হিন্দুদের মিলিত সৈন্যের ভীষণ আক্রমণে প্রথমেই মামুদের প্রায় তিন চাব হাজার সৈন্য নিহত হয়। মামুদ বিশেষ বিব্রত হয়ে পড়েন, এমন কি তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা জয়ের পূর্বাভাসের আনন্দাতিশয্যে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েন—এমন কি সেনাপতি নিজেও হট্টগোলের মধ্যে পড়ে যান। এমন সময়ে আনন্দপালের হাতি ভীত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, অবশ্য এ বিষয়ে মতভেদ আছে। একদিকে সৈন্যরা বিশৃঙ্খল, অপরদিকে আনন্দপালের অনুপস্থিতি—ঠিক সেই সময়ে মামুদ দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ভীষণ বেগে আক্রমণ করে হিন্দুদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন।

হিন্দুদের বীরত্ব বা স্বদেশ প্রেমের অভাবে এই যুদ্ধে পরাজয় ঘটেনি, সেনাপতির রণনৈপুণ্যের অভাবই এর কারণ। এই যুদ্ধে হিন্দুরা জয়ী হলে ভারত-ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত। ১০০৮ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়। জয়ের পর মামুদ নগরকোট (বর্তমান কাঙরা) শহর লুণ্ঠন করে তাঁর অর্থপিপাসার নিবৃত্তি সাধন করেন। ১০০১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মামুদ সতেরো বার ভারতবর্ষে লুণ্ঠন অভিযান করে অপরিমিত ধনরত্ন নিয়ে যান। ১০১৯ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ লুণ্ঠন ও ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস ও মন্দিরে সঞ্চিত অপরিমিত সোনা, রূপা লুণ্ঠন মামুদের অভিযানের দুটি বড় ঘটনা।

এই সব অভিযানের ফলে ভারতবর্ষের কত মন্দির, কত কীর্তি যে ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সুলতান মামুদ সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ

সেনাপতি ও বিদ্যোৎসাহী হলেও হূনআক্রমণকারীদের মতো ভারতীয় সভ্যতার পরম শত্রু বলেই গণ্য হওয়ার যোগ্য। তাঁরই সভার ঐতিহাসিক বিখ্যাত আলবিরুণীর পুস্তকে দেখতে পাই 'মামুদ দেশটির (ভারতের) সমৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছেন এবং আশ্চর্যজনক সাহসিক কার্যসাধন করেছেন, ফলে হিন্দুরা চারদিকে ধূলিকণার মতো বিক্ষিপ্ত হয়েছে। আর এ জন্যই আমরা এই দেশের যে সমস্ত অঞ্চল অধিকার করেছিলাম সে সব স্থান থেকে বিদায় নিয়ে হিন্দু জ্ঞান-বিজ্ঞান কাশ্মীর, বেনারস প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে আমাদের হস্ত পৌঁছতে পারে না সেই সব জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে।' সুলতান মামুদের অসামান্য বীরত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে প্রবল ছিল বলে মনে হয় না। লুণ্ঠন, ধ্বংস, হত্যা প্রভৃতি বর্বরোচিত প্রেরণাই তাঁর কার্যসমূহকে বেশির ভাগ নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুলতান মামুদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর দরবারে আলবিরুণী ও ফিরদৌসী এই দুই পণ্ডিত ছিলেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ মারা যান। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশের কতকাংশ তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করত। মামুদের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর কাল ভারতবর্ষে কোনো বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি। কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও উত্তর-ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারা সম্মিলিত হয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করেননি এবং পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে নিজেদের শক্তি খর্ব করেছেন। এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

এই সময়ে চন্দেল্লদের তেমন কোনো প্রতাপ ছিল না। তাঁদের প্রধান কীর্তি খাজুরাহোর বিখ্যাত মন্দির। মালব প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করে যে পরমার বংশ নবম শতাব্দীতে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে সেই বংশের বিখ্যাত রাজা ভোজ তখন মালবের সিংহাসনে। তিনি ১০১৮-১০৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি একাধারে বীর, কবি, মহাবিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী বলে সুপরিচিত। তিনি নিজে জ্যোতিষ, স্থপতিবিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক লিখেছেন। তাঁর প্রকাণ্ড এক গ্রন্থাগার ছিল। তাঁর সরস্বতীর মন্দিরে স্থাপিত সংস্কৃত কলেজ বর্তমানে একটি মসজিদ। প্রজাহিতার্থে তৈরি ভোজপুরের ২৫০ বর্গমাইলব্যাপী হ্রদ তাঁর এক প্রধান কীর্তি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এক মুসলমান রাজার আদেশে এই হ্রদ ধ্বংস করা হয়।

ইতিহাসে দুজন ভোজ রাজার নাম পাওয়া যায়—(১) কান্যকুব্জের প্রতীহার রাজা মিহির ভোজ ও (২) ধারা বা মালবের রাজা ভোজ। এই দুজনের মধ্যে মালবের ভোজই বিখ্যাত এবং গ্রামে গ্রামে যে ভোজ রাজা সম্বন্ধে গল্প শুনতে পাওয়া যায় তিনি এই ধারা নগরীর সুপণ্ডিত ভোজ। জনপ্রবাদ মতে তিনি একজন আদর্শ ভারতীয় রাজা। জব্বলপুরের সন্নিকটবর্তী স্থানের কালচুরির রাজা কর্ণদেব আন্‌হিলবরার চৌলুক্যদের সাহায্যে ভোজকে পরাজিত করে পরমারবংশের গৌরব নষ্ট করেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে যখন গাহড়ওয়ালবংশীয় রাজা জয়চন্দ্র কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে উত্তর-ভারতে সম্ভর ও আজমীরের চৌহানবংশীয় রাজাই সব চেয়ে বেশি প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। চৌহানরা সবুক্তগীন ও মামুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। এই বংশের বিভিন্ন শাখা রাজপুতানার মাড়োয়ার অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। এই বংশের রাজা বিগ্রহরাজ দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করে বংশের বিভিন্ন শাখাকে তাঁর কর্তৃত্বাধীনে আনেন—ফলে চৌহানবংশ খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। চৌহানরা বীরত্বের জন্য প্রসিদ্ধ। বিগ্রহরাজ দিল্লীকে নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন বলে কথিত আছে। দিল্লীর সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িত, কিন্তু দিল্লী ভারতবর্ষের প্রাচীন শহর নয়, একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলেই মনে হয়। বিগ্রহরাজ বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। আজমীরের মসজিদ মেরামত করতে গিয়ে ছটি কালো পাথরের ফলক পাওয়া যায়, এই ফলকের মধ্যে দুটিতে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত নাটকের অংশ খোদিত আছে। তার মধ্যে একটি (হরকালী নাটক বিগ্রহরাজের নিজের লেখা। বিগ্রহরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের সমসাময়িক এবং এই বংশের শেষ ও সর্বপ্রধান রাজা। পৃথ্বীরাজ খুব সাহসী ও বীর ছিলেন। জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের মধ্যে শত্রুতা ছিল। এই শত্রুতা বা বিবাদের দুটি কারণ সাধারণত উল্লিখিত হয়। উভয়েই তোমর রাজার দৌহিত্র ছিলেন, ঐ রাজা জয়চন্দ্রকে রাজ্যের অংশ না দিয়ে পৃথ্বীরাজকে উত্তরাধিকারী করাই প্রথম কারণ। কিন্তু পৃথ্বীরাজবিজয়ের মতে পৃথ্বীরাজের মাতা তোমর বংশোদ্ভূতা নন। দ্বিতীয় কারণ পৃথ্বীরাজ জয়চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞ ও তাঁর কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত না হয়ে কান্যকুব্জেই গোপনে

লুকিয়ে থেকে সংযুক্তাকে হরণ করে নিয়ে যান। এর মধ্যেও কতদূর ঐতিহাসিক সত্য আছে তা কে বলতে পারে।

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলায় সেন রাজারা রাজত্ব করতেন। তাঁরা কর্ণাটকের ক্ষত্রিয় বংশ জাত। পালরা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু সেনরা নৈষ্ঠিক হিন্দু। এই বংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন (১০৯৫-১১৬০ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর পুত্র বল্লালসেন (১১৬০-১১৭৮ খৃষ্টাব্দ) বাঙলায় কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন, এটাই প্রচলিত মত। 'কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন ও পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসন সমূহে নবপ্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনোই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণদের নামোল্লেখ করলেও তাঁহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্যপ্রথা বল্লালসেন কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে' (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন দক্ষিণে কলিঙ্গ ও পশ্চিমে কাশী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করেন। বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনই মিথিলা ও আসাম পর্যন্ত তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। বিখ্যাত কবি জয়দেব ও মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূতম নামক কাব্যলেখক ধোয়ী লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজেও একজন সুকবি ছিলেন। তিনি ১১৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১২০৫ খৃষ্টাব্দের পরে তাঁর কোনো খবর পাওয়া যায় না। পালযুগের শিল্পকলার সমকক্ষ না হলেও লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প বেশ উন্নতই ছিল। এই সময়ে উড়িষ্যায় চোড়গঙ্গদেব রাজত্ব করছিলেন। তিনি ১০৭৬ থেকে ১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৭১ বৎসর রাজত্ব করেন। এত দীর্ঘকাল আর কোনো ভারতীয় রাজা রাজত্ব করেননি। তাঁর রাজত্ব উত্তরে গঙ্গানদী ও দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ করেন।

অনহিলবরায় চৌলুক্যদের নাম উল্লেখ করেছি। তারা এ সময়ে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই বংশের রাজা জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খৃষ্টাব্দ) গুজরাট, কাঠিওয়ার, মধ্য-ভারত ও রাজপুতানার অধিকাংশ প্রদেশ নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। জয়সিংহের পুত্র কুমারপালও (১১৪৪-১১৭৩ খৃষ্টাব্দ) বেশ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। জৈনমতে কুমারপাল প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য হেমচন্দ্র

কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। হেমচন্দ্র জয়সিংহ ও কুমারপাল এই উভয় রাজার সভাই অলঙ্কৃত করেছিলেন।

তখন দাক্ষিণাত্যে চালুক্য ও চোল রাজাদের প্রভুত্ব। রাষ্ট্রকূটবংশ ধ্বংস করে দশম শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্য রাজা তৈলপ কর্তৃক দ্বিতীয় চালুক্য বংশের প্রতিষ্ঠার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। এদের রাজধানী ছিল কল্যাণে বা বর্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণী নামক স্থানে। চোলদের ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে এরা বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। এই বংশের রাজাদের মধ্যে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমাঙ্ক বেশ প্রসিদ্ধ। তিনি ৫০ বৎসর (১০৭৬-১১২৬ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি বঙ্গ, কলিঙ্গ, গুর্জর, মালব, চেরা ও চোলদের তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করান। কাশ্মীর দেশীয় পণ্ডিত বিহ্লন তাঁর সভাকবি ছিলেন। বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' থেকে তাঁর রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যায়।

বিক্রমাঙ্কের মৃত্যুর পরই এই বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। হয়শালা (বর্তমান মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত হালেবিদ) ও দেবগিরির রাজারা (বর্তমান দৌলতাবাদ) দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চালুক্য রাজ্যের অধিকাংশ নিজেদের রাজ্যভুক্ত করেন।

চোলরা দাক্ষিণাত্যে সমস্ত হিন্দুযুগেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে তারা তাঞ্জোর জয় করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করে। দশম শতাব্দীর শেষভাগে রাজারাজ (৯৮৫-১০১২ খৃষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কলিঙ্গ, সিংহলের কতকাংশ, কুর্গ, মহীশূরের অধিকাংশ ভাগ প্রভৃতি জয় করে এবং পাণ্ড্য, চেরা ও চালুক্যদের পরাজিত করে সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে সর্বময় প্রভু হয়ে ওঠেন। তাঁর বেশ ক্ষমতাশালী নৌবহর ছিল এবং তিনি বহু দ্বীপ জয় করেন। তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ তাঁর এক প্রধান কীর্তি।

রাজারাজের পর তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রচোলদেব (১০১২-১০৩৫ খৃষ্টাব্দ) রাজা হন। তিনি এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি বঙ্গদেশ পর্যন্ত তাঁর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। তিনি সিংহল সম্পূর্ণ জয় করেন। তাঁর নৌবহর সাগর পার হয়ে পেগু এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ জয় করে। তিনি মালয় ও সুমাত্রার কতক অংশও জয় করেন। গঙ্গানদীর উপত্যকা পর্যন্ত জয় করে

তিনি গঙ্গাই-কোণ্ডা বা গঙ্গা-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করেন। ষোলো মাইল লম্বা হ্রদ তৈরি তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর রাষ্ট্রব্যবস্থা অতি সুনিয়ন্ত্রিত ছিল।

রাজেন্দ্রচোলদেবের পর তাঁর পুত্র রাজাধিরাজ (১০৩৫-১০৫৩ খৃষ্টাব্দ) চোল রাজ্যেব অধিপতি হন। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের সঙ্গে কৃষ্ণানদী তীরে কোপ্পাম নামক স্থানে (১০৫২-১০৫৩ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে) রাজাধিরাজের মৃত্যু হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁর ভাই দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (১০৫২-১০৬৩ খৃষ্টাব্দের) রাজা হয়ে চালুক্যদের পরাজিত করেন। পরবর্তীকালেও চোল ও চালুক্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে চোলদের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে তাদের প্রভাব বিলুপ্ত হতে আরম্ভ হয়।

উপরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পযন্ত ভারতবর্ষ পরস্পব যুদ্ধমান বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনো বা কোনো রাজ্য একটু প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছে, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের দরুন তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

যখন ভারতবর্ষে এই অবস্থা আফগানিস্থানেও তখন বহু পরিবর্তন ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গজনী ও হীরাটের মধ্যবর্তী ঘোর নামক রাজ্যের সঙ্গে গজনীর কলহ আরম্ভ হয়। ঘোর রাজ্য সুলতান মামুদের অধীন ছিল। কিন্তু তৎকালীন গজনীর সুলতান বেহরাম ঘোরের অধিপতি আলাউদ্দীন হাসনের ভ্রাতাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করায় (আনুমানিক ১১৫২ খৃষ্টাব্দ) ঘোরীবা গজনী আক্রমণ করে। গজনীর সুলতান পরাজিত হলে যে অত্যাচারের ভিত্তির উপর গজনী দণ্ডায়মান, গজনীতে তারই চরম অভিনয় হয়। সুলতান মামুদ ভারত-বর্ষের অনেক শহরে যে তাণ্ডবলীলার অভিনয় করেছিলেন অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে তাঁর বড় সাধের গজনী তাঁর মৃত্যুর একশত বৎসরের কিছু পরে সেই দৃশ্যের অভিনয় স্থান হয়ে ওঠে। সাত দিন ধরে হত্যা চলেছিল। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে জগৎ থেকে দয়া যেন তখন লোপ পেয়েছিল।

ভারতবর্ষের অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করে সুলতান মামুদ যে গজনীকে ইন্দ্রের অমরাপুরী করে তুলেছিলেন আলাউদ্দীন হাসান আগুন জ্বালিয়ে তাকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেন। গজনীর সুলতান তাঁর ভারতীয় রাজ্যে লাহোরে পালিয়ে আসেন। কিন্তু ঘোরীয়া সুলতানের কয়েকজন অনুগত লোককে

শৃঙ্খলাবদ্ধ করে ঘোরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেন এবং প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থের জন্য তাদের রক্তমিশ্রিত মাটি দিয়ে দেওয়ালের গাঁথুনী করা হয়। কিছুদিন পরে গজনীর সুলতান মারা যান। আলাউদ্দীনের পর গিয়াসুদ্দীন ঘোরের অধিপতি হন। তিনি তাঁর ভাই মহম্মদ বা শাহাবুদ্দীন ঘোরীকে গজনী ও কাবুলের শাসনভার প্রদান করেন। মহম্মদ ঘোরী আনুমানিক ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের দিকে অভিযান করে মুলতান ও উচ অধিকার করেন। তিন বৎসর পরে তিনি গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু চৌলুক্যবংশীয় দ্বিতীয় মুলরাজ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি গজনীর সুলতানবংশের অধিপতিকে পরাজিত ও বন্দী করে (অবশ্য পরে হত্যা করা হয়) পাঞ্জাব অধিকার করেন। ফলে গজনী রাজ্যের অবসান ঘটে ও সমস্ত রাজ্য ঘোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পাঞ্জাব জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথ্বীরাজের রাজ্যের সঙ্গে ঘোর রাজ্যের বিবাদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন। পৃথ্বীরাজও যুদ্ধ করতে অগ্রসর হন। তরাইন বা তলবাড়ি নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। মহম্মদ ঘোরী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। তিনি যখন আহত হয়ে প্রায় মূর্চ্ছিত, সেই সময় এক বিশ্বাসী ভৃত্য অসীম সাহসের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অপসারিত করে তাঁর জীবন রক্ষা করে। মুসলমান সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু এই হিন্দুদীপ্তি স্থায়ী হয়নি। পরের বছর (১১৯২ খৃষ্টাব্দ) মহম্মদ ঘোরী এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আবার পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। আবার উভয়পক্ষ তরাইনে সমবেত হয়। পৃথ্বীরাজ মহম্মদ ঘোরীকে ফিরে যাওয়ার জন্য খবর পাঠান। মহম্মদ ঘোরী খবর দেন যে তাঁর ভ্রাতাই রাজা, নিজে তিনি আজ্ঞাবহমাত্র, কাজেই নির্দেশের জন্য ভ্রাতার কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছেন। যখন এইভাবে কথাবার্তা চলছিল তখন হঠাৎ একদিন মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজের সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করেন। সন্ধি হতে পারে মনে করে পৃথ্বীরাজ অসতর্ক ছিলেন, তাই হঠাৎ আক্রমণে বিব্রত হয়ে পড়লেন। হিন্দুরা অশেষ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে হঠাৎ আক্রমণের প্রথম ধাক্কা সামলে এগিয়ে যায় এবং ঘোর সৈন্যরা পশ্চাৎপদ হতে বাধ্য হয়। এবারও জয়ের পূর্বাভাসের আনন্দাতিশয্যে হিন্দুসৈন্যরা বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। তখন মহম্মদ ঘোরী বারো হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে

ভীষণ বেগে পুনরাক্রমণ করেন। বিশৃঙ্খল হিন্দুসৈন্য এ আক্রমণ সহ্য করতে পারে না, ফলে তাদের পরাজয় ঘটে। পৃথ্বীরাজ বন্দী হয়ে অতি নৃশংসভাবে নিহত হন। এই তরাইনের যুদ্ধেই বহুদিনের জন্য হিন্দু-গৌরব-রবি অস্তমিত হয়। কারো কারো মতে এই সময়ে জয়চন্দ্র গোপনে পৃথ্বীরাজের বিরোধিতা করেন।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর মহম্মদ ঘোরী আজমীর জয় করেন। ঘোরী এই বিজয়ের পর গজনী ফিরে যান এবং তাঁর ক্রীতদাস কুতবুদ্দিনকে ভারতীয় রাজ্যের শাসনকর্তা পদে অধিষ্ঠিত করেন। কুতবুদ্দিন দিল্লী ও অন্যান্য স্থান জয় করেন এবং ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রকে পরাজিত করে বারাণসী পর্যন্ত ঘোর রাজ্য বিস্তৃত করেন।

কুতবুদ্দিনের জনৈক কর্মচারী মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজী ১১৯৯ ও ১২০২ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে বিহার ও বাঙলার কতকাংশ জয় করেন। তখন গোবিন্দপাল বিহারের রাজা ছিলেন। বিহার জয় করে মহম্মদ প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করেন, সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের সঞ্চিত গ্রন্থাগারটিও ভস্মীভূত হয়। এমন কি নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শতাব্দী সঞ্চিত পুস্তক সমেত গ্রন্থাগার, বহু বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘরামও পাঠানদের দ্বারা ধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়। এদের অত্যাচারে দলে দলে নরনারী মগধ পরিত্যাগ করে নিকটবর্তী পর্বতসংকুল হিন্দু রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। বহু বৌদ্ধভিক্ষু মহামূল্য ধর্মপুস্তকসহ নেপালে পালিয়ে যান। এই বোধ হয় পাল রাজাদের সময় লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হওয়ার কারণ। কে জানে কত অমূল্য পুস্তক নালান্দা ও বিক্রমশীলার গ্রন্থাগারে সঞ্চিত ছিল। হয়তো সে সমস্ত থাকলে ভারত-ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায় খুলে যেত। সভ্যতার মাপকাঠিতে এ অত্যাচারের তুলনা হয় না।

বৌদ্ধধর্ম প্রধানত হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেই ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। কিন্তু শঙ্করের পর বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাল রাজাদের অধীনে মগধ ও বঙ্গ। পাঠানরা এ অঞ্চলের বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারাম ধ্বংস করে এবং বৌদ্ধভিক্ষুদের বেপরোয়া হত্যা করে যে সে ধর্মের শেষ শিখাটি নির্বাণের প্রধান সহায়ক হয়েছিল এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই সময়ে মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্মাবলম্বী তুর্কী জাতি আরবরাজ্য ধ্বংসের জন্য অগ্রসর হয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবদের বার বার পরাজিত

করছিল। তাই বোধ হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠানরা এরূপ বৌদ্ধ বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছে—তারা হিন্দুদের চেয়ে বৌদ্ধদের উপরই বেশি অত্যাচার করেছে। মধ্য-এশিয়ায় যে বৌদ্ধ-জাগরণ ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়, মগধবিজয়ের পঞ্চাশ বৎসরের কিছুকাল পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত কুবলাই খাঁর ভ্রাতা হুলাগুখাঁ কর্তৃক বাগদাদ অধিকার ও আরব জাতীয় শেষ সুলতান মুস্তসিমবিল্লার হত্যায় তা পরিণতি লাভ করে।

উপরে মহম্মদ ইবণ বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক বাঙলার কতকাংশ জয়ের কথা উল্লেখ করেছি। প্রচলিত ধারণা লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে বাঙলা জয় করেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙলার কতকাংশ জয় করেন মহম্মদ ইবন বক্তিযার খিলিজী অর্থাৎ বক্তিয়ার খিলিজীর পুত্র মহম্মদ। আরবী ইবন শব্দের অর্থ পুত্র। তা না জেনে মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজী নামকে সংক্ষেপে বক্তিয়ার খিলিজী ধরে নেওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এরকম ভুল হওযা সম্ভবপর। এটাই প্রচলিত ধারণার মূল। অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বাঙলা জয়ের মূলে মুসলমান ঐতিহাসিক মিনহাজী সিরাজের বিবরণ। বাঙলা জয়ের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে মিনহাজী সিরাজ এই বিবরণ লিখেছেন। সিরাজ বিহার জয় সম্বন্ধে বিবরণ মহম্মদের দুজন বৃদ্ধ সৈন্যের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, বাঙলা সম্বন্ধেও হয়তো এরকম কারো কাছ থেকে শুনে থাকবেন। এরকম বিবরণের যাথার্থ্য মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ভিন্সেণ্ট স্মিথ লিখেছেন : 'তিনি (সিরাজ) নদীয়া আক্রমণ সম্বন্ধে তেমন সঠিক খবর জানতেন বলে মনে হয় না।।'

মহম্মদ অষ্টাদশ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে নদীয়া নগরে উপস্থিত হন। নগরবাসীরা তাঁকে অশ্ববিক্রেতা মনে করেছিল ; তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে অবিশ্বাসীদের আক্রমণ করেন। এই সময় রায় লখমনিয়া আহার করছিলেন, মুসলমানদের আগমন সংবাদ শুনে দাসদাসী, ধনসম্পদ ও পুরমহিলাদের পরিত্যাগ করে তিনি অন্তঃপুরের দ্বার দিয়ে পলায়ন করেন—এই-ই মিনহাজী সিরাজের বিবরণ। এই নদীয়া কোথায় ? নদীয়া যদি নবদ্বীপ হয় তাহলে একথা মনে রাখতে হবে যে নবদ্বীপ কখনো সেনবংশের রাজধানী ছিল না। এই সব কারণে মনে হয় সিরাজের বিবরণ অলীক। ইতিহাসে পাওয়া যায় মহম্মদের প্রায় ৫০ বৎসর পরে সুলতান মুগীসউদ্দিন যুজবক নদীয়া বিজয়

করেন। যদি মহম্মদের নদীয়া বিজয় সত্য হয় তাহলে হিন্দুরা তা পুনরধিকার করেছিল—নতুবা সুলতান মুগীসউদ্দিনের জয় করার কথার সামঞ্জস্য বিধান হয় না। আগাগোড়া সমস্ত আলোচনা করলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকে না যে অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙলা জয় অন্ধকূপ হত্যার মতো সম্পূর্ণরূপে ঐতিহাসিক অসত্য। অবশ্য মহম্মদ ইবন বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক বাঙলার কতকাংশ জয় সত্য।

বাঙলার কতকাংশ জয়ের পর ১২০৪-১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কামরূপ আক্রমণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁর ভাগ্যে অশেষ দুর্গতি ঘটে। বিশেষ কিছু করতে না পেরে তিনি প্রত্যাবর্তন করতে আরম্ভ করেন, করতোয়া নদীর তীরে এসে দেখেন যে পুল তৈরি করে তিনি তার উপর দিয়ে সৈন্য নিয়ে গিয়েছিলেন কামরূপ অধিবাসীরা সে পুল ধ্বংস করে ফেলেছে। তিনি কোনো রকমে একশো সৈন্য নিয়ে নদী সাঁতরিয়ে পালাতে সমর্থ হন। অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য নিহত হয়। শুধু এবার নয়, পাঠান ও মোগল শক্তি কখনো কামরূপ জয় করতে পারেনি। বহু আক্রমণ সত্ত্বেও আসামবাসীরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এটা আসামের পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা।





অষ্টম পরিচ্ছেদ

মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা—এই দুটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমোক্ত শহরের নাম সাধারণত ইংরেজী পুস্তকে Mohenjo-daro এবং বাংলা পুস্তকে মোহেঞ্জদড়ো বা মহেঞ্জোদড়ো বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু সিন্ধি ভাষানুযায়ী প্রকৃত শব্দ মোঅন্‌জোদড়ো এবং তার অর্থ মৃতের স্তূপ। বোধ হয় এই শহর জনমানবশূন্য হওয়ার পর পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকেরা তার ঐ নামকরণ করেছিল। মোঅন্‌জোদড়ো সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানা জেলায়, লারকানা শহর থেকে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে সিন্ধুনদী ঐ স্থান থেকে ৩½ মাইল পূর্বে প্রবাহিত, যদিও এক সময়ে নদীটি আরো নিকটে ছিল। হরপ্পা এই স্থান থেকে প্রায় চারশো মাইল দূরে পাঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্টগোমারী জেলায় অবস্থিত। ইরাবতী (রাবী) নদীর গতিপথ পরিবর্তনের আগে তা ঐ নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। রাবী নদীর গতিপথপরিবর্তনের ফলে এই শহরের অবনতি ঘটে এবং অবশেষে জনমানবশূন্য হয়, আর মোঅন্‌জোদড়ো সম্ভবত বন্যার প্রকোপেই পরিত্যক্ত হয়।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোঅন্‌জোদড়ো খনন করেন। প্রাগৈতিহাসিকযুগের বহু শীলমোহর, মাটির পাত্র ইত্যাদি এখানে পাওয়া

যায়। ১৯২১ সালে দয়ারাম সহানী হরপ্পাতে খনন করে বহু প্রাচীন জিনিস উদ্ধার করেন এবং ঐগুলি ও রাখালবাবু কর্তৃক প্রাপ্ত জিনিস অবিকল এক রকম। এরপরে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের জন মার্শাল, ই. ম্যাকে, কাশীনাথ দীক্ষিত, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি অন্যান্য পণ্ডিতেরা উপরোক্ত দুটি জায়গা ও পাঞ্জাব থেকে বেলুচিস্থান পর্যন্ত আরো কয়েকটি স্থান খনন করে অনেক প্রাচীন জিনিস পান। এই আবিষ্কারের ফলে অতি প্রাচীনকালে পাঞ্জাব থেকে বেলুচিস্থান পর্যন্ত কয়েকশত মাইল ব্যাপী স্থানগুলিতে যে একটি সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল তা দিবালোকের মতো প্রতিভাত হয়। সিন্ধুনদীর তীর ধরে ধরে এবং তার নিকটবর্তী স্থানগুলিতে ঐ সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল বলে অনুমিত হয়, তাই ঐ সভ্যতা এক কথায় 'সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা' বলে অভিহিত।

সিন্ধু উপত্যকার অনেকস্থান খনন করা হয়েছে বটে, কিন্তু এ কার্য বিশেষভাবে মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায়ই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবার পরবর্তী যুগে, এমন কি আধুনিক কাল পর্যন্ত, হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে বহু লোক বহু ইট নিয়ে যাওয়ায়, মোঅন্‌জোদড়োই অপেক্ষাকৃত ভালো ভাবে রক্ষিত ছিল।

উভয় শহরই পাকা ইটের তৈরি এবং ইটগুলিও অনেকটা বর্তমান কালের ইটের মতো। শুধু তাই নয় উভয় শহরই একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি। সে যুগে এমন পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি শহর জগতে আর কোথাও ছিল বলে জানা নেই। কোনো সুদক্ষ শিল্পী শহরবাসীর স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখেই নগরের পরিকল্পনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

মোঅন্‌জোদড়োর রাস্তাগুলি সোজাসুজি পূর্ব-পশ্চিম বা উত্তর-দক্ষিণ লম্বা ছিল। শহরের জল নিকাশের জন্য পাকা ড্রেন ছিল, প্রত্যেক বাড়ি থেকে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। আজকালকার মতোই দোতলা-তেতলা বাড়ির ছাদ থেকে জল নিকাশের জন্য মাটির পাইপ তৈরি করে খাড়াভাবে দেয়ালের সঙ্গে বসিয়ে দেওয়া হত। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে স্নানাগার এবং কোনো কোনো বাড়িতে পাকা পায়খানাও ছিল। শুধু স্নানাগার নয়, সন্তরণ-বাপীও আবিষ্কৃত হয়েছে। অধিকাংশ দালান ও বড় বড় বাড়িতে পাকা ইটের গাঁথুনী দেওয়া কূপ ছিল। গরীব লোকেরা সে সমস্ত কূপ থেকে জল নিয়ে আসত।

ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত জিনিস থেকে প্রমাণিত হয় যে ঐ সভ্যতা তাম্রপ্রস্তর যুগের। পাথরের, মাটির ও তামা বা ব্রোঞ্জের তৈরি নানারকম জিনিস পাওয়া

গিয়েছে, কিন্তু লোহার তৈরি কোনো জিনিস পাওয়া যায়নি। মার্শালের মতে মোঅন্‌জোদড়োর স্থিতিকাল খৃষ্টপূর্ব ৩২৫০-২৭৫০ অব্দ। মেসোপোটেমিয়ার বিভিন্ন স্থানে খননের ফলে যে সমস্ত শীলমোহর ও অন্যান্য জিনিস পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে এই অঞ্চলে প্রাপ্ত জিনিসের সাদৃশ্য এবং বিশেষভাবে ভারতীয় জিনিসের প্রাপ্তি থেকেই এই সময় নির্ধারিত হয়েছে। মেসোপোটেমিয়ার বিভিন্ন যুগের সময় যদি ভবিষ্যতে অন্যরূপ স্থির করা হয় তাহলে হয়তো সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার কালও পরিবর্তিত হবে।

প্রাপ্ত জিনিসগুলি থেকে মনে হয় ঐ সভ্যতা খুব উঁচু স্তরের ছিল। মাটির নানারকম পাত্র, এমন কি কাচের মতো চকচকে মসৃণ পাত্র, রঙিন ও চিত্রিত মাটির পাত্র, পাথরের শীলমোহরে অঙ্কিত সুন্দর বৃষমূর্তি ও অন্যান্য প্রাণীর মূর্তি, ব্রোঞ্জের ঢালাই করা নর্তকী মূর্তি ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের চিত্র ও ভাস্কর্য-শিল্পের জ্ঞানের পরিচয় দেয়। স্থপতিবিদ্যা ও পূর্তবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞানের নমুনা তাদের শহর পরিকল্পনা থেকে পাওয়া যায়। মোঅন্‌জোদড়োর একটি সন্তরণ-বাপীর নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী বলেন: 'বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন।'

হাতির দাঁতের তৈরি নানারকম জিনিস (চিরুনি, পাশা প্রভৃতি), সুতা কাটার অসংখ্য টেকো ও তুলার বস্ত্র, সোনা, রুপো ও মূল্যবান পাথরের তৈরি অলঙ্কার, ব্রোঞ্জের দর্পণ, ক্ষুর, কুঠার, করাত প্রভৃতি যন্ত্র, সূচ ও মাছ ধরবার বঁড়শি, প্রসাধনের দ্রব্য প্রভৃতিও মোঅন্‌জোদড়োতে পাওয়া গিয়েছে। এই সব জিনিসই একটি উন্নত সভ্যতার পরিচয় দেয়।

মোঅন্‌জোদড়ো একটি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ ও অন্যান্য দেশ থেকে সেখানে বাণিজ্যের জন্য লোক যাতায়াত করত। কাশ্মীর থেকে নানা জাতীয় হরিণের শিং আসত। মূল্যবান 'আমাজন' পাথর কাশ্মীর বা নীলগিরি পর্বত থেকে আসত। মহীশূর থেকে আনীত সুন্দর নীল পাথরের তৈরি একটি পেয়ালা সেখানে পাওয়া গিয়েছে। ঐ অঞ্চলে যে সোনা পাওয়া গিয়েছে তা রুপো মিশ্রিত, ঐ পরিমাণ রুপো মিশ্রিত সোনা দক্ষিণ-ভারতের (মহীশূরের কোলার এবং মাদ্রাজের অনন্তপুরের) সোনার খনিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারত থেকে সোনা আসা সম্ভবপর। রুপো সমন্বিত সীসার যৌগিক পদার্থ আফগানিস্থান থেকে আনীত হত বলে মনে হয়।

যেডাইট (Jadeite) নামক পাথরের অস্তিত্ব মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে পণ্য আদান-প্রদান নির্দেশ করে। ম্যাকের মতে আমরা মানস নেত্রে দেখতে পারি যে সিন্ধু উপত্যকার বিভিন্ন শহরে অনবরত বহু সার্থ আসছে এবং শহর থেকে বহু সার্থ অনবরত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাচ্ছে। 'শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় মোঅন্‌জোদড়ো হইতে সিন্ধু প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের সীমা পর্যন্ত প্রাগৈতিহাসিকযুগের বহু স্তূপ ও সার্থবাহ পথ (Caravan Route) আবিষ্কার করেছেন' (গোস্বামী)। শুধু যে স্থলপথই বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হত তা নয়—ম্যাকের মতে খুব সম্ভবত সমুদ্রপথও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত।

মোঅন্‌জোদড়োতে বহু পাথরের বাটখাবা এবং ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরি ওজন-যন্ত্র পাওয়া গিয়েছে। এই বহু পাথরের বাটখারার মধ্যে মাত্র সামান্য দু-চারটির ওজন ঠিক নয়। এ থেকে ম্যাকে অনুমান করেন যে এই শহরের বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়মকানুন খুব কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত হত। যে কোনো কারণেই হোক অধিকাংশ বাটখারার ওজনের পরিমাণ ঠিক থাকা ব্যবসায়ীদের সততার পরিচায়ক।

এখন সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত জিনিস সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব। নতুবা এই সভ্যতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া অসম্ভব।

আগেই বলেছি এ অঞ্চলের অধিবাসীরা আজকালকার মতো উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবন যাপন করত। তাদের থাকবার ঘর ছিল পাকা ইটের এবং অত্যন্ত মনোরম। হরপ্পা ও মোঅন্‌জোদড়োর দুটি দালান সম্বন্ধে সামান্য আভাস দিতে চাই। ইট-চোরদের দৌরাত্ম্যে হরপ্পার দালানটির অনেকটা অঙ্গহানি হয়েছে এটা খুবই দুঃখের বিষয়। 'বর্তমানে সেটি উত্তর-দক্ষিণে ১৬৮ ফুট লম্বা এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৩৪ ফুট চওড়া। সম্পূর্ণভাবে খনন কার্য সমাধা হলে হয়তো আরো বৃহত্তর বলে প্রমাণিত হতে পারে। কি উদ্দেশ্যে এ দালান তৈরি হয়েছিল তা জানা যায়নি, তবে এটি একটি বড় গুদামঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে' (ম্যাকে)।

মোঅন্‌জোদড়োতে যে সমস্ত বাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ৩৯ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, ২৩ ফুট ২ ইঞ্চি চওড়া এবং ৮ ফুট গভীর পাকা ইটের তৈরি একটা সন্তরণ-বাপী-সম্পন্ন দালান একটি আশ্চর্য জিনিস। এটি জলক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর। 'এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব

চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত বিশেষজ্ঞও ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নিচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে-ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে ৩।৭ ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটে গাঁথুনী দেওয়া হইয়াছিল, এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁতসেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর (bitumen) প্রলেপ দিয়া, যাহাতে ইহা গড়াইয়া না পড়িতে পারে তজ্জন্য এক সার মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বাহিরে অল্প দূরে চতুর্দিক ঘেরিয়া আর একটি পাকা দেয়াল আছে।······এই স্নানাগারে প্রবাহের জন্য বাহিরের প্রাচীরের উত্তর দিকে একটি, দক্ষিণ দিকে দুইটি ও পূর্বে অন্তত একটি দ্বার ছিল। পশ্চিম দিকেও হয়তো প্রবেশ পথ ছিল, কিন্তু ঐ দিকের প্রাচীরের অস্তিত্বও লোপ হওয়ায় এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা কঠিন' (গোস্বামী)।

দালান-বাড়ি, রাস্তা, ড্রেন প্রভৃতির পরে ধাতু ও মাটির তৈরি বিভিন্ন জিনিস এবং অসংখ্য শীলমোহর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ধাতু—মোঅন্‌জোদড়োতে সোনা, রুপো, তামা, সীসা ও ব্রোঞ্জ পাওয়া গিয়েছে।

মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুই শহরেই সোনার বিবিধ অলঙ্কার আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈদিকযুগে সোনাকে 'হিরণ্য' বলত। ঋগ্বেদে সিন্ধুনদীকে হিরণ্যয়ী হিরণ্যবর্তিনী প্রভৃতি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে। এ থেকে মনে হয় সিন্ধুসৈকত থেকে হয়তো সোনা সংগৃহীত হত। অবশ্য একথা নিশ্চিত করে বলা শক্ত। দাক্ষিণাত্য থেকে সোনা আসা সম্ভবপর এ কথা আগেই বলেছি। উভয়স্থানেই স্বর্ণকারের শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল, বিশেষ করে হরপ্পার স্বর্ণকারেরা সূক্ষ্ম কার্যে দক্ষ ছিল।

সোনার চেয়ে রুপোই মোঅন্‌জোদড়োতে অধিক পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। এটা স্বাভাবিক। এই রুপো কোথা থেকে আমদানী হত তা বলা যায় না। মূল্যবান্ অলঙ্কার রুপো বা তামার পাত্রে রাখা হত। খুব ধনীর ঘরে হয়তো রুপোর বাসনও ব্যবহৃত হত। তবে শাদাসিধে তিনটি রুপোর পাত্র ছাড়া

অন্যান্য যে সব বাসন পাওয়া গিয়েছে সমস্তই তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি। তামা ও ব্রোঞ্জের নানা প্রকারের জিনিস প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইট দিয়ে গাঁথুনি করা একটি গর্তে যথেষ্ট পরিমাণে তামার প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ পাওয়া গিয়েছে বলে মনে হয় তামা প্রস্তুতের জন্য তা ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ পর্যন্ত তামা প্রস্তুতের কোনো চুল্লি পাওয়া যায়নি। ম্যাকের মতে এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক নয় যে মাক্ষিক ও অঙ্গার সংযুক্ত করে সাধারণ চুলায় উত্তাপ দিয়ে তামা প্রস্তুত করা হত, কারণ এক-একটি পাঁচ পোয়া ওজনের কয়েকটি তামার পিণ্ড (Ingot) পাওয়া গিয়েছে। তামার জিনিসের সঙ্গে পাশাপাশি ব্রোঞ্জের জিনিসও পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু পরিমাণে তামার জিনিসই বেশি। এখানকার ব্রোঞ্জ তামা ও টিনের মিশ্র ধাতু, কিন্তু পৃথকভাবে টিন পাওয়া যায়নি। কাজেই মনে হয় ব্রোঞ্জ এখানে তৈরি হত না, অন্যস্থান থেকে আমদানী হত। তবে কোথা থেকে আমদানী হত সে সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এখানকার ব্রোঞ্জে নির্দিষ্ট পরিমাণ টিন থাকতো না। 'মোহেন-জোদড়োর ব্রোঞ্জে টিনের পরিমাণ শতকরা ৬'১৩ ভাগ' (গোস্বামী)। ম্যাকে একটি ব্রোঞ্জের জিনিসে টিনের পরিমাণ শতকরা ২২'২ ভাগ বলে উল্লেখ করেছেন।

তামা ও আর্সেনিকের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জের চেয়ে একটু নরম মিশ্র ধাতুর ব্যবহারও মোহেন্‌জোদড়োতে প্রচলিত ছিল। এই মিশ্রধাতুতে আর্সেনিকের পরিমাণ শতকরা ৩-৪½ ভাগ।

সীসা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়নি, সীসার টুকরা এবং একটি সীসার পাত্র পাওয়া গিয়েছে।

তামার চেয়ে ব্রোঞ্জ বেশি শক্ত, কাজেই যুদ্ধের অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে ব্রোঞ্জই বেশি উপযোগী। ব্রোঞ্জের কুঠার, খড়্গ, বর্শা, করাত, ক্ষুর প্রভৃতি যন্ত্রপাতি এবং মাছ ধরবার ছোট-বড় বড়শি বহু পাওয়া গিয়েছে। মনে হয় অনেকেই মাছ ধরতো এবং মাছ সর্বসাধারণের খাদ্য ছিল।

যন্ত্রপাতির মধ্যে ১৬½ ইঞ্চি লম্বা একটি ব্রোঞ্জের দাঁত বিশিষ্ট করাত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রোমকদের আগে এই জাতীয় দাঁত বিশিষ্ট করাতের ব্যবহার জগতে জানা ছিল না। এত প্রাচীনকালের অথচ এমন সুন্দরভাবে রক্ষিত করাতটি বাস্তবিকই খুব চমৎকার। আগে এর কাঠের হাতল ছিল কিন্তু তা নষ্ট

হয়ে গিয়েছে। ব্রোঞ্জের কোনো তরোয়াল পাওয়া যায়নি, কিন্তু মোঅন্‌জো-দড়োতে দুখানা তামার তরোয়ালের প্রাপ্তির উল্লেখ ম্যাকে করেছেন, তার মধ্যে বড়খানা ১৮২ ইঞ্চি লম্বা।

ব্রোঞ্জের দর্পণ বেশ প্রচলিত ছিল। ব্রোঞ্জের ঢালাই কাজও শিল্পীরা জানত। ঢালাই করা ব্রোঞ্জের একটি নর্তকীমূর্তি ঢালাইকার্যের একটি সর্বাঙ্গ-সুন্দর নমুনা। তামা ও ব্রোঞ্জের পানপাত্র, মালসা, হাঁড়ি, কলসী, কড়া, থালা ও ঢাকনি প্রভৃতি তৈরি হত। এ সবই শিল্পীদের নিপুণ হাতের পরিচায়ক। তামা ও ব্রোঞ্জের ছুঁচ পাওয়া থেকে মনে হয় সেলাইর কাজও চলত।

মাটির পাত্র—হরপ্পা ও মোঅন্‌জোদড়োতে নানাপ্রকারের অসংখ্য মাটির পাত্র পাওয়া গিয়েছে। দু-জায়গারই পাত্রগুলি একই ধরনের। হাঁড়ি, কলসী, শরা, মটকী, গেলাশ, পেয়ালা, থালা, বাটি, চামচ, ঘট, ঢাকনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রধানত কুমোরের চাকের সাহায্যে এই সব মাটির পাত্র তৈরি হত। হাতে তৈরি জিনিসের সংখ্যা কম। কুমোরের চাক পাওয়া যায়নি। কাঠের জিনিস দীর্ঘকাল মাটির নিচে থাকায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু কুমোরের পোণ বা ভাটির অস্তিত্ব বর্তমান আছে। এই সমস্ত মাটির পাত্র কাঁচা হাতের তৈরি নয়। কুমোরের শিল্প দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার ফলে শিল্পীরা যে অভিজ্ঞতা ও কলানৈপুণ্য লাভ করেছিল, প্রাপ্ত জিনিসগুলি তার সুস্পষ্ট নিদর্শন। শুধু যে সাধারণ রকমের মাটির পাত্রই তৈরি হত তা নয়, কাচের মতো চকচকে ও মসৃণ পাত্রও তৈরি হত। এ ধরনের মাটির পাত্র পৃথিবীর মধ্যে এখানেই সর্বপ্রথম তৈরি হয়েছিল।

উপরোক্ত জিনিসগুলি যেমন তৈরি হত, ছেলেদের আমোদের ও খেলার জন্য মাটি দিয়ে মানুষ, গরু, মহিষ, ভেড়া, বানর, শূকর, মুরগি, পাখি, মার্বেল ও গাড়ি প্রভৃতিও তৈরি হত। আবার সাধারণ সাদাসিধে পাত্রের মতো রঙিন এবং চিত্রিত মাটির পাত্রও তৈরি হত। সাধারণত মাটির পাত্রগুলি লাল করে পোড়ানো হত। পাত্র তৈরি শেষ হলে বাইরের দিকে লাল কিংবা সামান্য হলদে রঙ লাগিয়ে স্বাভাবিক লালকে আরো উজ্জল লাল অথবা হলদে আভাযুক্ত লাল করা হত।

মোঅনজোদড়োর রঙিন মাটির পাত্রে মোটামুটি দুই প্রকারের চিত্র দেখতে

পাওয়া যায়: (১) জ্যামিতিক, (২) ফল, ফুল, পশু, পাখি, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিস মানুষ সচরাচর দেখে। জ্যামিতিক চিত্রের মধ্যে সরলরেখা, বক্ররেখা, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত প্রভৃতি আছে—এমন কি পাত্রের গায়ে পরস্পব-ছেদক বৃত্তও বর্তমান আছে। ময়ূর, পদ্ম, সাপ, বৃষ, হরিণ প্রভৃতির চিত্রও আছে।

শীলমোহর—মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা এই দুই স্থানেই বহু শীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। ম্যাকের মতে এই শীলমোহর সমূহ সিন্ধু উপত্যকা-বাসীদের অতি উত্তম কলানৈপুণ্যেব পরিচায়ক। অধিকাংশ শীলমোহরই নরম পাথরেব তৈরি। পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ ও কালো মর্মর প্রভৃতির শীল-মোহরও আছে। এই শীলমোহরগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (১) লেখযুক্ত, (২) চিত্রযুক্ত, (৩) লেখ ও চিত্র উভয়যুক্ত। বহু পণ্ডিতের অশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও লেখযুক্ত শীলমোহরের পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভবপর হয়নি। লিপি ও ভাষা উভয়ই বর্তমানে দুর্বোধ্য। কে জানে এই সব শীলমোহরের পাঠোদ্ধার প্রাচীন ভাবতের ইতিহাসের উপর কত নূতন আলোক সম্পাত করবে।

চিত্রযুক্ত শীলমোহরের মধ্যে অধিকাংশ শীলমোহরে এক শৃঙ্গযুক্ত পশুর (Unicorn) ছবি অঙ্কিত রয়েছে। এটি মনগড়া কোনো জীবের ছবি বা কোনো জিনিসের প্রতীক স্বরূপ, কারণ এরকম কোনো জীবের অস্তিত্বের প্রমাণ এ পর্যন্ত জগতে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া বহু জন্তুর চিত্র আছে, যথা ককুদ্মান বৃষ, হাতি, মহিষ, হরিণ, গণ্ডার, বাঘ, ছাগল, ঘড়িয়াল, কুমির প্রভৃতি। কিন্তু সিংহের চিত্র নেই। মানুষের মূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। ম্যাকের মতে ককুদ্মান বৃষের চিত্র সুন্দর কারুকার্যেব উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 'শীলমোহরের হাতি এবং ককুদ্মান বৃষ বিশেষভাবে শিল্পীর মনযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল, ইহাদের চিত্র নিখুঁত' (গোস্বামী)। নানারূপ অদ্ভুত কল্পিত প্রাণীর চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। মেষের দেহে মানুষের মুখ, গরুর শিং ও হাতির দাঁত যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

তামা ও ব্রোঞ্জের পাতে-আঁকা চিত্রগুলি পাথরে-আঁকা চিত্রের মতো উচ্চাঙ্গের নয়। একটি শীলমোহরে বাঘ, হাতি, গণ্ডার, মহিষ ও হরিণ পরিবেষ্টিত যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

ধাতু ও মাটির পাত্র এবং শীলমোহরই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও অন্যান্য যেসব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলিও ঐ অঞ্চলের সভ্যতার ধারণা দিতে সাহায্য করে। মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা দু-জায়গাতেই স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু কোনো দেবমন্দিরের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

নানারকম মাছ, ছাগল, শূকর, ভেড়া, কচ্ছপ ও মুরগির হাড় পাওয়া গিয়েছে। অতএব তারা যে মাছ-মাংস খেত তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এ ছাড়া যব, গম, তরমুজ ও খেজুরের বীচিও পাওয়া গিয়েছে। সুতো কাটার অসংখ্য টেকো এবং কার্পাস বস্ত্রের টুকরো পাওয়াতে মনে হয় কার্পাস-বস্ত্র-শিল্প সুপ্রচলিত ছিল। হাতির দাঁতের চিরুনি ও অন্যান্য জিনিস প্রাপ্তির কথা আগে উল্লেখ করেছি। মনে হয় হাতির দাঁতের নানাপ্রকার জিনিস মোঅন্‌জোদড়োতেই তৈরি হত। শুধু যে হাতির দাঁতই সেখানে পাওয়া গিয়েছে তা নয়, করাত দিয়ে অর্ধেক কাটা হাতির দাঁতের খণ্ডও আবিষ্কৃত হয়েছে। হাতির দাঁতের পাশা—খেলার জন্য ব্যবহৃত হত। খেলার মার্বেলও পাওয়া গিয়েছে। এই মার্বেল অ্যাগেট (Agate) নামক শক্ত পাথরেও তৈরি হত।

মেয়েদের প্রসাধন দ্রব্যের মধ্যে মুখে ব্যবহারের জন্য সফেদা (Lead acetate) নামক শাদা পাউডার এবং সিঁদুর পাওয়া গিয়েছে।

ঐ অঞ্চলের মৃতসংকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ তা বৈদিক বা আর্য সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ে কতকটা সাহায্য করে।

ম্যাকের মতে মৃত মানুষের অস্থি কঙ্কাল প্রভৃতি এ পর্যন্ত যা পাওয়া গিয়েছে তা সংখ্যায় মোটেই বেশি নয়। মার্শাল তাঁর পুস্তকে মোঅন্‌জোদড়োতে প্রাপ্ত নরকঙ্কাল ও নরকপাল প্রভৃতির সংখ্যা সর্বসমেত ২৬টি বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ পুস্তক লেখার পর আরো কয়েকটি আবিষ্কৃত হয়েছে। হরপ্পাতে মানুষের মস্তক ও অস্থিপূর্ণ শতাধিক মাটির পাত্র ভূগর্ভ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

এত অল্পসংখ্যক অস্থি কঙ্কাল প্রভৃতি প্রাপ্তি থেকে মনে হয় আগুনে পোড়ানোই মৃতসংকারের সাধারণ ব্যবস্থা ছিল। ম্যাকের মতে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা মৃতদেহ দাহ করত এবং চিতাভস্ম জলে নিক্ষেপ করত। এটা বর্তমানে বাঙলাদেশে মৃতদেহ সংকারের অনুরূপ। মার্শালের মতেও খুব সম্ভবত মৃত-দাহই সাধারণ প্রথা ছিল।

মোঅন্‌জোদড়ো ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে

লোকজন আসত। অতএব এই অল্পসংখ্যক মানুষের অস্থি ও কঙ্কাল যে ভিন্ন স্থানের লোকের নয়, ওখানকার অধিবাসীদের একথা জোর করে বলা শক্ত। তার উপরে ১৪টি মানুষের কঙ্কাল একই কামরায় পাওয়া গিয়েছে। কোনো আকস্মিক ঘটনায় হয়তো ঐ ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল এবং তা মৃতদেহের সমাধি নাও হতে পারে।

মোঅন্‌জোদড়ো সম্বন্ধে সন্দেহ হলেও হরপ্পা এবং বেলুচিস্থানের নাল নামক স্থানের প্রাপ্ত কঙ্কাল ও অস্থি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত যে সাধারণ প্রথা মৃতদাহ হলেও সিন্ধু উপত্যকায় সম্পূর্ণ ও আংশিক সমাধির প্রথাও প্রচলিত ছিল।

সিন্ধু উপত্যকার এই সভ্যতা মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পা প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকেই হয়েছিল বলে মনে হয়। হঠাৎ একদল লোক এসে এরূপ শিল্প বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থানীয় সুকল্পিত শহর গড়ে ফেলল তা মোটেই সম্ভবপর নয়। অনেকদিন ধরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যার পরিণতি এই দুটি ও অন্যান্য শহর। এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে এই সভ্যতার মূল কোথায়? তা কি দ্রাবিড়ী সভ্যতা, সমসাময়িক মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতা অথবা বৈদিক বা আর্য সভ্যতার অঙ্গস্বরূপ, না কোনো পৃথক সভ্যতা?

অস্থিকঙ্কাল পরীক্ষা করে মোঅন্‌জোদড়োতে যেরকম আকৃতিবিশিষ্ট লোক ছিল বলে নির্ণীত হয়েছে সেরকম আকৃতিবিশিষ্ট লোক দ্রাবিড়ী ভাষা-ভাষীদের (তেলেগু, মালায়ালাম্) মধ্যে দেখা যায়। কাজেই কেউ কেউ মনে করেন এই সভ্যতা দ্রাবিড়ী সভ্যতা। এ ছাড়া বেলুচিস্থানে দ্রাবিড়ী ভাষার অনুরূপ ব্রাহুই নামক এক ভাষার অস্তিত্ব বর্তমান। এ থেকে অনুমিত হয়েছে যে মোঅন্‌জোদড়ো প্রভৃতি স্থান দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার কেন্দ্র ছিল, আর্যদের কাছে পরাজিত হয়ে দ্রাবিড়রা বেলুচিস্থানের দিকে এবং দক্ষিণ ভারতে চলে যায়। বেলুচিস্থানের ব্রাহুইভাষা পূর্বগরিমার স্মৃতিটুকু বক্ষে ধারণ করে আছে মাত্র। মোঅন্‌জোদড়োতে যে সামান্য কয়টি নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছানো যুক্তিযুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের যোগাযোগ থাকায় ওখানে সেই অঞ্চলের কয়েকজন লোকের অস্তিত্ব মোটেই অস্বাভাবিক নয়। অতএব এই সামান্য প্রমাণের উপর মোঅন্‌জোদড়োর অধিবাসীরা দ্রাবিড়ী ছিল, এ-কথা বলা সমর্থনযোগ্য নয়।

ব্রাহুই ও দ্রাবিড়ী ভাষার সাদৃশ্যকে ভিত্তি করে অন্য কোনো প্রমাণ ছাড়া এত বড় একটা জিনিস দাঁড় করানো কল্পনার আতিশয্য বলে মনে হয়। কাজেই মোঅন্‌জোদড়োর সভ্যতা যে দ্রাবিড়ী সভ্যতা ছিল এ-কথা বলা চলে না।

এটা সর্ববাদীসম্মত যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা সমসাময়িক এলাম ও সুমেরীয় সভ্যতার চেয়ে উন্নততর ছিল, কাজেই তা মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার অঙ্গ-স্বরূপ এ-কথা বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন একই জাতীয় লোক কোনো এক কেন্দ্র থেকে পশ্চিমে মেসোপোটেমিয়া এবং পূর্বে সিন্ধু উপত্যকায় গিয়ে দুই সভ্যতা স্থাপন করে; কাজেই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু একটি যে অন্যটির চেয়ে উন্নততর, এই ধারণার পিছনেও নিছক কল্পনা ছাড়া কোনো প্রমাণ নেই।

এখন বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার কি সম্পর্ক তা একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।

মার্শাল ও ম্যাকের মতে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা প্রাগ্‌বৈদিক, কারণ তা খৃষ্টের জন্মের প্রায় তিন হাজার বছর আগেকার এবং আর্যরা খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ বছরের কাছাকাছি কোনো সময়ে ভারতবর্ষে আসে। এই সিদ্ধান্তের গোড়াকার কথা আর্যদের ভারত আগমন এবং তার তারিখ। যদি তাদের ভারত আগমন বা তারিখ সম্বন্ধীয় মত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে উভয় পণ্ডিতের মত ভ্রান্ত বলেই গণ্য হবে। উপরোক্ত দুই বিষয়ের কোনোটিই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়নি, অতএব তাকে যুক্তিরূপে গ্রহণ করা কোনো রকমেই সঙ্গত নয়। বিশেষ করে বৈদিকযুগের তারিখ খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। প্রথমে ম্যাক্সমুলার কেবলমাত্র আন্দাজের উপর নির্ভর করে বলেন যে, বৈদিকযুগ খৃষ্টপূর্ব ১০০০-১২০০ অব্দ। যদিও এই মত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে তবুও মার্শাল ও ম্যাকে ঐ মত অবলম্বন করেই এরূপ যুক্তি দিয়েছেন। ভিনটারনিট্‌সের মতে এক অনিশ্চিত অতীতকাল থেকে খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত বৈদিকযুগ বলে ধরা যেতে পারে এবং এই অনিশ্চিত কাল সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্র বর্ষ। তিলকের মতে ঋগ্বেদ খৃষ্টের প্রায় ৪৫০০ বৎসর পূর্ববর্তী। অতএব সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ নয় তা শুধু উভয়ের কালধারা মোটেই নির্ণীত হয় না; বরং তা যে বৈদিক সভ্যতার অঙ্গ হওয়া অসম্ভব নয় তা-ই স্থির হয়।

সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা তাম্রপ্রস্তর যুগের। বৈদিক সভ্যতাও তাম্রপ্রস্তর যুগের বলেই মনে হয়। বেদে পাথরের তীরের উল্লেখ আছে। মোঅন্‌জো-দড়োর অধিবাসীদের মতো বৈদিক আর্যরা সোনা, রুপোর অলঙ্কার ব্যবহার করতো। বেদে অয়স্‌ শব্দের উল্লেখ আছে; কিন্তু অয়স্‌ শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সে-বিষয়ে মতবৈধ আছে। অয়স্‌ বলতে লোহা বোঝায় কিনা তা বলা যায় না। জার্মান পণ্ডিত টিস্‌মার অয়স্‌ শব্দের অর্থ ব্রোঞ্জ বলে গ্রহণ করেছেন। কাশীনাথ দীক্ষিতের মতে বৈদিক সভ্যতায় যজ্ঞপাত্র তৈরির জন্য তামাকে উপযুক্ত উপাদানস্বরূপ ব্যবহার করায় (যে ধারণা বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রচলিত) এই-ই প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক সভ্যতার বাহকরা সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পূজারীদের সঙ্গে একই অবস্থায় সিন্ধু উপত্যকায় এসেছিল।

মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় পাকা ইটের দালান ছিল, ঋগ্বেদেও অট্টালিকার উল্লেখ আছে।

মোঅন্‌জোদড়োর অধিবাসীরাও বৈদিক আর্যদের মতো শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য তীর, ধনুক, বর্শা, ছোরা ও কুঠার ব্যবহার করত। কিন্তু আর্যদের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ ও কবচ মোঅন্‌জোদড়োতে আবিষ্কৃত হয়নি।

কৃষ্ণগোবিন্দ গোস্বামীর মতে বৈদিক আর্যরা মাংস খেত, কিন্তু মাছ খেত না। অথচ মোঅন্‌জোদড়োর লোকদের মাছ প্রতিদিনের খাদ্য ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু স্বামী শঙ্করানন্দের মতে ঋগ্বেদে যজ্ঞের সম্পর্কে বারবার মাছের উল্লেখ আছে। তাঁর মতে বৈদিক আর্যরা অবশ্যই মাছ খেত।

মার্শালের মতে সিন্ধু উপত্যকার মৃতসৎকারের ব্যবস্থা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজস্ব। কিন্তু এ মত ঠিক নয়। বরং তা 'বৈদিক হিন্দুদের মৃতসৎকারের ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ একরূপ। ঐ অঞ্চলে অধিকাংশ মৃতদেহ দাহ করা হত। তাছাড়া পূর্ণসমাধি এবং আংশিক সমাধির প্রথাও বর্তমান ছিল। এখন দেখা যাক বৈদিক হিন্দুদের মধ্যে কি প্রথা বর্তমান ছিল।

ঋগ্বেদে পূর্ণসমাধি এবং দাহ এই উভয় প্রথারই উল্লেখ আছে। মনে হয় পূর্ণসমাধি দেওয়ার প্রথা প্রথমে ছিল, পরবর্তীকালে তার বদলে দাহ করবার প্রথা গৃহীত হয়েছে। কাজেই বৈদিক হিন্দুদের আবাসস্থল পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পায় সমাধির অস্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আজও বাঙলাদেশে যদিও মৃতদেহ

দাহ করাই সাধারণ নিয়ম, তবুও সাধুদের ও শিশুদের সমাধি দেওয়ার প্রথা আছে।

অশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে দাহ করার পর অস্থিসমাধির পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। এটা স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে, প্রথম মৃতদেহ দাহ করা হবে, তারপর কোনো পাত্রে মৃতের অস্থি এক এক করে শব্দ না করে আস্তে আস্তে রাখবে। প্রথমে পায়ের হাড় এবং সর্বশেষে মাথার হাড রাখবার ব্যবস্থা। তারপর পাত্রকে ঢাকনি দিয়ে ঢেকে গর্তে রাখবে এবং গর্ত মাটি দিয়ে পূরণ করবে। মার্শাল বর্ণিত আংশিক সমাধি দেওয়ার প্রথার সঙ্গে এই প্রথা হুবহু এক। ডাক্তাব ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সিন্ধু উপত্যকার মৃতসংকারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে মার্শাল বর্ণিত সিন্ধু উপত্যকার মৃতসংকাবের ব্যবস্থা ও বৈদিক আর্যদের ব্যবস্থা একই রকমের ছিল।

বহু মাটির পাত্র সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার বিশেষত্ব। বৈদিকযুগেও বহু-প্রকারের মাটির পাত্র ব্যবহৃত হত। 'সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত মৃৎপাত্রের ন্যায় বহু পাত্রই বৈদিকযুগে যাগযজ্ঞ কিংবা দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। প্রায় ৩০।৪০ প্রকারের পাত্র বৈদিক ঋষিরা ব্যবহার করিতেন' (গোস্বামী)। মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব না পাওয়াতে ম্যাকে আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এ অঞ্চলের সভ্যতার সঙ্গে মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলের সভ্যতার সাদৃশ্য দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন হয়তো উভয় সভ্যতা একজাতীয় লোকের দ্বারা সৃষ্ট তাঁদের পক্ষে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কারণ আছে, যেহেতু মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে বড় বড় মন্দির ছিল। বৈদিকযুগে আর্যদের কোনো মন্দির ছিল না। অতএব তা বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্যমূলক।

বৈদিক আর্যদের অনেক ইউবোপীয় পণ্ডিত ইউরোপীয় 'নর্ডিক' জাতির মতোই আকৃতি বিশিষ্ট বলে মনে করেন। কিন্তু সেরকম আকৃতি বিশিষ্ট কোনো নরকঙ্কাল সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কৃত হয়নি। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এ বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন যে বৈদিক আর্যরা যে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার অংশ স্বরূপ এর বিরুদ্ধে ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত কঙ্কালের গঠনের যুক্তি প্রয়োগ করা যায় না।

বৈদিক আর্যরা কোনো এক বিশিষ্ট শারীরিক গঠন যুক্ত জাতি মোটেই ছিল না। আর্য শব্দ কৃষ্টিবাচক, জাতিবাচক নয়। প্রাচীনকালে বৈদিক আর্যরা

বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল এবং এই বিভিন্ন গোত্রের লোকের শরীরের গঠনের তারতম্য থাকা খুবই সম্ভবপর। ক্রমে ক্রমে ঐ সমস্ত গোত্রের লোকেরা এক সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং তাই-ই বৈদিক বা আর্য সভ্যতা। ভারতীয় আর্যরা যে ইউরোপীয় নর্ডিক জাতির অন্তর্ভুক্ত এর কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। টিস্মারের মতে বৈদিক আর্যদের আদি নিবাস যে ভারতবর্ষের বাইরে এর কোনো প্রমাণ বেদে নেই।

মার্শালের মতে এই সভ্যতা কোনো জাতিবিশেষেব সৃষ্ট নয়। বিভিন্ন জাতির সমবেত চেষ্টার ফলে এই বিরাট সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক সভ্যতাও আমাব মনে হয় বিভিন্ন জাতির সমবেত চেষ্টারই ফল।

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের ধর্মমত কি ছিল সে বিষযেও আলোচনা প্রয়োজন।

মোঅন্‌জোদড়ো ও হরপ্পায় মন্দির না থাকার উল্লেখ করেছি। তা বৈদিক সভ্যতারই অনুরূপ।

মার্শালের মতে ধর্ম সম্বন্ধীয় যে সমস্ত উপাদান উভয়স্থানে পাওয়া গিয়েছে তা বিশেষভাবে ভারতীয়। তবুও একথা বলা যেতে পারে যে তা বৈদিক ধর্ম নয়, ঐ ধর্ম পরবর্তীকালে বৈদিক ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করার ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তারই ফল স্বরূপ এই সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। উভয় স্থানে যে সমস্ত জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে সেখানকার অধিবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর নয়। উভয় স্থানে অসংখ্য মাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ঐ সব মূর্তি যে উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হত তার কোনো প্রমাণ নেই। মার্শাল এমন কি জানোয়ার ও গাছ পূজা হত বলে মনে করেন। বিভিন্ন জানোয়ারের মাটির মূর্তি পাওয়াতেই তিনি এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। ঢাকা জিলার লাঙ্গলবন্ধ স্নানের সময় যে মেলা হয় তাতে মাটির তৈরি বহু ঘোড়া বিক্রি হয়। যাত্রীরা বাড়ির ছোট ছেলেদের খেলার জন্যই তা কিনত। কিন্তু তা থেকে কেউ যদি সিদ্ধান্ত করেন যে সে অঞ্চলের লোকে ঘোড়া পূজা করে তবে তা নিতান্তই হাস্যকর হবে। মার্শালের সিদ্ধান্তের পিছনে কোনো যুক্তি নেই। ঐ সমস্ত মাটির মূর্তি ছেলেদের খেলার জন্য তৈরি হয়ে থাকতে পারে।

এই উভয় স্থানেই দাবা পাশা খেলার গুটির মতো আকৃতি বিশিষ্ট পাথর ও

মাটির তৈরি ছোট-বড় ও সংখ্যায় বহু, জিনিস পাওয়া গিয়েছে। যদিও ঐগুলি ঠিক ঠিক লিঙ্গাকৃতি নয় তবু সেগুলি লিঙ্গপূজার নিদর্শন বলে অনেকে মনে করেন। মোঅন্‌জোদড়োতেও পাশা ও চতুরঙ্গ খেলা সর্বজন প্রচলিত ছিল। ছোটগুলি সবই খেলার গুটি হতে পারে। যদি ধরে নেওয়া যায় ঐগুলি খেলার গুটি নয়, পূজার বস্তু, তাহলেও এটি সুস্পষ্ট যে ঐগুলি জননেন্দ্রিয় নয়, অতএব উহা শিশ্ন পূজার নিদর্শন নয়। মার্শাল নিজেই স্বীকার করেন যে ঐগুলির আকৃতি এমন যে সেগুলিকে জননেন্দ্রিয় বলে ধরা শক্ত। লিঙ্গ বা প্রতীক উপাসনার জন্য ঐগুলি ব্যবহৃত হওয়া অসম্ভব নয়। যোগাসনে উপবিষ্ট এক শিবমূর্তি মোঅন্‌জোদড়োর এক শীলমোহরে আছে বলে অনুমিত হয়। ঐগুলি শিবলিঙ্গ বা শিবের প্রতীক উপাসনার চিহ্ন হতে পারে। বেদে শিবের উপাসনার কথা নেই, কিন্তু রুদ্র বৈদিক দেবতা।

আমরা আগে বলেছি ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্মের মূল ভিত্তি ঠিক রেখে হিন্দুধর্মে চিরকালই নানারকম পরিবর্তন হয়েছে। ঋগ্বেদের সময়ে ঐ গ্রন্থে যা উল্লেখ আছে তার বাইরে যে কোনো প্রকারের ধর্মকার্য অনুষ্ঠিত হত না একথা কেউ বলতে পারে না। বৈদিক যুগে ততটা আদৃত না হলেও শিবের উপাসনা প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়। এবং ক্রমে তা হিন্দুধর্মের মধ্যে বিধিমতো স্থান লাভ করে। অবশ্য এটা অনুমান মাত্র। বেদে স্ত্রীদেবতার স্থান পুংদেবতাদের নিচে। কিন্তু তাই বলে স্ত্রীমূর্তির প্রাপ্তিই বৈদিক সভ্যতার বিরোধী হয় না। উভয় স্থানেই স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এ চিহ্ন আর্য সভ্যতার নিদর্শন। বেদে অশ্বের উল্লেখ বহুবার রয়েছে। কিন্তু মোঅন্‌জোদড়োর উপরের স্তরে মাত্র এক জায়গায় অশ্বের কতকগুলি অস্থি পাওয়া গিয়েছে। এইগুলি আধুনিক-কালের বলে কেউ কেউ সন্দেহ করেন। এ ভিন্ন আর কোথাও অশ্বের অস্থি পাওয়া যায়নি।

মোট কথা বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে সিন্ধু উপত্যকার অনেক সাদৃশ্য বর্তমান। কিন্তু সেটি যে বৈদিক সভ্যতারই অংশ বা ক্রমোন্নতি বিশেষ একথা জোর করে বলা যায় না। শীলমোহরের লেখাগুলির পাঠোদ্ধার হলে হয়তো এ বিষয়ে সত্য আবিষ্কৃত হতে পারে।



নবম পরিচ্ছেদ

বৃহত্তর ভারত

এই অধ্যায়ে ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার এবং ভারতীয়দের উপনিবেশ স্থাপনের এক গরিমাময় কাহিনীর কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করব। উত্তরে বিশাল হিমালয় পর্বত আর তিনদিকে উত্তাল সমুদ্র ভারত-বাসীর কর্মপ্রচেষ্টা ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখেনি। সকল বাধাবিঘ্ন, ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে সে আপনাকে বিকশিত করার চেষ্টা করেছে। সে এক অসীম ত্যাগ, সাধনা, সাহস, বীর্য ও কর্মকুশলতার ইতিহাস। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে সে ইতিহাসের অধিকাংশই আজ লোকচক্ষুর অন্তরালে—কালের অন্তরালে—কালের অতল গর্ভে লীন। বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের অশেষ চেষ্টার ফলে যে সামান্য অংশ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার মহিমাতেই আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে, আর বারম্বার মনে হয় বিধাতার কি অভিশাপেই না তাদের বংশধরদের বর্তমান এই দুরবস্থা।

মনুস্মৃতিতে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ—এই ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু মনুর সময়ে, তাঁর পূর্ব বা পরবর্তী কয়েকশত বৎসর ধরে অগণিত ভারতবাসী সমুদ্রপথে যাতায়াত করত। মনুর প্রতিমাপূজা নিষেধের ব্যবস্থার মতো এ ব্যবস্থাও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা অগ্রাহ্য করেছে। বাঙলা, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিল, মালাবার, গুজরাট প্রভৃতি সমুদ্র উপকূলের সকল প্রদেশের লোকই অবাধে

যাতায়াত করত। শুধু বণিকরাই যে বাণিজ্য করে ভারতের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করেছেন তা নয়, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ যোদ্ধারা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, অসংখ্য ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ ভারতীয় ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন, শিল্পীরা কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সিলভাঁ লেভির মতে পারস্য থেকে চীন-সাগর, বরফে ঢাকা সাইবিরিয়া অঞ্চল থেকে যবদ্বীপ ও বোর্নিও, ওসেনিয়া থেকে সকোত্রা পর্যন্ত ভারতবর্ষ তার ধর্মমত, তার প্রতিভা ও সভ্যতা বিস্তার করেছে; বহু শতাব্দী ধরে সমস্ত পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ মানব মনের উপর এমন ছাপ এঁকেছে যা মুছে ফেলা যায় না।

ভারতীয় উপনিবেশগুলির বিস্তৃতি নিতান্ত কম ছিল না। চম্পা (বর্তমান আনামের অধিকাংশ), কাম্বোজ (বর্তমান কাম্বোডিয়া), শ্যামের দক্ষিণাংশ, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যব ও বলীদ্বীপ, বোর্নিও, সিংহল ও খোটান এক সময় ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। ফিলিপাইন ও মাদাগাস্কর দ্বীপও অল্প সময়ের জন্য ভারতীয় উপনিবেশ ছিল এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক নয়। অর্থাৎ এক সময়ে ভারতবর্ষ তার শৌর্য, বীর্য ও রাজনৈতিক প্রতিভার বেশ পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু চার্লস এলিয়টের মতে এ সমস্তই ভারতীয় চিন্তাধারার বিস্তৃতির তুলনায় নগণ্য বলে গণ্য হওয়ার যোগ্য। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব উপরোক্ত দেশসমূহ ভিন্ন চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, সিংহল, মধ্য-এশিয়াব তুরফান, কুচা, শানশান, কাসগর, কারাসার, তুর্কীজাতীয় খানদের রাজত্ব, পূর্ব-পারস্য, সগদিয়ানা (বর্তমান সমরখন্দ ও বোখাবা), বহ্লীক, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। অবশ্য কাবুল উপত্যকা বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্য-এশিয়ার খোটান, শানশান, তুরফান, কুচা, কাসগর প্রভৃতি স্থানের প্রাচীনলিপি খরোষ্ট্রী বা ব্রাহ্মী। এক সময় কুচা সংস্কৃত-চর্চার এক বড় কেন্দ্র ছিল। তিব্বতের লিপিও কাশ্মীরে প্রচলিত ব্রাহ্মীলিপির কিছু পরিবর্তিত সংস্করণ। টমাসের মতে তা তিব্বতকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান। চীনা ভাষার উন্নতিকল্পেও ভারতীয়দের দান রয়েছে। ইউয়ান চোয়াং-এর সময় অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণাত্য থেকে জাপানের নারা এবং তুরফান থেকে সুমাত্রা পর্যন্ত সংস্কৃতের প্রভাব ও আধিপত্য ছিল। 'চীনের চিত্রকলা ভারতীয় আদর্শবাদ এবং চীনের সৌন্দর্যবোধ প্রতিভা এই দুইয়ের মিলন উৎপন্ন সুসন্তান'

(কালিদাস নাগ)। বৌদ্ধ শিল্পকলা, চীন থেকে কোরিয়া এবং কোরিয়া থেকে জাপানে যায়। ভারতীয় উপনিবেশসমূহে ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। ভারতীয় সাহিত্যে যেমন রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব, যবদ্বীপের সাহিত্যেও তেমনি। ভারতবর্ষের মতো ঐ স্থানের মন্দিরের উৎকীরণ-চিত্র রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতির আখ্যায়িকা অবলম্বনে অঙ্কিত। যবদ্বীপের বড়ভূধর এবং কাম্বোডিয়ার আঙকোরভাটের মন্দির ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন, সমস্ত জগতের শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 'যদি উন্নত ও মহান আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়ার উপর শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তবে বড়ভূধর জগতের উচ্চাঙ্গের কীর্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আসন পাওয়ার যোগ্য' (রমেশচন্দ্র মজুমদার)। শ্রীবিজয় এক সময় সংস্কৃত-চর্চার বড় কেন্দ্র ছিল।

উপনিবেশসমূহে প্রথমে হিন্দুধর্ম এবং পরে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের প্রমাণ তো পাওয়া যায়ই না, বরং পালরাজাদের অধীনে মগধ ও বাঙলায় শৈব ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে মিলনের চেষ্টা দেখতে পাই—কাম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা, যব ও বলীদ্বীপে তা সুস্পষ্ট।

এখন আলোচনার সুবিধার জন্য উপরোক্ত দেশগুলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করতে চাই: (১) কাম্বোজ, চম্পা ও সুবর্ণদ্বীপ (মালয়, যব ও বলীদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও), (২) মধ্য-এশিয়া, (৩) চীন, জাপান, তিব্বত, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম ও সিংহল।

১ কাম্বোজ, চম্পা ও সুবর্ণদ্বীপ

কাম্বোজ—ঠিক কোন সময়ে বর্তমান ইন্দোচীনের কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরা রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে তা এখনো সঠিক নির্ণীত হয়নি। সর্বপ্রথম যে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে চীনদেশীয়রা ফুনান বা বনরাজ্য বলে অভিহিত করেছে। কাম্বোজ, কোচিনচীন এবং শ্যামের দক্ষিণাংশ এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রবাদমতে কৌণ্ডিন্য নামে এক ব্রাহ্মণ—যিনি স্থানীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করেন—খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফুনানরাজ্যের অধিপতি হন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে (৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি) দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্য

কর্তৃক এই রাজ্যে হিন্দু সভ্যতার বিকাশ পরিপূর্ণতা লাভ করে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাম্বোজ ফুনানবাজ্য থেকে পৃথক হয় এবং পরবর্তী নয় শত বৎসর ধরে হিন্দুরাজাদের অধীনে এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। ফুনানরাজ্যের অধিপতি হিসাবে গুণবর্মা, জয়বর্মা এবং রুদ্রবর্মার নাম পাওয়া যায়। যদিও রাজাদেব মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, অধিকাংশ লোক শৈব মতাবলম্বীই ছিল।

কাম্বোজ পৃথক হয়ে যাওয়াব পর তার এক বাজা ঈশানবর্মার সভাপণ্ডিত বিদ্যাবিশেষ সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রাপ্ত বিভিন্ন 'শাসন' থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে সংস্কৃত-সাহিত্যেব বিভিন্ন শাখা, বিশেষ করে কাব্য ও ব্যাকরণ কাম্বোজে বেশ ভালোভাবেই চর্চা হত। কাম্বোজেব লিপিও ভারতীয়। বামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতিব ঘটনা বা আখ্যায়িকা অবলম্বনে মন্দিরেব অনেক উৎকীরণ-চিত্র অঙ্কিত। সমুদ্রমন্থন, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ, কৃষ্ণগোবর্ধনধাবী প্রভৃতি চিত্র প্রায়ই দেখা যায়। রামায়ণের কাম্বোজীয় সংস্করণও হয়েছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই কাম্বোজে শিল্পকলাব চর্চা আবম্ভ হয়। ঐ যুগের যে সমস্ত জিনিস পাওয়া গিয়েছে তা ভারতীয় শিল্পই বলা যেতে পারে। অবশ্য স্থানীয় অধিবাসীরা পরে শিল্পের মধ্যে তাদের নিজস্ব রূপও ফেলিয়েছে। আঙকোরঠম প্রভৃতি স্থানে কাম্বোজ-শিল্পের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান, এর মধ্যে আঙকোরভাটেব বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির জগতের সবচেয়ে বড় পাথরের তৈরি মন্দির। উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে আয়তনের বৃহত্ব এবং ভাস্কর্যের প্রাচুর্যের জন্যই এই মন্দির জগতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের মধ্যে একটি। দ্বিতীয় সূর্যবর্মা (১১১৫-৫২ খৃষ্টাব্দ) এই মন্দিরের পরিকল্পনা করে তৈরি আরম্ভ করেন এবং সম্ভবত তাঁর পরবর্তী রাজা ধরণীন্দ্রবর্মা (১১৫২-১১৮১ খৃষ্টাব্দ) নির্মাণকার্য সুসম্পন্ন করেন। এই কীর্তি স্থাপন করে দ্বিতীয় সূর্যবর্মা জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বিষ্ণু, রাম ও কৃষ্ণের উপাখ্যান প্রভৃতি অবলম্বনে এই মন্দিরের জগৎ বিখ্যাত উৎকীরণ-চিত্রসমূহ অঙ্কিত হয়েছে।

কাম্বোজের বর্তমান দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন মনুস্মৃতির ভিত্তির উপর রচিত, যদিও কিছু পরিবর্তন অবশ্যই আছে। হিন্দু আইনে মেয়েদের যতটা অধিকার ওখানে তার চেয়ে বেশি। স্ত্রীর অধিকার 'স্ত্রী-ধনে' তো আছেই, বিবাহের পর

স্বামী যদি কোনো সম্পত্তির অধিকারী হয় স্ত্রীও তার ভাগী। ছেলে এবং মেয়ে সমভাবেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। এক কথায় বলতে গেলে কাম্বোজ এক সময়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে উঠেছিল। দশম শতাব্দীর আরবপর্যটকরা কাম্বোজকে ভারতের অংশ বলেই গণ্য করেছে।

চম্পা—খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে চম্পায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রায় বারো শত বৎসর হিন্দু রাজারা রাজত্ব করেন। বহু সংখ্যক সংস্কৃত 'শাসন' প্রাপ্তি থেকে মনে হয় সংস্কৃত-চর্চা চম্পায় ভালোভাবেই হত। সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন প্রভৃতির চর্চা হত। হিন্দু রাজত্বের সময় চম্পাপুর, ইন্দ্রপুর, বিজয় প্রভৃতি চম্পাদেশে প্রধান প্রধান শহর ছিল। ঐ সব শহরে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের সুন্দর স্মারক নির্মিত হয়েছিল। বহু শিব, উমা, স্কন্দ এবং গণেশ মূর্তি প্রাপ্তি থেকে এ সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, যে কাম্বোজের মতো চম্পার অধিকাংশ লোকও শৈব ছিল ; অবশ্য বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও ব্রহ্মার উপাসকও ছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রথম ইটের তৈরি পার্বতী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে কাঠের মন্দির ছিল। আনুমানিক ৪০০ খৃষ্টাব্দে রাজা ভদ্রবর্মা মন্দিরের জন্য বিখ্যাত মাইসন শহর স্থাপন করেন। ডঙ্গডুয়ঙ্গতে (প্রাচীন নাম ইন্দ্রপুর) যে বৌদ্ধ-বিহারের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা দশম শতাব্দীতে রাজা ইন্দ্রবর্মা কর্তৃক তৈরি হয়। কিন্তু অন্তত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে —তার পূর্বে না হলেও—বৌদ্ধধর্ম চম্পায় প্রবেশ করে। সগদিয়া থেকে সঙ্গহুই, ভারত থেকে মারজীবক, ক্ষুদ্র ও কল্যাণরুচি প্রভৃতি বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু তৃতীয় শতাব্দীতে চম্পায় যান।

ট্রাকিউর (প্রাচীন নাম চম্পাপুর বা চম্পানগরী) মন্দিরে হরিবংশ ও পুরাণে বর্ণিত কৃষ্ণ ও বলরামের আখ্যান অবলম্বনে উৎকীরণ-চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। এ সমস্ত থেকে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃতির বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চম্পায় কাম্বোজ বা যবদ্বীপের মতো কোনো বিখ্যাত মন্দির নেই। চম্পায়ও বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে বরাবরই একটা মৈত্রীভাব বর্তমান ছিল।

হিন্দুরাজত্বের সময় চম্পার দুইটি প্রদেশের নাম ছিল অমরাবতী ও পাণ্ডুরঙ্গ। ভারতবর্ষে বিখ্যাত অমরাবতী অন্ধ্রদেশের গুণ্টুর জেলায় অবস্থিত। আর মহারাষ্ট্রে বিষ্ণুর নাম পাণ্ডুরঙ্গ। সেকালে চম্পায় শুক্ল প্রতিপদ থেকে মাস গণনা হত, অমাবস্যায় মাস শেষ এবং চৈত্র মাসের প্রথম দিন থেকে বৎসর

গণনা হত। এই প্রথা বর্তমানেও অন্ধ্র ও মহারাষ্ট্রে বর্তমান। অতএব এই অঞ্চল থেকে চম্পায় গিয়ে হিন্দুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এ ধারণা করা অযৌক্তিক নয়: চীনদেশীয় আন্নামদের দ্বারা চতুর্দশ শতাব্দীতে চম্পা অধিকৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ম্লান হয়।

সুবর্ণদ্বীপ—সুবর্ণদ্বীপ বলতে মালয় উপদ্বীপ, যব, বলী, সুমাত্রা, বোর্নিও প্রভৃতি ভাবত মহাসাগরের এই দ্বীপগুলিকে বোঝায়। অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবাসী বাণিজ্যের জন্য এই সব স্থানে যাতায়াত করত। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সুবর্ণভূমির অগুরুর উল্লেখ আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত 'মিলিন্দপন্‌হ' নামক গ্রন্থে বাণিজ্যের জন্য সুবর্ণভূমি যাওয়ার কথা রয়েছে। গল্পের বই, বৌদ্ধজাতক এবং বৌদ্ধ সাহিত্যে সুবর্ণদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে।

বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত 'শাসন' থেকে এই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সুবর্ণদ্বীপে সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। সব জায়গাই ভারতীয় লিপির ব্যবহার ছিল। অধিকাংশ 'শাসন'ই বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে এখানে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বেশ ভালোভাবেই হত। শ্রীবিজয় সংস্কৃত-চর্চার একটা বড় কেন্দ্র ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং ভারতের পথে শ্রীবিজয়ে ছয় মাস থেকে শব্দবিদ্যা (সংস্কৃত ব্যাকরণ) শিক্ষা করেন। ফিরবার পথেও ওখানে কিছুদিন ছিলেন। অল্পদিন চীনে অবস্থান করে ভারত থেকে নীত কতগুলি সংস্কৃত পুস্তক অনুবাদের জন্য আবার শ্রীবিজয়ে আসেন। কারণ সেখানে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। আরো অনেক চীন পরিব্রাজক শ্রীবিজয় থেকে সংস্কৃত শিখেছেন।

এই সব স্থানে প্রথমে হিন্দুধর্ম এবং পরে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের আগে এই দুই ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। আজও বলীদ্বীপের অধিকাংশ লোক হিন্দু। চারবর্ণের ভিত্তির উপর সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। ৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কার বোর্নিওতে প্রাপ্ত এক 'শাসনে' রাজা মূলবর্মা কর্তৃক অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞের কথা আছে। সেই যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের বহু সোনা দান

করেছিলেন বলে তা 'বহু সুবর্ণক যজ্ঞ' নামে খ্যাত। অপর 'শাসনে' রয়েছে তিনি 'বপ্রকেশ্বর' নামক পুণ্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের বিশ হাজার গো-দান করেন। অতএব ঐ সময়ে ব্রহ্মণ্যধর্ম বোর্নিওতে যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা সুস্পষ্ট। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, গণেশ, দুর্গা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি সুবর্ণদ্বীপে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে। প্রাপ্ত বিভিন্ন মূর্তি থেকে ভারতীয় শিল্পকলার প্রভাব প্রমাণিত হয়। ভারতীয় মাস ও আনুষঙ্গিক জ্যোতিষ গণনা এবং দূরত্বের পরিমাপক ভারতীয় প্রথাও ঐ অঞ্চলে চলতি ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে সুবর্ণদ্বীপের অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রাজা ছিলেন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে প্রায় সমস্ত সুবর্ণদ্বীপ শৈলেন্দ্রবংশের রাজার অধীনে আসে। সম্ভবত কাম্বোজ এবং চম্পাও শৈলেন্দ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালিদাস নাগের মতে ফিলিপাইনও প্রায় দেড়শত বৎসরের জন্য এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রায় দেড় হাজার বৎসর সুবর্ণদ্বীপ ছোট-বড় হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল। অতএব আমরা প্রথমে পৃথক পৃথক ভাবে মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ, সুমাত্রা ও বোর্নিও এবং পরে শৈলেন্দ্ররাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

মালয় উপদ্বীপ—খৃষ্টীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে যথাক্রমে কাম্বোজ এবং চম্পায় হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। মালয় উপদ্বীপ ঐ সব স্থানে যাওয়ার পথে পড়ে। অতএব এরূপ অনুমান করা যুক্তিযুক্ত যে কাম্বোজ এবং চম্পায় রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মালয়ে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণে মালয়দ্বীপ এবং কটাহ-দ্বীপের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয়দের লব্ধজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে টলেমী ঐ অঞ্চলের প্রামাণিক বিবরণ প্রকাশ করেন। ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনকারীদের অনেকেই সমুদ্রপথে সমস্ত মালয় উপদ্বীপের তীর ঘুরে না গিয়ে কটাহ বা বর্তমান কেডা হয়ে শ্যাম, কাম্বোজ, চম্পা প্রভৃতি স্থানে যেতেন। অবশ্য দুই পথেই ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চীনের ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মালয়ের এক অংশে হিন্দুরাজত্ব ছিল। মালয়ের অন্তর্গত ওয়েলেসলী এবং কেডাতে প্রাপ্ত 'শাসন' থেকে প্রমাণিত হয় উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক

গিয়ে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয়ের পশ্চিম উপকূলে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। একটি 'শাসনে' মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। বুদ্ধগুপ্ত ছিলেন মুর্শিদাবাদ জেলার বিখ্যাত রাঙ্গামাটি (কর্ণসুবর্ণ) নামক স্থানের অধিবাসী। কেডা এবং পেরাক-এ প্রাপ্ত অনেক প্রাচীন জিনিস থেকে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে শৈব ও বৌদ্ধমতাবলম্বী লোক গিয়ে কেডাতে এবং পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে পেরাক-এ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে পঞ্চম শতাব্দীর অশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় পল্লব-লিপিতে লিখিত শ্রীবিষ্ণুবর্মার একটি শীলমোহর আছে।

চীনের সুঙ্গবংশের ইতিহাসে পাওয়া যায় ৪৪৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ব-মালয় অবস্থিত পাহাঙরাজ্যের রাজা সরিপালবর্মা চীনের রাজদরবারে প্রতিনিধি পাঠান। এর পরে এই রাজদরবার থেকে দুজন ঐতিহাসিক বিভিন্ন সময়ে চীনের রাজ-দরবারে যান। অতএব চীনের সঙ্গে ভারতীয় উপনিবেশের বেশ যোগাযোগ ছিল এবং সে সময়ে পাহাঙ-এ এক উচ্চ সভ্যতা বর্তমান ছিল। প্রথমে মালয়ে ছোট ছোট ভারতীয় রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে সমস্ত মালয় শৈলেন্দ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে মালয় যবদ্বীপের মজপহিট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমানরা মালয় জয় করে। মালয় জয়ের সময় মুসলমানরা মালয়ের অধিবাসীদের হিন্দু বলেই অভিহিত করেছে।

হিন্দু সভ্যতার বাস্তব নিদর্শন মালয়ে অল্পই পাওয়া গিয়েছে। কেডাতে একটি হিন্দু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, এবং দুর্গা, গণেশ ও নন্দীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পেরাক-এর একস্থানে প্রাপ্ত একটি সোনার অলঙ্কারে গরুড়বাহন সমেত বিষ্ণু-মূর্তি আছে। বৌদ্ধধর্মের জ্ঞাপক জিনিসও পাওয়া গিয়েছে। আজও ভারতীয় ব্রাহ্মণদের বংশধরদের বসতি পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত নাখনস্রীটাম্মারাট ও মাঝা-মাঝি অবস্থিত পাটালুঙে আছে। মালয়ে সংস্কৃত ভাষা বেশ প্রচলিত ছিল। যদিও মুসলমান বিজয়ের পূর্বে মালয়-সাহিত্য ছিল, তথাপি তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না।

যবদ্বীপ—রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমীও যবদ্বীপের নাম করেছেন। কিন্তু কোন সময়ে প্রথম হিন্দুরা যবদ্বীপে গিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তা অজ্ঞাত। এ বিষয়ে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে

কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তি হিসাবে সেগুলিকে গ্রহণ করা যায় না। চীনদেশীয় ইতিবৃত্তে পাওয়া যায় যে ১৩২ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের রাজা দেববর্মা চীনে এক প্রতিনিধি পাঠান। সম্প্রতি চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর পল্লব লিপিতে লিখিত রাজা মূলবর্মার এক 'যুপশাসন' পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে মনে হয় ঐ সময়ে বা তার আগে পল্লবরা যবদ্বীপে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাটাভিয়া প্রদেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত চারটি 'শিলাশাসন' থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ণবর্মা নামে এক রাজা ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করছিলেন। তাঁব রাজধানী ছিল তারুমা। তাঁর পিতামহ ছিলেন রাজর্ষি এবং পিতা সম্ভবত ছিলেন রাজাধিরাজ। তাঁর পিতা চন্দ্রভাগা নামে, এবং তিনিও তাঁর রাজত্বের ২২ বৎসর কালে গোমতী নদী নামে, ৬১২২ ধনুস (ধনুস—৪ হাত) লম্বা এক খাল খনন করেন এবং সেই উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণদের একহাজার গরু দক্ষিণা দেন। ঐ 'শাসনে' ভারতীয় মাস, তিথি এবং দৈর্ঘ্যের পরিমাপক ধনুসের উল্লেখ আছে। ঐ সময়ে পূর্ণবর্মাব রাজ্য ভিন্ন যবদ্বীপের কতকাংশ শৈলেন্দ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। পূর্ব-যবদ্বীপে তখন অন্য রাজা ছিলেন। শৈলেন্দ্রদের সঙ্গে এই অঞ্চলেব রাজাদের অনেক যুদ্ধবিগ্রহ হয়। যবদ্বীপে শৈলেন্দ্রের প্রভুত্ব অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ছিল। এর পরেও যবদ্বীপে একাধিক রাজা ছিলেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মজপহিটকে রাজধানী করে কৃতরাজস্ জয়বর্ধন সমস্ত যবদ্বীপের অধিপতি হন। তিনি নিজেকে 'সমস্ত যবদ্বীপেশ্বর' বলে ঘোষণা করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান বিজয়ের ফলে যবদ্বীপ থেকে রাজবংশের এবং সঙ্গতিপন্ন বহু লোক নিজেদের সভ্যতা বজায় রাখবার জন্য বলীদ্বীপে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপ থেকে পনেরো শত বৎসরের হিন্দু সভ্যতা নিষ্প্রভ হয়।

এই পনেরো শত বৎসর ধরে ভারতীয় সভ্যতা যবদ্বীপের উপর পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করেছিল। পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে লিখিত ফাহিয়েনের বিবরণ থেকে হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রামাণিক মত পাই। তাঁর মতে সে সময়ে ব্রহ্মণ্যধর্ম এবং বিভিন্ন প্রকারের ভ্রান্ত মত যবদ্বীপে চলতি ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাব উল্লেখযোগ্য ছিল না। এর অল্পকাল পরেই বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু গুণবর্মা (৩৬৭-৪৩১ খৃষ্টাব্দে) যবদ্বীপে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তার করেন। গুণবর্মা কাশ্মীরের এক রাজবংশের পুত্র। বাল্যকাল থেকেই তিনি

ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। ৩০ বৎসর বয়সে কাশ্মীরের রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। তখন গুণবর্মাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু তিনি রাজত্ব গ্রহণ না করে সিংহলে চলে যান এবং কয়েক মাস পরে চীনেই ৬৫ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন (তিনি একজন ভালো চিত্রশিল্পীও ছিলেন)। যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কীর্তি শৈলেন্দ্রবংশের তৈরি বড়ভূধরের মন্দির। আগে বলেছি শিল্পকলার দিক দিয়ে বিচার করলে বড়ভূধর জগতের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাওয়ার যোগ্য। ঐ মন্দিরের প্রথম গ্যালারীর দেওয়ালের উৎকীরণ-চিত্র এবং ভাস্কর্য 'ললিতবিস্তার' নামক বুদ্ধের জীবনী সম্বন্ধে লিখিত সংস্কৃতগ্রন্থের অবলম্বনে অঙ্কিত। মোটের উপর যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের চেয়ে হিন্দুধর্মের প্রভাব বেশি ছিল। কাম্বোজ ও চম্পার মতো যবদ্বীপের অধিকাংশ লোকও ছিল শৈব মতাবলম্বী। অধিকাংশ মন্দিরই শিবের। শিবকে সেখানেও ভারতবর্ষের মতো রুদ্র ও কল্যাণময় মূর্তিতে অর্থাৎ মহাকাল বা ভৈরব এবং মহাদেব রূপে উপাসনা করত। যে সমস্ত মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তারও অধিকাংশ শিব বা তাঁর পরিবারভুক্ত অন্যান্য দেবদেবীর। বহু গণেশ মূর্তি রয়েছে। বিষ্ণুভক্তও সেখানে ছিল, কিন্তু তাদের সংখ্যা শৈব ও বৌদ্ধদের চেয়ে কম। ব্রহ্মার মূর্তি সংখ্যায় খুবই কম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনের একত্র সমাবেশে যে ত্রিমূর্তি তাও যবদ্বীপে পাওয়া গিয়েছে। শৈব ও বৌদ্ধমতাবলম্বীরা সংখ্যায় বেশি ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্ম নিয়ে কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ হয়নি বরং শিব ও বুদ্ধের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা সুস্পষ্ট—যার পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাই বলীদ্বীপে। যিনি শিব তিনিই বুদ্ধ—এই মতই সেখানে প্রচলিত।

প্রাম্বাননে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরের উৎকীরণ-চিত্র বড়ভূধরের চিত্রের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। ঐ সমস্ত চিত্রে লঙ্কা-অভিযান পর্যন্ত রামায়ণের ঘটনাসমূহ অঙ্কিত হয়েছে।

যবদ্বীপে ব্রোঞ্জের শিব, পার্বতী, মঞ্জুশ্রী, বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত মূর্তির উপর পালযুগের শিল্পের প্রভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। মগধ ও বাঙলার সঙ্গে যবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল (দেবপালের রাজত্বের সময় যবভূমির রাজা বালপুত্রদেব নালান্দায় একটি বৌদ্ধবিহার

তৈরি করে দেন)। রমেশ মজুমদারের মতে সমস্ত সুবর্ণদ্বীপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎস গুপ্তযুগের শিল্পকলা।

যবদ্বীপে শুধু যে সংস্কৃতচর্চাই হত তা নয়, রামায়ণ-মহাভারত যেমন ভারতবর্ষের সাহিত্যের প্রেরণা যুগিয়েছে, যবদ্বীপেও তেমনি। রামায়ণ যবদ্বীপের সাহিত্যে এক বিখ্যাত পুস্তক। আগে রামায়ণের আলোচনার সময় বলেছি মূল বাল্মিকী-রামায়ণে সীতার বনবাস বা উত্তরকাণ্ড নেই। যবদ্বীপের রামায়ণেও তা নেই। একথা এখানে বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাঙলার কৃত্তিবাসী রামায়ণ রচিত হওয়ার অনেক আগে, ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে যবদ্বীপের 'কবি' ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়। তারও আগে ৯৯৬ খৃষ্টাব্দে মহাভারতের এক সংস্করণ ঐ ভাষায় হয়। মহাভারত অবলম্বনে দ্বাদশ শতাব্দীতে লিখিত 'ভারত-যুদ্ধ' যবদ্বীপের 'ইলিয়ড' নামে খ্যাত। এ ছাড়া ইন্দ্রবিজয়, পার্থযজ্ঞ, স্মারদহন প্রভৃতি পুস্তক রচিত হয়েছিল।

ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাবই যে শুধু যবদ্বীপে ছিল তা নয়। চতুর্বর্ণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থা সেখানে প্রচলিত ছিল। সেখানকার ধর্মশাস্ত্রও প্রধানত মানবধর্মশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত। অবশ্য স্থানীয় অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি ও অন্যান্য স্মৃতির পুস্তকও যবদ্বীপে চলতি ছিল। ভারতীয়দের মতো পান খাওয়ার প্রথা ছিল। নৃত্য ও বয়ঙ্গ বা ছায়ানাটক যবদ্বীপের সভ্যতার সুন্দর অলঙ্কারস্বরূপ। এই দুইয়ের মূলেও ভারতীয় প্রথা। মোট কথা এক সময় যবদ্বীপকে ভারতের একটি প্রদেশ বলেই গণ্য করা যেতে পারত।

বলীদ্বীপ—বলীদ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী আজও হিন্দু। চারবর্ণের ভিত্তির উপর সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দ্বিজাতি আর শূদ্র একজাতি। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে চারবর্ণের লোকই চাষের কাজ করে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু পুরুষরা নিজ বর্ণের বা তার নিম্নবর্ণের মেয়ে বিয়ে করতে পারে, মেয়েরা নিজবর্ণের বা তার উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ চলতি আছে। প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। ধর্মশাস্ত্র অনেকটা মনুস্মৃতি অবলম্বনে রচিত। পুরোহিতদের পদণ্ড বলে। মৃত্যুর পর নিম্নপ্রকারের অশৌচ ব্যবস্থা প্রচলিত: পদণ্ড ৫ দিন, অপর ব্রাহ্মণ ১০ দিন, ক্ষত্রিয় ১৫ দিন

বৈশ্য ২০ দিন এবং শূদ্র ২৫ দিন। বৌদ্ধধর্ম ষষ্ঠ শতাব্দীতে বলীদ্বীপে প্রবেশ করে। ই-চিং-এর বর্ণনা থেকে পাই যে এই দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রায় সকলেই গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে বলীদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে পৌরাণিক হিন্দুধর্মই আপন আধিপত্য বিস্তার করে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীও শৈব। কিন্তু যিনি শিব তিনিই বুদ্ধ এরূপ ধারণা সেখানে শৈব ও বৌদ্ধদের মিলনের নিদর্শন। বিশেষ উৎসবের ভোজ উপলক্ষে চারজন শৈব ও একজন বৌদ্ধ পুরোহিত ক্রিয়া সম্পন্ন করে। বলীদ্বীপের সব চেয়ে বড় পূজা সূর্যসেবন বা শিবকে সূর্যরূপে পূজা। 'ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ পরম শিবাদিত্যায় নমঃ। ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ শিব সূর্য পরস্তেজস্বরূপায় নমঃ॥' এই মন্ত্র শিব ও সূর্যের একত্বজ্ঞাপক উপাসনাই প্রমাণ করে। কিন্তু পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে বলীদ্বীপের রাজকাহিনী, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি সভ্যতার ইতিহাস লেখবার মতো যথেষ্ট উপাদান নেই।

প্রবাদমতে বলীদ্বীপ প্রথমে যবদ্বীপেরই অংশবিশেষ ছিল। তৃতীয় শতাব্দীতে পৃথক হয়। কিন্তু কোন সময় হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় তা বলা যায় না। চীন-দেশীয় ইতিবৃত্ত থেকে জানা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কৌণ্ডিন্য উপাধিধারী এক ক্ষত্রিয় ওখানকার রাজা ছিলেন। বলীদ্বীপে সপ্তম শতাব্দীতে কার্পাসের চাষ এবং তুলা থেকে কাপড় প্রস্তুতের কথাও চীনা ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাপ্ত 'শাসন' থেকে প্রমাণিত হয় যে অষ্টম শতাব্দীতে বলীদ্বীপ ভারতীয় উপনিবেশ ছিল এবং ঐ দ্বীপের সঙ্গে ভারতবর্ষের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। যবদ্বীপের মারফতে বলী ভারতীয় সভ্যতা পায়নি, অন্যান্য দ্বীপের মতো স্বাধীনভাবে এখানেও ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

দশম শতাব্দীর দুই 'শাসনে' রাজা উগ্রসেনের এবং তারপরে জৈন সাধু বর্মদেব, শ্রীকেশরীবর্ম প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে যবদ্বীপের রাজা ধর্মবংশ বলীদ্বীপ জয় করেন। এর পর যবদ্বীপের সভ্যতা বা যব-ভারতীয় সভ্যতা বলীদ্বীপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বলীও যবদ্বীপের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বলী ও যবদ্বীপের মধ্যে বহু যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বলী স্বাধীন হয়। আবার চতুর্দশ শতাব্দীতে মজপহিট রাজা বলীকে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আগেই বলেছি নিজেদের সভ্যতা বজায় রাখবার জন্য মুসলমান বিজয়ের পর মজপহিট রাজবংশের এবং যবদ্বীপের অন্যান্য

অনেক লোক বলীদ্বীপে যায়। এর পরের বলীদ্বীপের সভ্যতা ভারতীয়-যব-বলী-সভ্যতা। উনবিংশ শতাব্দীতে বলীদ্বীপ ডাচ্ (ওলন্দাজ) প্রভুত্ব স্বীকার করে। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ তারপরেও চলে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে হিন্দু শাসন বলীদ্বীপ থেকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়।

সুমাত্রা—সুমাত্রায় হিন্দু উপনিবেশ স্থাপনের সময় খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দী বললে ভুল হবে না। ফের্ঁার মতে খৃষ্টাব্দের কয়েক শত বৎসর আগে উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। সুমাত্রা সমুদ্রপথে ভারত ও চীনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই কারণে বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অনেক ভালো বন্দর গড়ে উঠেছিল। কিন্তু হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। আগে বলেছি শ্রীবিজয় সংস্কৃত-চর্চার এক বড় কেন্দ্র ছিল। ই-চিং (সপ্তম শতাব্দী) লিখেছেন যে শ্রীবিজয়ের রাজা বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, ভারত ও শ্রীবিজয়ের মধ্যে যাতায়াতের জন্য তাঁর বাণিজ্য জাহাজ ছিল, [ই-চিং নিজেই তাঁর এক জাহাজে শ্রীবিজয় থেকে বাঙলার তৎকালীন প্রসিদ্ধ বন্দর তাম্রলিপ্তিতে (আধুনিক তমলুক) আসেন]। শ্রীবিজয় বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র শিক্ষারও এক বড় কেন্দ্র ছিল। অতীশ দীপঙ্কর (একাদশ শতাব্দী) শিক্ষার জন্য সেখানে কয়েক বৎসর থাকেন। সোঁদের মতে শ্রীবিজয় বর্তমান পালেমবঙ্গ নামক স্থান, কিন্তু রমেশ মজুমদারের মতে এই সিদ্ধান্ত অবিসম্বাদিতরূপে ঠিক নয়। তিনি মনে করেন শ্রীবিজয় কোথায় ছিল তা এখনো নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয়নি। শ্রীবিজয়রাজ্য ক্রমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কেউ কেউ মনে করেন শৈলেন্দ্রবংশ প্রথমে শ্রীবিজয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে চারদিকে রাজ্য বিস্তৃত করেন। কিন্তু এ মত ঠিক বলে মনে হয় না। তবে একথা ঠিক যে শ্রীবিজয় শৈলেন্দ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্ররাজ্যের পতন হলে সুমাত্রা ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। সুমাত্রা প্রায় দেড় হাজার বৎসরকাল ভারতীয় উপনিবেশ ছিল, ঐ সময়ের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতার সর্বাঙ্গীন বিকাশও হয়েছিল। সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মেরই যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পাথর এবং ব্রোঞ্জে তৈরি সুন্দর শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ, মৈত্রেয় প্রভৃতি মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এই সমস্ত ভাস্কর্য পল্লব, গুপ্ত ও পালযুগের শিল্পকলার অনুরূপ। ধর্মের উচ্চ ও মহান আদর্শ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়রা সুমাত্রায় লাঙল, তুলা ও চরখা প্রবর্তন করেছিল।

বোর্নিও—খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে বোনিওতে কয়েকটি হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু সভ্যতাও প্রভাব বিস্তার করে। ৪০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়কার রাজা মূলবর্মার শাসনের উল্লেখ আগেই করেছি। প্রাপ্ত মূর্তিসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু ও বৌদ্ধ এই দুই ধর্মই সেখানে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখানেও অধিকাংশ লোক ছিল শৈব। হিন্দু সভ্যতা প্রায় হাজার বৎসর ধরে কোনো-না-কোনো ভাবে এই দ্বীপে প্রভাব বজায় রেখেছিল। কিন্তু এখানকার ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লেখবার উপযুক্ত উপাদান এখনো পাওয়া যায়নি।

শৈলেন্দ্ররাজ্য—অষ্টম শতাব্দীতে মালয়, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে শৈলেন্দ্রবংশ শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তা ঐ অঞ্চলে প্রাপ্ত 'শাসন' সমূহ থেকে প্রমাণিত হয়। যবদ্বীপে প্রাপ্ত ৭৮২ খৃষ্টাব্দের এক 'শাসনে' পাওয়া যায় যে সে সময় শৈলেন্দ্রবংশ-তিলক ইন্দ্র সেখানকার রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ রাজাদের যুদ্ধে পরাজিত করেন। গৌড় থেকে আগত রাজগুরু কুমারঘোষ এক মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে রাজা মহাযান বৌদ্ধ ছিলেন এবং বাঙলার সঙ্গে যবদ্বীপের বেশ যোগাযোগ ছিল। বাঙলার রাজা দেবপালের রাজত্বের ৩৯ বৎসর কালে অর্থাৎ আনুমানিক ৮৪৯ খৃষ্টাব্দের নালান্দার এক 'তাম্রশাসনে' পাওয়া যায় যে সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব নালান্দায় একটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করে দেন এবং তাঁর অনুরোধে দেবপাল ঐ বিহারের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। বালপুত্রদেবের পিতা ছিলেন সমরাগ্রবীর এবং পিতামহ ছিলেন শৈলেন্দ্রবংশ-তিলক যবভূমিপাল। বালপুত্রদেবের পিতামহ শৈলেন্দ্রবংশ-তিলক যবভূমিপাল আর ৭৮২ খৃষ্টাব্দের 'শাসনের' শৈলেন্দ্রবংশ-তিলক রাজা ইন্দ্র এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব নয়। নালান্দা-'শাসনে' তাঁর বিশেষণ রয়েছে 'বীর বৈরী মথন' আর যবদ্বীপের 'শাসনে' 'বৈরী বরবীর বিমর্দন।' উভয়ে একই ব্যক্তি যদি ধরে নেওয়া যায় তাহলে আমরা পাই ৭৮২ খৃষ্টাব্দ থেকে অন্তত ৮৪৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শৈলেন্দ্রবংশের তিনজন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। শৈলেন্দ্রবংশ সম্ভবত কাম্বোজ এবং চম্পায়ও রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সময়ের মধ্যে শৈলেন্দ্রবংশের রাজা বিখ্যাত বড়বুদুরের মন্দির তৈরি করেন। কোন রাজা এই

মন্দির তৈরি করেন তা জানা নেই, তবে উপরোক্ত তিন রাজার মধ্যে এক বা ততোধিক রাজা ঐ মন্দির তৈরি করেছিলেন সেটা সম্ভবপর।

নবম শতাব্দীতে দ্বিতীয় জয়বর্মা কাম্বোজ স্বাধীন করেন, এবং প্রায় সেই সময়ে যবদ্বীপ থেকেও শৈলেন্দ্র রাজশক্তির প্রভাব বিলুপ্ত হয়। কিন্তু এই দুই স্থান হস্তচ্যুত হলেও শৈলেন্দ্ররাজ্য বেশ ক্ষমতাশালী ছিল। চীনা এবং আরবীয় লেখকদের বিবরণ থেকে পাওয়া যায় দশম শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র রাজশক্তি বেশ ক্ষমতাশালী ছিল এবং তাঁরা বাণিজ্যও যথেষ্ট পরিমাণে করতেন।

একাদশ শতাব্দীর চোলবংশের 'শাসন' থেকে পাই যে শৈলেন্দ্রবংশের রাজা চূড়ামণিবর্মা ও মারবিজয়োত্তুঙ্গবর্মা নাগীপত্তনে (বর্তমান নেগাপট্টমে) প্রথম রাজার নামে এক বৌদ্ধবিহার তৈরি করে দেন এবং চোলরাজা রাজারাজ এই বিহারের জন্য একটি গ্রাম দান করেন। ঐ 'শাসনে' রয়েছে যে চূড়ামণিবর্মা কটাহ ও শ্রীবিজয়ের অধিপতি। কিছুদিন পরে রাজারাজের পুত্র রাজেন্দ্রচোলদেব শৈলেন্দ্ররাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। প্রথমে চোলরা শৈলেন্দ্ররাজ্যের মালয় এবং সুমাত্রার কতকাংশ জয় করেন। সমস্ত একাদশ শতাব্দী ধরেই যুদ্ধবিগ্রহ হয়। ভারতবর্ষে নানাকারণে চোলরা দুর্বল হয়ে পড়াতে শৈলেন্দ্ররা ক্রমে ক্রমে নিজেদের রাজ্য উদ্ধার করেন। কিন্তু পূর্ব প্রতিপত্তি আর তাদের ফিরে আসে না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্ররাজ চন্দ্রবাহু সিংহল অভিযান করে পরাজিত হন। এর পরে শৈলেন্দ্রবংশের পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্রবংশ প্রায় চারশত বৎসর সুবর্ণদ্বীপে ক্ষমতাশলী রাজশক্তি ছিল; কিন্তু শৈলেন্দ্রবংশ কে স্থাপন করেন বা এই বংশের রাজধানী কোথায় ছিল এ বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না। শৈলেন্দ্ররা কলিঙ্গ (উড়িষ্যা) থেকে এসেছিলেন বলে মনে হয়। উড়িষ্যায় শৈলোদ্ভব ও গঙ্গবংশ রাজত্ব করেছেন—শৈলেন্দ্ররা এই দুইয়ের কোনো বংশের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা বলা যায় না। ঐ দুই নাম অবলম্বনে শৈলেন্দ্র নামধারী সম্পূর্ণ ভিন্ন বংশের লোকও তাঁরা হতে পারেন। শ্রীবিজয় শৈলেন্দ্ররাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বটে, কিন্তু রমেশ মজুমদার ও কোয়ারিচ ওয়েল্সের মতে শৈলেন্দ্রবংশের রাজধানী ছিল মালয় উপদ্বীপে।

ফিলিপাইন ও অন্যান্য দ্বীপ—কালিদাস নাগের মতে ফিলিপাইন শ্রীবিজয়ের ইন্দোমালয় সাম্রাজ্যের অধীনে প্রায় দেড়শত বৎসর ছিল।

ফিলিপাইনে ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল। ভারতীয় লিপিতে লিখিত পুস্তকের অধিকাংশ স্পেনদেশীয় পাদরীরা অতি নির্মমভাবে নষ্ট করে ফেলেছে। নেগ্রস দ্বীপে ও অন্যান্য স্থানে কিছু কিছু পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষার চর্চা ফিলিপাইনে যে হয়েছিল তার নিদর্শন আজও ফিলিপিনো (টগলোগ) ভাষায় পাওয়া যায়। আশা, মন, বাণী, পাপ, মোক্ষ, বংশী, কথা, দুঃখ, চিন্তা, লাভ, মনুষ্য প্রভৃতি শব্দ আমরা যে অর্থে ব্যবহাব করি ফিলিপিনো ভাষায়ও সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফিলিপিনো দেশপ্রেমিক ট্যাভেরার মতে ভাবতীয় হিন্দুরা ফিলিপাইনে এক সময় অবশ্যই ছিল এবং তাদের ধর্ম, সাহিত্য প্রভৃতির প্রভাবও বিস্তৃত হয়েছিল।

হিন্দু সভ্যতা নিকটবর্তী আরো অনেক দ্বীপে বিস্তৃত হয়েছিল। সেলিবিস দ্বীপের ভাষায় হিন্দু সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্ট। শুধু ধর্মসম্বন্ধীয় শব্দ নয়, সংস্কৃত অন্যান্য শব্দও ঐ দ্বীপের বুগীদের ভাষায আছে। বুগীদের এবং মাকাসাব দ্বীপের লিপিও ভারতীয়। সেলিবিসে ব্রোঞ্জের একটি বড বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটি সরাসরি অমরাবতী থেকে ওখানে নেওয়া হয়েছিল বলে অনুমিত হয।

নিউগিনির মন্দিরসমূহের পূজাপদ্ধতি শিবপূজাব কথা স্মরণ কবিয়ে দেয়। টিমোরদ্বীপে পাথরেব ত্রিমূর্তি এবং কাল বা শিবমূর্তি পাওয়া গিয়েছে।

মাদাগাস্করের লোকদের ভিতবে এই প্রবাদ আছে যে তাদেব পূর্বপুরুষ ম্যাঙ্গ্যালোর থেকে এসেছিল। ম্যাঙ্গ্যালোর দক্ষিণ কানাড়া জেলাব প্রধান শহর। মাদাগাস্করে সংস্কৃত শব্দমিশ্রিত মালয় ভাষা প্রচলিত ছিল। প্রাচীনকালে ঐ স্থানে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল এরূপ ধারণা করা অযৌক্তিক নয়।

২ মধ্য-এশিয়া

এক সময়ে সমস্ত মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল, তার মধ্যে খোটান, কুচা ও তুরফান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবাদমতে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে একদল ভারতবাসী উত্তর-পশ্চিম ভারত (সম্ভবত কাশ্মীর অঞ্চল) থেকে গিয়ে খোটান শহর প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রাকৃতভাষা খোটান ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে খৃষ্টীয় কয়েক শতাব্দী ধরে কথ্যভাষা ছিল। শাসন-ব্যবস্থার জন্যও ঐ প্রাকৃতভাষাই ব্যবহৃত হত।

সেই যুগে ভারতীয় নামধারী 'বিজিত'-উপাধি-সম্পন্ন রাজারা রাজত্ব করতেন। অতএব খোটান খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে কয়েক শত বৎসর ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। ফরাসী পণ্ডিত রেনে গ্রুসের মতে খোটানের ধর্ম ও সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু খোটানে প্রাপ্ত প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি প্রাকৃত ভাষায় খরোষ্ঠীলিপিতে লিখিত ধম্মপদ। জনসাধারণের ভাষা ছিল প্রাকৃত, তাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের মহৎভাব প্রচারের জন্যই ঐ ভাষায় ধম্মপদ লিখিত হয়েছিল। খোটানে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও খোটানী ভাষায় লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে। ঐ সব পুস্তক থেকে ভারতীয় সভ্যতার সর্বাঙ্গীন প্রভাব বেশ উপলব্ধি করা যায়। খোটানে প্রথমে খরোষ্ঠীলিপিই ছিল, পরে পঞ্চম শতাব্দীতে ব্রাহ্মীলিপিও প্রবর্তিত হয়। মনে হয় এখানেও হিন্দুধর্ম প্রথমে প্রভাব বিস্তার করে, কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মই আপামর জনসাধারণের ধর্ম হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্মের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গিয়েছে। শীলমোহরে কুবেরের মূর্তি প্রাপ্তি থেকে মনে হয় এক সময় সেখানে কুবেরের উপাসনা প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া গণেশের চিত্রও রয়েছে (রামায়ণেরও এক সংস্করণ মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া গিয়েছে)। কিন্তু প্রাপ্ত অধিকাংশ চিত্র ও ভাস্কর্য এবং পুস্তক বৌদ্ধধর্মের ব্যাপকতার নিদর্শন। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম খোটানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধশ্রমণ বৈরোচন তৎকালীন রাজা বিজয়সম্ভবকে বৌদ্ধমতাবলম্বী করেন এবং তাঁর সহায়তায় প্রথম বৌদ্ধবিহার তৈরি হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে পূর্ব-তিব্বতীয় এক জাতির আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার ফলে কিছুদিনের জন্য খোটানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ম্লান হয়। পুনরায় কাসগর থেকে অনেক ভিক্ষু এসে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইউয়ান চোয়াং মধ্য-এশিয়ার পথে চীন থেকে ভারতে এসেছিলেন, ফিরেছিলেনও মধ্য-এশিয়া হয়ে। তাঁর বিবরণ থেকে তৎকালীন মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বেশ জানা যায়। তিনি ফিরবার পথে খোটানে যান। সে সময় খোটানে একশত বৌদ্ধবিহার এবং পাঁচহাজার ভিক্ষু ছিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মুসলমান বিজয়ের ফলে খোটানে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব ম্লান হয়।

ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলা এই তিনদিক দিয়ে কুচাও সম্পূর্ণরূপে বহির্ভারতের অংশবিশেষ ছিল। কুচা বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃত-চর্চার এক বড় কেন্দ্র ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধসন্ন্যাসী কুমারজীব (৩৪৪-৪১৩ খৃষ্টাব্দ) কুচার অধিবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন

কুচায় এক ভারতীয় বাসিন্দা এবং মা ছিলেন ঐ দেশের এক রাজকন্যা। তিনি বেদ থেকে আরম্ভ করে বৌদ্ধ ধর্মপুস্তকসমূহ কাশ্মীরে অধ্যয়ন করেন। তিনি কুচায় এবং চীন দেশে সদ্ধর্মপুণ্ডরীক ও অন্যান্য বৌদ্ধ ধর্মপুস্তক অনুবাদ করে ঐ ধর্মপ্রচারে অশেষ সাহায্য করেন। সিলভাঁ লেভির মতে যে সমস্ত অনুবাদক ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ভাবধারা চীনদেশে প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইউয়ান চোয়াং-এর মতো তিনি এই কাজেই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কুচার মারফতে বহু সংস্কৃত পুস্তক পূর্ব-এশিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে। ইউয়ান চোয়াং যখন কুচা হয়ে আসেন তখন সুবর্ণদেব (স্থানীয় টোখারী ভাষায়—স্বর্ণ-টেপ) সেখানকাব রাজা ছিলেন। তাঁর পিতা এবং পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন সুবর্ণপুষ্প। গোবী অঞ্চলের অন্যান্য টোখারী রাজার মতো সুবর্ণদেবও একজন নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন। সে সময় কুচায় ভিক্ষু সংখ্যা পাঁচহাজারের কম ছিল না, তাদের মধ্যে স্থবির মোক্ষগুপ্ত ছিলেন রাজগুরু।

তুরফানও বৌদ্ধধর্মের এক বড় কেন্দ্রস্থল ছিল। অশ্বঘোষের নাটক 'সারিপুত্র প্রকরণ'—কুমারলাতের গল্পপুস্তক 'কল্পনামণ্ডিতিকা'র অংশবিশেষ, আরো অন্যান্য পুস্তক এবং বহু উচ্চাঙ্গের চিত্র তুরফানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউয়ান চোয়াং যখন ভারতে আসবার পথে তুরফান যান তখন সেখানকার বৌদ্ধরাজা তাঁকে বৌদ্ধবিহারসমূহের প্রধান করে রাখতে চান। তিনি সম্মত না হলে ভয় দেখিয়েও রাখবার চেষ্টা করেন। অবশেষে ইউয়ান চোয়াং চারদিন উপবাসী থাকার ফলে রাজা ভীত হয়ে তাঁকে আসবার অনুমতি দেন।

কুচা ও তুরফানের মধ্যবর্তী কিন্তু কতকটা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কারাসারও (প্রাচীন নাম অগ্নিদেশ) বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। কারাসারের রাজাদের মধ্যে ইন্দ্রার্জুন চন্দ্রার্জুন প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়।

ইউয়ান চোয়াং মধ্য-এশিয়ার অনেক রাজ্যের নাম করেছেন যেখানে বৌদ্ধধর্মের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তার মধ্যে তুর্কীজাতীয় খানের রাজত্ব ও বহ্লীক উল্লেখ-যোগ্য। রাজা খান টোপো ৫৮০ খৃষ্টাব্দে গান্ধারদেশীয় সন্ন্যাসী জীনগুপ্তের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্ব একদিকে চীনদেশের সিনকিয়াং প্রদেশ থেকে অপরদিকে বর্তমান সোভিয়েট রাজ্যের সেমিরিয়াচিনস্ক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহ্লীক সে সময় নিষ্ঠাবান বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিল। তখন সেখানে একশত বৌদ্ধবিহার ও তিনহাজার সন্ন্যাসী ছিল। সম্রাট অশোকের সময়েই

বল্লীকে ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। সম্ভবত বল্লীক থেকে প্রাচীনকালেই বৌদ্ধধর্ম সগদিয়ানায় প্রবর্তিত হয়।

শিল্পকলার দিক দিয়ে পূর্ব-চীনী-তুর্কীস্থানের টুন্‌হুয়াঙে অবস্থিত প্রাচীন 'হাজার বুদ্ধের গুহা' থেকে আবিষ্কৃত চিত্রশিল্প বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের পক্ষে অজন্তা যেমন, চীনের পক্ষেও ঐ স্থান তেমনি চিত্রশিল্পের জন্য গৌরবময়। বৌদ্ধধর্মই এই শিল্পের উৎস।

মোটকথা এক সময় সমস্ত মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রভাব ব্যাপক ছিল এবং ঐ অঞ্চল সভ্যতার এক উচ্চস্তরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রকৃতির নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে এর অনেক স্থানই আজ জনমানবশূন্য অনুর্বর প্রদেশে পরিণত হয়েছে। অবশিষ্ট স্থানগুলিও বর্তমান জগতের ইতিহাসে কোনো স্থান অধিকার করে না—শুধু অতীত স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে আছে।

৩ চীন জাপান প্রভৃতি

যদিও এক সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্মের বেশ প্রভাব ছিল, তা সত্ত্বেও বর্তমানে বৌদ্ধধর্ম চীনে একপ্রকার মৃত। কোরিয়া, জাপান ও তিব্বত মহাযান মতাবলম্বী, আর ব্রহ্ম, শ্যাম ও সিংহলে হীনযান মত প্রচলিত।

চীন—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে চীনের রেশমশিল্পের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রবাদ আছে যে অশোক চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন। চীনও ভারতের মতো এক উন্নত প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষত চীনের হানবংশের রাজত্বকালে এই দুই সভ্য দেশের মধ্যে সভ্যতা বিস্তারের জন্য বেশ একটা সহযোগিতা বর্তমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে হানবংশের রাজা চাঙকিন ভারতীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের চীনে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু '৭০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম রাজমান্যতা লাভ করে' (কালিদাস নাগ)। বৌদ্ধধর্ম মধ্য-এশিয়া এবং সমুদ্রপথ এই দুই পথ হয়েই ভারত থেকে চীন দেশে এসেছিল। মধ্য-এশিয়া হয়ে প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপমাতঙ্গ ও ধর্মরত্ন এই দুই

সন্ন্যাসী চীনদেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বিখ্যাত কুমারজীবের কথা আগেই বলেছি (উপরে উল্লিখিত জীনগুপ্ত এবং কাঠিওয়ারের বিখ্যাত সন্ন্যাসী ধর্মগুপ্ত এই পথে চীনে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অশেষ সাহায্য করেন)। সমুদ্রপথে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে গুণবর্মা (৪৩১ খৃষ্টাব্দ), বোধিধর্ম (৫২০ খৃষ্টাব্দ) ও পরমার্থ (৫২৬ খৃষ্টাব্দ) বিশেষ খ্যাত। গুণবর্মা চীনদেশে চিত্রশিল্পের এক নূতন রীতি প্রবর্তন করেন। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ এবং পরে স্বদেশীয়দের কাছে সেই জ্ঞান বিতরণের জন্য চীনদেশ থেকেও বহু সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ফা-হিয়েন, ইউয়ান চোয়াং ও ই-চিং-এর নাম ভারতবর্ষে সুপরিচিত। তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশে ১৮০ বৌদ্ধবিহার ও ৩৭০০ সন্ন্যাসী ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশে তিনহাজার ভারতবাসী ছিল। চীনদেশের শিল্পে ভারতীয় ভাবধারার প্রভাবের কথা আগে উল্লেখ করেছি। টমাস-এর মতে ভারতীয় জ্যোতিষ এবং অঙ্কশাস্ত্রের প্রভাবও চীনের ঐ সব শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়।

কোরিয়া—চতুর্থ শতাব্দীতে চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় বিস্তারলাভ করে। কোরিয়ায় সভ্যতা বিকাশের পথে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট সাহায্য করে। চীনের লিয়াং ও নানকিং-এর বৌদ্ধশিল্পকলা কোরিয়া এবং কোরিয়ার মারফতে জাপানের শিল্পকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে।

জাপান—৫৫২ খৃষ্টাব্দে কোরিয়ার কুডারের রাজার মারফত বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবর্তিত হয়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে জাপানের রাজপুত্র সোটোকো টাইসী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার ফলে তাঁর চেষ্টায় জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সঙ্গে জাপানে আনুষঙ্গিক সভ্যতার অন্যান্য জিনিসও আসে। গ্রুসের মতে হরিউজী মন্দিরের চিত্রশিল্প খোটান, কুচা, টুনহুয়াঙ্গ এবং কোরিয়ার মারফৎ প্রাপ্ত অজন্তার চিত্রশিল্পের ভিত্তির উপর তৈরি। কিন্তু জাপান যা ধার করেছে নিজ অতুলনীয় সৌন্দর্যবোধ প্রতিভাবলে তাকে পরিবর্তিত করে নিজস্ব রূপ দিয়েছে এবং মহীয়ান করে তুলেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে নারা জাপানের রাজধানী ছিল। নারার বিভিন্ন মন্দির উৎসব এবং মৃগদাব কাশীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। টোডোইজী মন্দিরের ব্রোঞ্জের বৈরোচন (বুদ্ধ) মূর্তি বোধহয় জগতের সব চেয়ে বড় মূর্তি। তার উচ্চতা ৫৩½ ফুট এবং ওজন ৫০০ টন। নারা এক সময় সংস্কৃত-চর্চার

কেন্দ্র ছিল। ভারতীয় সঙ্গীত এবং নাটকের বিষয়বস্তু জাপানীদের প্রাণকে সরস করতে সাহায্য করেছে। বর্তমানেও কোনো কোনো জাপানী পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের মূলগ্রন্থসমূহের চর্চায় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করছেন এবং অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। মনে হয় বৌদ্ধধর্ম সেখানে জীবন্ত—জাতির প্রাণের সঙ্গে তার নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে।

তিব্বত—তিব্বত ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ, তা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে তিব্বতের রাজা স্রারিবট্‌সন গামপো (Sraribtson Sgampo) নেপালের এক রাজকুমারীকে বিবাহ করেন। তিনি এক বুদ্ধ মূর্তি তাঁর সঙ্গে তিব্বতে নিয়ে যান। সেই মূর্তি এখনো লাসার প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দিরে রক্ষিত আছে। পরে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজা চীনের রাজবংশের এক মেয়েকেও বিবাহ করেন। ইনিও তিব্বতে এক বুদ্ধ মূর্তি নিয়ে আসেন। রাজা গামপো লাসায় দুটি বৌদ্ধবিহার তৈরি করে দেন। তিনি ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরের এক পণ্ডিতকে পাঠিয়ে সেখানকার লিপি নিয়ে আসেন। সেই লিপিই সামান্য কিছু অদল বদল করে তিব্বতে গৃহীত হয়। এর পরে তিব্বতীয়রা মধ্য-এশিয়ার বৌদ্ধধর্মপ্রধান কোনো কোনো দেশ (শান-শান, খোটান প্রভৃতি) দখল করে, নেপালেও প্রভুত্ব বিস্তার করে। ফলে বৌদ্ধদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসবার সুযোগ ঘটে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে (৭৮০ খৃষ্টাব্দ) ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের উড্ডান (চিত্রাল) নামক স্থানের বিখ্যাত সন্ন্যাসী পদ্মসম্ভব নিমন্ত্রিত হয়ে তিব্বতে আসেন। তিনি তেরো বৎসর তিব্বতে থেকে লামা প্রথার প্রবর্তন করেন ; বহু সংস্কৃত পুস্তক তাঁর তত্ত্বাবধানে তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। কিছুদিন পরে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের ভিতরে নানা দোষ প্রবেশ করে। ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তিব্বতীয় সুপণ্ডিত, সংস্কারক সন্ন্যাসী রিন সেন বজান পো-র (Rin Cen Bzan Po) নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণ হয়। বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য তিনি তিনবার ভারতবর্ষে আসেন। তিনি বহু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক লেখেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা তাঁকে সাহায্য করবার জন্য বহু ভারতীয় পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করে আনেন। মন্দির নির্মাণ এবং মন্দিরের ভাস্কর্য ও চিত্র তৈরির জন্য তিনি নেপাল, বাঙলা ও কাশ্মীর থেকে শিল্পীদেরও তিব্বতে আনেন। ১০৪০ খৃষ্টাব্দে

তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বিখ্যাত অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) তিব্বতে যান। তিনি তেরো বৎসর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কার সাধন করে ৭৩ বৎসর বয়সে ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সেখানেই মারা যান। তিনি বহু মূলগ্রন্থ ও ভাষ্য লেখেন, তন্মধ্যে 'বোধিপথপ্রদীপ' সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতদের অনেক খ্যাতনামা পুস্তক আজ ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় অনেক পুস্তকের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ এবং কোনো কোনো মূল গ্রন্থও তিব্বতে পাওয়া গিয়েছে, তন্মধ্যে দিঙ্‌নাগের 'ন্যায়মুখ', প্রমাণসমুচ্চয় ধর্মকীর্তির 'প্রমাণবার্তিক', শঙ্করস্বামিনের 'ন্যায়প্রবেশ', আর্যদেবের 'চতুঃশতক', বসুবন্ধুর 'অভিধর্মকোষ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তকের ইউয়ান চোয়াং ও পরমার্থ কৃত চীনা ভাষায় অনুবাদ চীন থেকেও পাওয়া গিয়েছে।

তিব্বতীয় শিল্পকলায় ভারতীয় প্রভাব বিশেষ পরিস্ফুট। পশ্চিম তিব্বতের মন্দিরগুলিতে এমন সব বৌদ্ধধর্মমূলক চিত্র পাওয়া গিয়েছে যা অজন্তা ও ইলোরার চিত্র-শিল্পের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্ব তিব্বতের মাঙ্গবাঙ্গ-বিহারের চিত্র সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতীয় শিল্পীদের অঙ্কিত। গ্রূসে তিব্বতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে বাঙলা ও মগধের পাল ও সেনযুগের শিল্পকলার যথেষ্ট প্রভাবের উপর জোর দিয়েছেন।

ব্রহ্মদেশ—ব্রহ্মদেশের প্রাচীন ইতিহাস একপ্রকার অজ্ঞাত। বুদ্ধের পূর্বে একদল ভারতীয় ক্ষত্রিয় আসামের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মদেশে গিয়ে ইরাবতী ও মেকঙ্গ নদীর উপরিভাগে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন এরকম ধারণা করা যেতে পারে। প্রবাদ মতে অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য সোন ও উত্তর নামক দুই ভিক্ষু সেখানে গিয়েছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধঘোষ সেখানে গিয়ে নিম্নব্রহ্মদেশের বৌদ্ধধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন এ প্রবাদও আছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে প্রোমে বর্মণ ও বিক্রম উপাধিধারী রাজারা রাজত্ব করতেন এবং সেই সময় ঐ রাজ্যে বৌদ্ধধর্মই জনসাধারণের ধর্ম ছিল। ঐ সময়কার প্রাপ্ত মূর্তি এবং 'শাসন' থেকে গুপ্ত ও পল্লব-শিল্পের প্রভাব এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারত থেকে লোকদের ব্রহ্মদেশে যাওয়ার কথা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মদেশে যদিও বৌদ্ধধর্মই প্রধান তবু হিন্দু দেবমূর্তি প্রাপ্তি থেকে, ধারণা

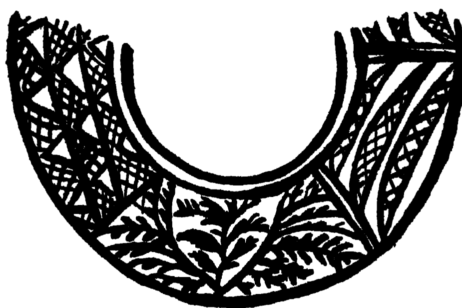
চর্চা বেশ হয়েছে। ধর্মপুস্তক ভিন্ন জ্যোতিষ, চিকিৎসা, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তকও ঐ ভাষায় রচিত হয়েছিল। ব্রহ্মের লিপিও ভারতীয়।

শ্যাম—শ্যামের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ অন্তত খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই হয়। শ্যামের কতকাংশ ফুনান রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা আগে বলেছি। ব্যাঙককের নিকটবর্তী পঙটুক-এ অমরাবতী থেকে আনীত দ্বিতীয় শতাব্দীর ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে দ্বিতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক শ্যামে গিয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব শ্যামে সর্বাঙ্গীন। ৫০০-১০০১ খৃষ্টাব্দ এই সময়ে দ্বারাবতীকে কেন্দ্র করে মধ্য-শ্যামে 'মন' জাতি ক্ষমতাপন্ন ছিল—তারা নিষ্ঠাবান হীনযান বৌদ্ধ ছিল। এই যুগের বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে সারনাথ ও অজন্তা গুহার মূর্তির নিকট-সম্বন্ধ বর্তমান। অমরাবতী-শিল্প ভিন্ন গুপ্ত ও পাল-শিল্পের প্রভাব শ্যামের শিল্পে যথেষ্ট বিদ্যমান। যদিও বৌদ্ধধর্ম শ্যামে প্রধান, তথাপি হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকও ছিল। সংস্কৃত-চর্চা শ্যামে ভালোভাবে হত। সেখানে আজও সংস্কৃতের প্রভাব বর্তমান। ১৯২৬ সালে সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ের চর্চার জন্য রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সভার নাম দেওয়া হয়েছে 'রাজপাণ্ডিত্য সভা'। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীনের ইউনান প্রদেশের থাই জাতি শ্যামে প্রভুত্ব স্থাপন করে, তবুও প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত শ্যামের সভ্যতা মুখ্যত ভারতীয়।

সিংহল—সিংহলও শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের মতো হীনযান মতাবলম্বী। প্রবাদ মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে (বুদ্ধের সমসাময়িক কালে) বাঙলার বিজয়সিংহ সিংহলে গিয়ে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কর্তৃক সিংহলে প্রেরিত হন। তৎকালীন সিংহলের রাজা দেবানামপিয়তিস্য বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁর পরবর্তী কয়েক রাজা সিংহলের তৎকালীন রাজধানী অনুরাধপুরকে বৌদ্ধধর্মের একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত করেন। পাণ্ড্যদের দ্বারা অনুরাধপুর লুণ্ঠিত হলে কলিঙ্গপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত ওখানে রাজধানী ছিল। সিংহলের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধমন্দির 'লঙ্কাতিলক' কলিঙ্গপুরে অবস্থিত। সিংহলের শ্রেষ্ঠ রাজা পরাক্রমবাহু দ্বাদশ শতাব্দীতে এই মন্দির তৈরি করেন। এখানে এক শিবমন্দিরও আছে। অনুরাধপুর,

কলিঙ্গপুর ও সিগিরিয়ায় প্রাপ্ত বহু উৎকীরণ-চিত্র ও ভাস্কর্য অমরাবতী ও নাগার্জুনীকোণ্ডার শিল্পের রীতির নিদর্শন। গ্রুসের মতে সিংহলের ভাস্কর্যে পাল এবং সেন-শিল্পের প্রভাব বর্তমান। সিংহলের লিপির ভিত্তিও ভারতীয় লিপি। পালি ভাষার প্রভাব সিংহলেই যথেষ্ট। মোটের উপর একথা বলা যেতে পারে যে সিংহল ভারতীয় সভ্যতার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত।





নাম-সূচী